স্ট্রিক্টলি ফর ক্যাশ

জেমস হেডলি চেজ

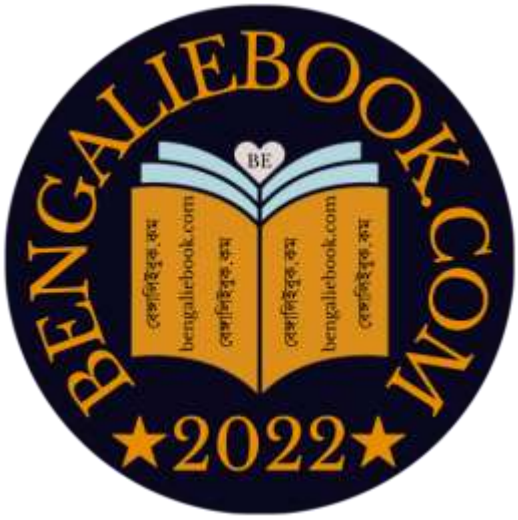

সূচিপত্র

১. জায়গাটা পরিষ্কার ছিমছাম.....2

২. সাঁতরে চলেছি কুয়াশার সাগরে.....46

৩. এগিয়ে এলো পাহারাদারদের একজন.....82

৪. জরুরী কাজের কথা.....143

১. জায়গাটা পরিষ্কার ছিমছাম

তখন বাজে রাত সাড়ে নটা। ক্রমাগত চার ঘণ্টা দৌড়ে আমাদের গাড়িটা পেলোট্রাতে এসে থামল। জায়গাটা পরিষ্কার ছিমছাম আর পাঁচটা শহরের মতো। স্যাম উইলিয়াম পরিশ্রান্ত, ও দম নিচ্ছিল গাড়ি চালাতে চালাতে। স্যাম উইলিয়াম বললো, ওই যে ওসান হোটেলপেলোট্রাতে এসে থামল। কংক্রীট মোড়া, বৃত্তাকার হোটেল চোখে পড়ল গাড়ির কাঁচের ভিতর দিয়ে। থুথু ফেলল স্যাম, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে। মুছে নিলো হাতের ও পিঠে লাল মাংসল মুখটা। পয়সার ব্যাপার অনেক। মুষ্টিযুদ্ধের ব্যাপারও আছে শনিবারের সন্ধ্যেগুলোতে। ওই পেটেল্লি তারও মুরুব্বি। স্যাম সদর রাস্তা থেকে গাড়িটা ঘোরালো ডাইনে। মাঝখানের সরু রাস্তা দিয়ে চললো গাড়ি। এর দু পাশে কাঠের বাড়ি। চোখে পড়ছে সামনে সমুদ্র।

চাঁদের আলোয় রূপোলী সাজে মোড়া। সমুদ্রের মুখোমুখি ডেরাটা ওই কোণে, টম্ রোশের। স্যাম গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। আমার দেরী হয়ে গেছে তাই নইলে নামা যেত তোমার সঙ্গে। আমিই তোমাকে পাঠিয়েছিটমকে বলল। ওনা করলে ওর গিন্নীকে বোলো। তোমার ব্যবস্থা করে দেবে ও-ই মিয়ামি যাবার। আলো-আঁধার জায়গাটা। গাড়িটা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল জলের ধার দিয়ে।

ঘরগুলি সাজানো সারি সারি ভাবে। একদিকে সুদৃশ্য কাউন্টার। দুটো নোংরা চেহারার লোক বসে আছে টেবিলে। পরনে আধময়লা প্যান্ট ও ছেঁড়া গেঞ্জী। আরোও দুজন বসে

আছেকাউন্টারের টেবিলে। প্রথমজন লম্বা চওড়া, গলায় লাল হলদে টাই ও ট্রপিক্যাল স্যুট পরে আছে। সামনের বেঁটে লোকটার পরনে তামাটে রঙা স্যুট। শূন্যদৃষ্টি মেলে বসেছিলো বেঁটে লোকটা বাইরের দিকে তাকিয়ে। মনে হলো ট্রাক চালক বসে। কাউন্টারে আর একটি লোকও বসে। একটা ফ্যাকাশে বোগা চেহারার মেয়েকে চোখে পড়লো কাউন্টারের পেছনে।

বোধহয় অ্যালিশ রোশ। একটা ট্রেতে মেয়েটা সাজাচ্ছিল দুকাপকফি। টম রোশকেও দেখলাম অন্যদিকে মাথাটা দুলিয়ে কি যেন সাফ করছে। ছোট্ট কালো মানুষ কালো চুল। আমাকে কেউ দেখেনি তখনও তাই দেখতে লাগলাম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত। লম্বা লোকটা যেখানে দোসর নিয়ে বসে, অ্যালিস কাউন্টার থেকে বেরিয়ে সেদিকে চলল ট্রে হাতে। লম্বা লোকটা মেয়েটার হাঁটুর নীচে তার হাতটা চালিয়ে দিলো। আড়ষ্ট হয়ে গেল মেয়েটা।

লোকটার মুখে ফুটে উঠলে একটা কুৎসিত হাসি। মনে হলো এবার চেঁচাবে হয়তো মেয়েটা বাকষিয়ে দেবে ওর গালে একটি চড়। কিন্তু না, দাঁড়িয়ে রইলো সে তেমনি ভাবে। রোশের দিকে তাকালো একবার পিছন ফিরে। কোন দিকে দৃষ্টি নেই তার, ভীষণ কাজে ব্যস্ত টম। মেয়েটার মুখ দেখে মনে হলো হৈ-হল্লা করার মতো যথেষ্ট শক্তিও নেই তার।

কারণ ব্যাপারটা সামাল দেওয়া টম রোশের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই। কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো আমার শরীরে। ঢুকে গিয়ে একটা ঝাড় দেওয়া যায় নোকটাকে। কিন্তু

নিজেকে বিরকরলাম টমের পৌরুষে আঘাত করা হবে ভেবে। কোন পরপুরুষ তার অর্ধাঙ্গিনীর কুল রক্ষে করুক তার উপস্থিতিতে তা কোন মানুষই চায় না আমি তা জানি।

একবার লোকটার হাতটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলো অ্যালিস নীচু হয়ে কিন্তু পারলো না। ফিসফিসিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গিতে কি যেন বললো, গুরুর কাঁধে হাত দিয়ে তার বেঁটে দোসর। টম রোশের দিকে তার চোখ।

একটা বিরাশি সিক্কার গুঁতো দিলো ভোলা লোকটা মুক্ত হাতের কনুই দিয়ে, বেঁটে লোকটা ককিয়ে উঠলো যন্ত্রণায়। লম্বা হাতটা এবার আস্তে আস্তে হাঁটুর ওপরে উঠলো এবার ওর নাকের ওপর একটা ঘুষি মারলো মেয়েটা সর্বশক্তি দিয়ে। টম ফিরলো এদিকে ঠিক সেই মুহূর্তে।

তার পায়ে অর্ডারি জুতো অল্প খোঁড়া হওয়ায়। অ্যালিসকে ঠেলে দিলো লম্বা লোকটা। সে পড়ল গিয়ে ট্রাকচালকটার গায়ের ওপর, টেবিলে পৌঁছলে রোশ। চেয়ার ছেড়ে উঠলোনা কিন্তু লোকটা, সেই ক্লেদাক্ত, হাসি তার মুখে, নোশ ঘুষি তুললে লোকটার মাথা লক্ষ্য করে, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ঘুষি। রোশ সামলে নিলো নিজেকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে। সেই ফাঁকে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারলো লোকটা তার পেটে। রোশ ছিটকে পড়লো ঘরের এক কোণে। তখন সে হাঁফাচ্ছে। এবার আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো লম্বা লোকটা, ফিরলো সে বেঁটে লোকটার দিকে, কেটে পড়া যাক চলল, –ঘেন্না ধরে গেছে, এ শালার জায়গায়। এক পা এগিয়ে করুণার দৃষ্টিতে রোশের দিকে তাকাল সে, শালা মেরে মুখ ভেঙ্গে দেবব, আবার যদি কোনোদিন হাত ওঠে তোমার।

একটা পা তুললে লোকটা রোশের মুখ লক্ষ্য করে। পারলামনা আর থাকতে, দ্রুতপায়ে ঢুকে রোশের কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম ওকে ঠেলে। ওর মুখে সর্বশক্তি দিয়ে একটা ঘুষি মারলাম, লোকটা আমার দিকে ফিরতেই। শব্দ হলো যেন গুলি ছিটকে বেরোনোর, বাইশ বোরের বন্দুক থেকে।

লোকটাক্ষেপে যাওয়ার ফলে তার সমস্ত শরীর দুলে উঠল ঘুষিটা চালানোর জন্য। মাঠে মারা গেল ঘুষিটা আনাড়ি ভাবে। বিপদ হতো আমার ঘুষিটা জমাতে পারলে। ছিটকে পড়লো মেঝেয় কাটা পাঁঠার মতো। দরদরিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো চোয়াল ফেটে। অপেক্ষা করলাম না ওর উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত, উঠতেও পারবেনা আমি জানতাম। একবার পড়লে আর উঠতে পারেনা এ ধরনের মানুষগুলি। এখান থেকে হঠাও, নইলে ফিরে তাকালাম বেঁটে লোকটার দিকে। গুরুর ওপর নিবদ্ধ বেঁটের চোখ। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে।

আমি তাকে টেনে তুললাম রোশের দিকে এগিয়ে। মনে হোল রোশ লড়ে যেতে চায় দম না থাকলেও। সে লোকটার দিকে এগোতে লাগল এক পা দু-পা করে। টেনে ধরলাম তাকে, আর হাত লাগাতে হবে না–ও শালার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। টমের গা জড়িয়ে বললো অ্যালিস ছুটে এসে। লম্বার দিকে সরে এলাম, বেঁটে তখন ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাকে টেনে তোলার।

বের করেনাও ওকে এখান থেকে, হাত লাগাও তোমরাও একটু–আমি বললাম গেঞ্জীধারী ও ট্রাকচালকদের উদ্দেশ্যে। চোখ তুলে তাকালো এবার বেঁটে লোকটা, তার চোখে জল। জখম করে দিলে তুমি ওর মুখটা–লড়তে হবে ওকে শনিবার–, দুমড়ে দিতাম ওর

গলাটা–নাও জলদি বের করো ওকে। এক পা এগোলাম, পালটে ফেলতে পারি আমার মত।

এবার ট্রাকচালকটা আমাকে মাপলো আপাদ মস্তক, তারপর বলে উঠলো বেশ উত্তেজিত গলায়, জানো? ঝড় কাকে দিলে জো ম্যাকডোও এক নম্বর মুষ্টিযোদ্ধা এখানকার। শনিবার ও লড়ছে মিয়ামির ছোকরার সঙ্গে, লড়াইতে বাজিও ধরা আছে অনেক টাকার। গলাটা নামিয়ে দিলো খাদে। শীগগির কেটে পড়ো। পেটেল্লির কানে গেলে কেচ্ছা হবে ম্যাকের এই অবস্থার কথা শুনলে। জোরালোই হলো সে রাতে খাওয়াটা। চেয়ারে গা এলিয়ে হাত বাড়িয়ে টেনে নিলাম সিগারেটের প্যাকেটটা।

ভালো লাগছে অ্যালিসআর টমকে। মনে হচ্ছে ওদের, আমার মনের মতো মানুষ। স্বল্প সময়ের ব্যবধানেনাম ধরে ডাকতে শুরু করে দিয়েছি আমরা পরস্পরকে। ওদের কথা শুনেছি খেতে খেতে, মুখ খোলার পালা এবার আমার। তোমাদের জানার কৌতূহলহতে পারে, এখানে আমার আগমনের উদ্দেশ্য। আস্তানা ছিল আমার পিটসবার্গেই, ধরালাম সিগারেটটা। বাবার একটা কাফে ছিলো ওখানকার কারনেলি ইস্পাত কারখানার উল্টো দিকে। মনে হওয়া উচিৎ, কি বলল, টাকা তো খোলামকুচি! লম্বা টান দিলাম সিগারেটে। কিন্তু জিজ্ঞেস করো না, তা হয়নি। নিজেই জানি না কারণটা আমি। বুড়ো তো টেসে গেলো দেনা রেখে, আর আমি ফকিরুদ্দিন আমেদ রাস্তায়। হেসে উঠলাম নিজের রসিকতায়। ভাবলাম একবার ঘুরে দেখা যাক ফ্লোরিডার বাজারটা। ঠকিনি মনে হচ্ছে। তা আছেটা কি ফ্লোরিডার? চোয়াল বোলালো রোশ হাত দিয়ে। যাওনি তো কখনো পিটসবার্গে হাসলাম, ধোঁয়াশা আর আওয়াজ, ময়লা, ঝুল তাকাও যেদিকে। এখানেই তো

কাটলো আমার জীবনটা। তোমার কথাই ঠিক হয়তো। বড় বিরক্তকর লাগে রোদ্দুরটা এক-একসময়।

গত তিন সপ্তাহ ধরে আমার জীবনের মধুরতম দিনগুলি কাটল ফ্লোরিডার রাস্তায় রাস্তায়। জায়গাটা কিন্তু দারুণ, তাই একটু থামলাম। স্যামকে চেনো? ও-ই তো পাঠালো আমাকে তোমার কাছে। অন্য মনে জবাব দিলো রোশ–হ্যাঁ বহুদিন থেকেই! ও তো বলল, মিয়ামি পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে তুমি। করবো। মিয়ামি যাতায়াত করে জন বেটস্ তো। আমার কাছেই থাকে ওর চিঠিপত্র। ব্যবস্থা করে দেবো তোমার–বে আসবে কাল সকালেই। তাহলে যাবে ঠিক করলে মিয়ামি? রোশ থামলো। হ্যাঁ।

বিয়ার ছাড়ো তো আর একটু। অ্যালিস, তেষ্টায় ছটফট করছে–দেখছে না দোস্ত। উঠে গেলো অ্যালিস। পোশ একটু উঠে বসল, ও রান্নাঘরে অদৃশ্য হতেই। কাউকে এমন হুক মারতে দেখিনি ডেম্পসি ছাড়া। লাইন খুব সুবিধের নয়। আমার শরীরে ঘুরলো রোশের চোখ দুটো।

মনে হচ্ছে তুমি লড়াইয়ের লাইনে ছিলে? ছিলাম। কিন্তু বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি ওসব। কিন্তু কার সঙ্গে লড়েছে? চমক সৃষ্টি করতে পারে তোমার চেহারা আর ওই হুক।

যুদ্ধের সময় জো-লুইয়ের সঙ্গে লড়েছি প্রদর্শনী লড়াইলোর কয়েকটাতে। আহা জো খুব বলেছিলো গোল হয়ে ভালো ছিল। বলেছিলো সুন্দর আমার ডান হাতের কাজ। ই আর এক লিনস্কির বদলি সেদিন দ্বিতীয় রাউন্ডে ফেলে দিয়েছিলাম। রাশের চোখ দুটো জ্যাক ওয়াইনার এর দিকে। সেদিনটা এক পরমসুখের দিন আমার জীবনের। বিস্তৃত হলো

রোশের মুখের ফাঁকটা, জ্যাক ওয়াইনার মানে ক্যালিফোর্নিয়ার একনম্বর! হ্যাঁ, বলছি তো তারকথা–পিষে দিলাম পায়ে সিগারেট ফেলে। ভেঙ্গে দিয়েছিলাম জ্যাকের চোয়াল। হেসে উঠলাম। বড় বেশি বিশ্বাস ছিলো ব্যাটার নিজের ওপর। যাব বাবা! তা কেন ভাই ছাড়লে? ব্যাপার তো বেড়ে। ঠিক রাখতে মুখের ভূগোল, তাছাড়া বাধাও ছিলো অন্য ধরনের। রোশ মাথা নাড়লল, দোস্ত অপচয় করছে প্রতিভার। তুমি তাহলে বধ করে থাকো যদি ওয়াইনারকে। আর আমাকে কেটে পড়তে বলে গেল ওয়াইনার–ট্রাকচালকটা। বললো পেটেল্লির নাকি কিছু বলার থাকতে পারে ম্যাকডৌর ব্যাপারে। রোশকে থামিয়ে দিলাম। ভাববার কিছু নেই, পেটেন্নির জন্য। হয়তো এতক্ষণে সাবড়ে দিয়েছে ওকেসলি ব্র্যান্টি। তাছাড়া পেটেল্লিত মদত দিতেই ব্যস্ত তার মিয়ামির বাচ্চাটাকে। অবশ্য তোমার বিপদ ছিলো ওই ছোঁড়াটার গায়ে হাত তুললে। পেটেল্লির মাথা ব্যথা নেই ম্যাকডৌর জন্য।

বেঁটে লোকটা কি সেই–সলি ব্র্যান্ট এই যে নাম বললে তুমি। যাকে দেখলাম ম্যাকডৌর সঙ্গে। হ্যাঁ ও-ই বেচারা ম্যাকক্রেডীর মালিক। এখন মাথা চাপড়াচ্ছে। একটা ভাম ম্যাকটা। কিন্তু ব্রান্ট তো ভালো লোক। হাতে দুটো বিয়ারের পাঁইট নিয়ে অ্যালিস ফিরলো। রোশ দম্পতির অনুরোধে ঠিক করলাম রাতটা ওদের কাফেতে কাটাবো। চোখে ঘুম নেই গত তিনটে সপ্তাহ।

অন্ততঃ ঘুমোতে পারবো ভালো করে আজকের রাতটা। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম, আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর। অ্যালিস পৌঁছে দিলো আমাকে দোতলার একটা ছোট্ট ঘরে। ঘরটা থেকে সৈকত চোখে পড়ে পরিষ্কার। আপনার কিছু দরকার হয় যদি কিস্যু লাগবে না, থামিয়ে দিলাম অ্যালিসকে। খাসা দেখছি তো বিছানাটা। বাথরুম আছে

ওইদিকে যদি স্নান করতে চান তো। মিষ্টি হেসে অ্যালিস বলল। ও দেখালো হাত বাড়িয়ে। করতে হবে হ্যাঁ। অনেক করেছেন–অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, আপনি যা করেছে। হয়তো মেরেই বসততটমকে জংলীটা। উদ্বিগ্ন মুখে অ্যালিস বললো, আর দেখলেনই তো টমের স্বাস্থ্য।

তবু হিম্মত আছে টমের বলতে হবে, আপনার গর্ব বোধ করা উচিৎ ওর জন্য।

করিই তো, অ্যালিস, নরম হাতটা আস্তে রাখলো আমার কাঁধে। আনন্দের ঝিলিক ওর চোখ দুটোতে। জানেন খুব খারাপ গেছে ওর সময়টা। লড়াই করেছে বাঁচার। কিন্তু দুব্যবহার কোনদিন করেনি আমার সঙ্গে। চরম দুঃসময়েও না। আপনি এসে না পড়তেন–যদি; মিসেস রোশ–আরে ওসব ভুলে যান। শুধু বলে যাই একটা কথা ওই সময়। যাবার আগে, তুলনা নেই আপনার। ঠিক আছে তো সব? ঘরে উঁকি দিলো রোশ।

রোশ এক পা এগোল ঘরের মধ্যে। নিশ্চয়ই–টম পাল্টালে পায়ের ভর, নাকটা ঘষে নিলো হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। আমার দিকে তাকালো চোখে চিন্তার ছায়া নিয়ে।

টম কি ভাবছো? ওকে মুক্তি দিতে চাইলাম অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে। তোমাকে একটা প্রস্তাব দেবো ভাবছিলাম। অবশ্য এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে অ্যালিসের সঙ্গে। আচ্ছা, আপত্তি আছে কি কাজ করতে আমাদের সঙ্গে? মোটামুটি ভালোই আমাদের ব্যবসা। বাড়ানো যেতো আরও তুমি থাকলে। পোশ একটু থামলো–তাই বলে তুমি বড়লোক বনে যাবে রাতারাতি একথা বলছি না, আমি কিন্তু চাকরি নিতে বলছিনা তোমাকে–তবে আগ্রহ

থাকলে। একভাগ তোমার লাভের তিন ভাগের মধ্যে, হাসলে রোশ। দোস্ত ভালোই হবে অ্যালিসও বলছিলো তাই।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তাই ফ্যালফ্যালে চোখে তাকিয়ে রইলাম। আরে পাগলা হয়ে গেছো তুমি, আমাকে জানো না চেনো না–অংশীদার বানিয়ে দিচ্ছো চোয়াল থেতলেছি বলে কোন শালার।

কেন–বলছি রোশ বিছানায় বসলো, এখানে আমদানী হয় অনেক আজে বাজে লোকের। তাদের মোকাবিলা করা আমার পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সেজন্যই তোমাকে আসতে বলছি। অনেক অস্বস্তি থেকে তুমি আমাদের বাঁচাতে পারবে। তুমি নিজের হিম্মতেই নেবে তোমার রোজগারের প্রতিটি পয়সা, লজ্জা নেই এতে। না। নেই লজ্জা।

চাইলাম না আমি। বললাম, তাহলে দ্যাখো রোশ। প্রভাবের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি কৃতার্থ মনে করছি নিজেকে। কিন্তু সম্ভব নয় এটা। ভুল বুঝো না আমাকে। শুধু অনেক টাকার স্বপ্ন দেখে এসেছি আমি সারাজীবন। কাজেই সন্তুষ্ট হতে পারবো না অল্প টাকায়। ওর দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম প্যাকেট থেকে বের করে। ধরালাম নিজেও। জানো কেন হয়েছে এটা? অভাবে রেখেছে বাবা আমাকে ছোটবেলা থেকে, শুধু খাবার জুটেছে দুবেলা দুমুঠো। আমাকে রোজগার করতে হয়েছে। আর বাকি সবকিছুর জন্যই। মানুষের ফরমাস খেটেছি, দোকানে কাজ করেছি খবরের কাগজ বেচেছি।

বুড়ো তো তারপর টেসে গেলল। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিলাম একটা লম্বা টান দিয়ে, ভাবলাম কিছু পাব দোকানটা বেচে দিয়ে কিন্তু সব চলে গেলো দেনা মেটাতে। চল্লিশটি

ডলার আছে আমার হাতে এই মুহূর্তে, বলে গেলাম একটু চুপ করে থেকে। পরে আছি যে জামা-প্যান্ট আর টাকা মিলিটারী পেনসনের। দেখিয়ে দিলাম নিজের শরীরটা, আমাকে যেতেই হবে মিয়ামি আমার চাই যে অনেক টাকা।

রোশ টেনে চলেছে সিগারেট নির্বিকার মুখে বসে। সে নড়েচড়ে বসলো বেশ কিছু পরে, তা মিয়ামি কেন সেজন্য? অনেক টাকা অন্য কোন বড় শহরে বা নিউইয়র্ক এও আছে।

শুনেছি জায়গাটা নাকি ভূস্বর্গ, মিয়ামি দেখেছে এমন একজনের কাছে। সেখানে ঘরে ঘরে নাকি কোটিপতি, তারা ছুটি কাটাতে আসে, আর খোলামকুচির মতো হাসলাম।

রোশ কিন্তু তেমনি গম্ভীর হয়ে বসে আছে। সেই টাকার খোঁজে আমি চলেছি–শুনেছি সেখানে নাকি দারুণ লাভজনক, সমুদ্রের ধারে মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজটা। আরও বলেছিলো ওই লোকটা, সে একজনের কথা জানে যে নাকি এক হাজার ডলার পেয়েছিলো একবার এক চিত্রাভিনেতার জান বাঁচিয়ে। উপরি একটা চাকরিও হলিউডে পেয়েছিলো। সে ব্যাটা গাড়ি চালাতো–আমি যার কথা বলছি তাকে পাঁচ হাজার দিয়ে গিয়েছিলো তার কর্তা মরার আগে। পাঁচ হাজার মাত্র তিন বছরে।

বোঝা হাওয়ায় উড়ছে টাকা, রোশ চুলকে নিলা হাঁটুটা হাত নামিয়ে, ফিরলো আমার দিকে–চিন্তার আভাস তার চোখে, সবই তো বলেছে দেখছে আমার দোস্ত, কিন্তু আমার কাছে বলেনি এমন অনেক খবর। বাজে লোকেরও বাস অনেক মিয়ামিতে। পথে পথে ছিনতাইবাজ, পতিতা, জুয়াড়ী। হাওয়ায় ভর করে কোটিপতিদের টাকা ওদের পকেটেই সেঁদোবে তোমার পকেটে ঢোকবার আগে।

মুহূর্তের জন্যও আর নজরছাড়া করবেনা; তোমার মতো এক কাপড়ের মানুষ দেখলে। রোশ বললো জানি, শোন, আমি গিয়েছি মিয়ামি। আমি ট্রাক চালাতাম, আমার পা জখম হবার আগে।

মাথা থেকে বের করে দাও মিয়ামির ব্যাপারটা, শোনো দোস্ত আমার কথা। নির্বাট জীবন, থাকবে মোটা ভাত-কাপড়ে। চলে যাও এখান থেকে। ভালোই লাগে চিন্তা করতে মোটা মালের কথা। কিন্তু সঙ্গে মনে রাখা দরকার বিপদের কথা। উঠে দাঁড়াল রোশ, ভাবো মাথা ঠাণ্ডা করে, টাকা পাবার রাস্তা, বক্সিং লড়ে নেওয়া। জানি না হিম্মত কেমন সেখানে তোমার, তবে, যদি নমুনা হয় আজকের ঘুষির ব্যাপারটা।

তাহলে-ওকে থামিয়ে দিলাম, বলেইছি তো, ছেড়ে দিয়েছি আমি লড়াই-কোনো মানে হয় না কানা হয়ে বেঁচে থাকার।

ইতি ঘটে গেছে ও অধ্যায়ের, জায়গা ভালো না মিয়ামি তুমি বলছে। একবার বুঝতে হয় ব্যাপারটা নিজে গিয়ে। গোলমাল থাকতে পারে আমার মাথায়। কিন্তু হবেই আমাকে যেতে হাত রাখলাম রোশের কাঁধে, টম দুঃখিত আমি, স্থির করে ফেলেছি মন, অকৃতজ্ঞ ভেবো না আমাকে। ঠিক আছে। রোশ একটা ভঙ্গী করলো তার সরু কাঁধের। চলে যাও যদি তাই মনে করো, ঘুরে ফিরে দ্যাখো।

এখানে ফিরে এসো সুবিধে না হলে। আমার দরজা খোলা থাকবে তোমার জন্য। অন্য কাউকে কাজে নিচ্ছি না মাস তিনেকের মধ্যে। শুধু মালিক তোমার আমি আর অ্যালিস, লাভের এক তৃতীয়াংশ, দ্যাখো ভেবে-রোশ, ম্লান হাসি হাসবার চেষ্টা করল। ভাবনা তত

শেষ আমার। টম থেকো না আমার অপেক্ষায়, বললাম, নিয়ে নাও তুমি লোক, ফিরবো না আমি।

একটা সিগারেট ধরিয়েছি প্রাতরাশ শেষ করে। এমন সময় মুখ বাড়ালো রোশ দরজার ফাঁকে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় সলি ব্র্যান্ট, কি বলবো? একটু ইতস্তত করলাম, তুমি বলো। দেখা করবো, নাকি করবো না? সরিয়ে দিলাম খাবারের প্লেট। দাও–ভিরিয়ে। ঢুকলো ব্র্যান্ট। পেছনে সরিয়ে দিলো টুপিটা চেয়ার টেনে বসে। লোকটা ঘুমায়নি যেন কতকাল। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললাম ও মুখ খোলার আগেই। কিন্তু লড়িয়ে নয় তো তোমার ছোকরাটি পেয়েছে ওর পাওনা। লাভ নেই কাঁদুনি গেয়ে আমার কাছে। দরকার কিছু নেই আমার। জানি যন্ত্রণা হয়েছে ও শালা ভামকে নিয়ে। ব্র্যান্ট চুলকালো মুখটা হাত দিয়ে। শালা রাতারাতি বাড়িয়ে দিয়েছে আমার বয়সটা। আমার দিকে ব্র্যান্ট তার মোটা আঙুল বাড়িয়ে দিলোতা, দাদা কোথায় পেয়েছে ঘুষির ট্রেনিংটা?

অন্য কোথাও হাতটা দাবাতাম এতো ঠুনকো জানলে ও শালার চোয়ালটা। শক্তই ওর চোয়াল–অনেক শালাই তো ওর চোয়ালে হাত বোলাচ্ছে বছরের পর বছর করে আসছে তো হজমও। কিন্তু আমি জন্মে দেখিনি ওই মার।

যাক গে, ও শালাকে ফুটিয়ে দিতাম যদি অন্য কাউকে পেতামমিয়ামির ছোকরাটার মোকাবিলা করার জন্য ব্র্যান্ট থেমে গেলোবিমর্ষ মুখোবাজি অনেক টাকার লাগিয়েছিলাম সাড়ে সাত–এবার ও আমার চোখে, আমি? নানা সোজা তাকালো, আচ্ছা তুমি বলেছিলে কার সঙ্গে লড়েছিলে? তাতে কিছু আসে যায় না, আমি কার সঙ্গে লড়েছি। সড়তে পারছি

না তোমার জন্য জেনে রাখো এটুকু। অনেকদিন হাতে দস্তানা গলাইনি, আমি বোধহয় রিংয়ে আর ফিরছি না।

আদেখলার মতো আমার শরীরে ঘুরলো, ব্র্যান্টের ক্ষুদে বাদামী চোখ দুটো, অরিজিনাল হক আর এই চেহারা–ছেড়েছে কদিন দাদা। বহুৎ দিন। ইচ্ছেও নেই আর হয়। ভাইটি এক মিনিট, সত্যি যাক, এই ব্যাপারেই যদি তোমার শুভাগমন ঘটে থাকে। তুমি নাকি ওয়াইনারকে দ্বিতীয় রাউন্ডে শুইয়ে দিয়েছিলে?

রোশের কাছে শুনলাম। কি উপকারটা হচ্ছে শুনি তাতে তোমার? তাহলে চলেছে মিয়ামি, ব্র্যান্ট প্রসঙ্গ পাল্টালো। শোনো দোস্ত বলে সেউঠে দাঁড়ালো। করবেটা কি মিয়ামি গিয়ে এই হেটো পোষাকে। ট্রপিক্যাল স্যুট চড়িয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়াই ভালো, তাই না?

যদি যেতেই হয়, দশ মিনিটে আউট হয়ে যাবে। উঠলাম আমি–মাথাব্যথা সেটা আমার। জানি–ব্র্যান্ট ভেতরে উঁকি দিলো টুপিটা খুলে। ওর মধ্যে যেন কিছু হারিয়েছে।

জানিনা, তোমার ঝুলিতে যদি অন্য কিছু থাকে। ওই ঘুষি ছাড়া। তোমার খারাপ দাঁড়াবে না ব্যাপারটা? আচ্ছা ঘটনাটা বোঝা যাক–একবার এসো না ব্যায়ামাগারে। পড়ে গেলাম চিন্তায়। রোশ, বেটুমিয়ামি পাড়ি দেবে আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই। হয় এখানে পড়ে থাকতে হবে আরও চারটে দিন, আর না হয় কেটে পড়তে হয় ওর সঙ্গে।

পকেটে রেস্ত নিয়ে নিজের গাড়িতে চড়ে বেরোতে মন্দ লাগবে না। কিন্তু এক অচেনা অজানা হেভীওয়েট মুষ্টিকের সঙ্গে লড়তে হবে, ওই দুটো বস্তু পাবার আগে। কাজও ভালো ডানহাতের ক্ষিপ্রতা আছে মোটামুটি। কিন্তু ভাবতে হবে না সেসব তোমাকে।

তোমায় হারাতে হবে না ওকে, শুধু চালিয়ে যাওয়া কয়েক রাউন্ড। ওর ওপরেই লাগানো আছে বাজির সমস্ত টাকাটাই।

তবে সোনা বাঁধানো দাঁত বের করে ব্র্যান্ট হাসলো, একটা সিগারেট ধরিয়ে। সে চোখের ভঙ্গী করলো একটা কথা অসমাপ্ত রেখে। না বললাম কথা হওয়াই ভালো একরকম। আরে, বুঝলে না কথার কথা। বেরিয়ে পড়ি চল না, যেতে যেতে কথা হবে। ব্যায়ামাগার পৌঁছলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই। লড়াইয়ের স্টেডিয়ামটা একটা ঘিঞ্জি জায়গায়, রাস্তার শেষে পেলোট্টার সদর। একটা ঘরও আছে সাজ বদলের–ছড়ানো নোংরা মাদুর, পাঞ্চিং ব্যাগ। দুটো রিং, বড় ঘর একটা। সাধারণই ব্যবস্থা। চোখে পড়লো না আশেপাশে কাউকে। এখুনি এসে পড়বে ম্যাকক্রেডীর অনুশীলন জুটি–ওয়ালার। লোকটার শরীর লোহার মতো।

দস্তানা আর লড়াইয়ের পোষাক বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। ওয়ালার ঢুকলো সেগুলো পরতে পরতেই। নিগ্রো বিরাট চেহারার। আমাকে মাপলো ফোলা ফোলা রক্তাক্ত চোখে। ব্র্যান্টের উদ্দেশ্যে সাজ ঘরে ঢুকে পড়লে মাথাটা একটু হেলিয়ে। আরে শরীরে দেখছি একেবারে চর্বিটর্বি নেই একেবারে ভালো জমবে। জমবে, কথাটা ছুঁড়েদিলাম রিংয়ে ঢুকতে ঢুকতে। আবার সিগারেটটাও ছাড়তাম, এই কম্ম করতে হবে জানলে। লড়াই দেখব একটা শোনো হেনরি–যাচাই করা দরকার জনির এলেমটা। কিছু নেই মারামারি করার। হুশিয়ারী দিলো ব্র্যান্ট। একটা বিচিত্র শব্দ বের করলো ওয়ালার উত্তরে নাক দিয়ে। আমার দিকে ঘুরলো ব্র্যান্ট, এবার তুমিও শুনলে ফারার নাও; শুরুকরো ব্র্যান্ট বেল বাজিয়ে দিলো। ওয়ালার এগিয়ে এলোনীচের দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে। তাকে একটা অতিকায় কাকড়া মনে হচ্ছে। দুজনে দুজনের চোখে চোখ রেখে রিংয়ে পাক

খেতে শুরু করলাম। ওয়ালার দুটো ঘুষিও ছুঁড়লো। একটা হুকও ডান হাতের। সরে গেলাম বাঁ হাতের একটা মার দিয়ে। আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই আমার ঘুষির ওজন নিয়ে। মাথা ঘামাচ্ছি সময়ের ব্যাপারটা নিয়েই।

কিন্তু পারছি না মারতে। ওয়ালার মোক্ষম মার দিলো একটা এক ফাঁকে মাথার এক পাশে। শরীর টলছে, কোনোরকমে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম। ওই অবস্থায় বাঁ হাত চালিয়ে দিলাম, ওয়ালার আর এক পা এগোতে।

তুমি মনে হচ্ছে রিংয়ের মুখ দেখনি অনেকদিন, সময়মত পাঞ্চগুলো হচ্ছে না। দোস্ত আরো হুঁশিয়ার হতে হবে পরের রাউন্ডে। চেষ্টা করো একটু তফাতে থাকতে। দিলাম না জবাব। আমি জানি কি করবো, ধ্বসাতে হবে ওকে এই রাউন্ডেনইলে টিকতে পারবোনা বোধহয় তৃতীয় রাউন্ড পর্যন্ত। ওয়ালার কিন্তু বসলোও না বিরতির সময়টুকু। পাক খেয়ে চললো রিংয়ে। উঠে দাঁড়ালো ব্র্যান্ট, ঠিক আছে সব? চলো জনি, এগোতে লাগলাম উঠে আসতে। আবার তেড়ে এলে ওয়ালার, সরে দাঁড়ালাম বাঁ-হাতের একটা জোরালো জমাবার মুহূর্তে। তারপর ওর পেটে ঘুষি জমালাম গোটা তিনেক।

ককিয়ে উঠলো কৃষাঙ্গ ওয়ালার ব্যথায় কুঁকড়ে গেছে তার সারা শরীরটা। সে আমার দেহের ওপর পড়ল অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে, দুজনে জড়িয়ে গেলাম। ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম ওকে কিন্তু সুবিধা হলো না। সরে যেতে বলে আমাদের ব্র্যান্ট চেঁচিয়ে উঠলো। আর একটা আপারকাট বসালাম সেইমুহূর্তেই। গর্জন করে সরে গেলো ওয়ালার। কিছুক্ষণ ঘুমোঘুষি চললো দুজনের। অনেকটা ধাতস্থ আমি এখন।

এবার বাঁ হাতে হুক চালালাম সুযোগ বুঝে, ওয়ালারের বাঁ হাতটা নেমে গেলো, সেটা ওর মুখ আড়াল করে রেখেছিলো। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এখন ওর মুখটা। আমার ডান হাত উঠলো। এবার দাঁতকপাটি লেগে গেলো ওয়ালারের। কিছুতেই আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়া থামছে না। ভারী হয়ে আসছে নিশ্বাসও, মুছলামও বার দুয়েক। তবে নিশ্চিন্ত বোধ করছি খানিকটা। উঠতে পারবে না চট করে নিগ্রোটা।

রিংয়ে ঢুকলো ব্র্যান্ট লাফিয়ে, আকণ্ঠ হাসি ঠোঁটে। দুজনে ধরাধরি করে ওয়ালারকে নিয়ে গেলাম রিংয়ের একটা কোণে। পরিচর্যা শুরু করতেই দরজার দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। মনে হচ্ছে ছোকরাটি বেশ চালু–কোত্থেকে জোটাল ব্র্যান্ট ওকে?

আড়ষ্ট হয়ে গেলো ব্র্যান্ট, তার হাত চলছেনা। তাকালাম ফিরে। তিনটে লোক দাঁড়িয়ে রিংয়ের বাইরে দরজার কাছে। কখন নিঃশব্দ পায়ে ঢুকেছে। চওড়া কাঁধের লোকটা কথা বললো, তাকে বেঁটেই বলা যায়। কোনদিন আপোষ করেনি এ নোক মুখ দেখে বোঝা যায়, আর কোনদিন করবে না। চকচক করছে তীক্ষ্ণ স্থির চোখ দুটো।

সবুজ লিনেনের পোষাক পরনে পেনসিলের মতো সরু গোঁফটা তার, আরও স্পষ্ট দেখাচ্ছে জলপাই রঙ গায়ের চামড়ায়। মনে হলো ওর চামচে মস্তান মার্কা সঙ্গের দুজন।

আমার ভালো লাগলো না ওদের কাউকেই।

বললাম তো আপনাকে এর কথাই, চোয়াল ফাটিয়েছে ম্যাকডোর ব্র্যান্ট কপালটা মুছলো রুমাল বের করে। তা শুনেছি তো, তা একেই কি লড়াবে ঠিক করেছে মিয়ামির ওই

ছোঁড়াটার সঙ্গে? মানো –আপনার কাছে যাচ্ছিলাম তো ওই ব্যাপারেই কথা বলতে মিঃ পেটেল্লি–একটু দেখে নিচ্ছিলাম ওর হাতটা।

ভালোই তোমনে হোল তোমার কাজকম্মকাজ দেওয়া যাবে কিছু লড়াইয়ের পেটেল্লি থেমে একটু প্রশ্ন করলো, সই করেছেনাকি ব্র্যান্টের হয়ে? করিনিকরবোনা কারুর হয়ে। একদিনের জন্যেই লড়াইতো। চলে এসে ব্র্যান্টের সঙ্গে, বলা যাবে কথা।

রোশের কাফের সামনে পৌঁছতেই রাস্তার ধুলো উড়িয়ে মিয়ামির রাস্তায় উঠে যেতে দেখলাম বেটসের ট্রাকটাকে। দাঁড়িয়ে রইলাম মনে একটা মিশ্র অনুভূতি নিয়ে মিয়ামি পাড়ি দেবার কথা ছিল আমার ওই ট্রাকেই। ঢুকলাম কাফের ঝোলানোদরজা ঠেলে। কাজে ব্যস্ত রোশ। বলে উঠলো আমাকে দেখে, তাহলে পাল্টেছে তোমার মত? বেটস তো চলে গেলো এতক্ষণ অপেক্ষা করে। এতক্ষণ কি করছিলে? ফেঁসে গেছিটম আর বোলোনা, ওকে বললাম ব্র্যান্টের কথা। একটা গাড়ি আর পাঁচশো নগদ, মোটামুটি চলে যাবে। কি বলো? তবে, থেকে যেতে হচ্ছে আরও চারটে দিন। মুক্তবিহঙ্গ তারপর–হেসে উঠলাম। রোশকে পেটেল্লির কথাও বললাম।

কিন্তু জনি উড়িয়ে দিওনা ওর ব্যাপারটা। লোকটার কিঞ্চিৎ দুর্নাম আছে বাজারে। – শুনেছি, ওর ছায়া মাড়াতে চাইছি না সেজন্যেই তো। তার সময়তো দিতে হচ্ছে রিংয়ে কিছুটা। লড়াইটা হয়ে গেলেই শনিবার পর্যন্ত। জনি আমাদের সঙ্গে থেকে যাও–তোমার ভালোই লাগবে, আমাদেরও।

বললাম না কিছু। খারাপ তো লাগছেনা ওদের সঙ্গ। সলি ব্র্যান্ট ঢুকলো কিছু পরেই। সে বসে পড়লো একটা কোণের টেবিল বেছে। হাঁফাচ্ছে, কি করে এলাম সব। তুমি শুধু এই লড়াইটাতে নামছে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো এটা পেটেল্লিকে বোঝতে।

ব্র্যান্ট ঝাপী হাতে সিগারেট ধরালো। তবে ফারার তুমি ভুল করছো আমার মনে হয়। আখের গোছাতে পারতে পেটেল্লির মাথায় হাত বুলিয়ে। দরকার নেই–ওকে বুঝিয়েছি আমিও তাই, আর কিছু নেই যদি শেষ পর্যন্ত রাজিও করিয়েছি তবে, এখনো সময় আছে তোমার হাতে, যদি? টদির ব্যাপার। অস্বস্তি বোধ করছে ব্র্যান্ট। বসলো একটু নড়ে। একটু আছে–কিরকম? প্রশ্ন রাখলাম অধৈর্য গলায়। তাহলে দ্যাখো, যদি শেষ লড়াই হয়। এটা তোমার–পেটেল্লি উৎসাহিত হবে তোমার ব্যাপারে আশা কর না এটা নিশ্চয়?

বলছিও না হতে–যত কম মোলাকাত হয় ততই মঙ্গল ওর সঙ্গে আমার–কিন্তু পেট্রেল্লি তো মেলা টাকা লাগিয়ে বসে আছে মিয়ামির ওই ছোকরার ওপরে। কাজেই জেতাতে হবে ওটাকে–ঠিক আছে, যদি লড়ে জিততে পারে তো জিতবেব্যাপারনয় যদিরও জিতবে ব্র্যান্ট ফিরিয়ে দিলো আমার কথা। আর পেট্রিল্লির নির্দেশ এটাই, তাহলে ব্যবস্থা পাকা করেই এসেছে আমাকে তাড়াবার তা একরকম তাই। পেট্রেল্লি বহুৎ টাকা লাগিয়ে বসে আছে ছোঁড়াটার ওপর।

তোমাকে মাটি নিতে হবে তেসরা রাউন্ডেই ব্র্যান্ট সাহেব দ্যাখো, ও বিদ্যেটা আমার জানা নেই তোমাকে তো বলেছি–আর, ওটা তো হবেই না এই লড়াইয়ে। ব্র্যান্ট মুখ মুছে ফেললো দ্রুতহাতে ময়লা রুমালটা বের করে দোস্ত শোনো–পেয়ে যাচ্ছে গাড়ি আরনগদ

টাকা শনিবারের ব্যাপারটার পর। ঘোলা কোরোনা জল। ব্র্যান্ট শোন, আমিও বলছি, যদি তোমাদের ওই ছোকরা

আমাকে ফেলতে না পারে কবজির জোরে, তাহলে মরতে হবে ওকে–কোনো গ্যাঁড়াকলে নেই আমি।

করছি না মস্করা। দুবছর আগে ফ্যাসাদে পড়েছিলো এক ছোঁড়া ওর কথা না শোনার জন্য–ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল ওর হাত দুটো লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে। বুঝতেই পারছে তাহলে–পেলে তো আমাকে–পাবে। চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ব। আর এক ছোঁড়াও, ভেবেছিলো পারেনি কিন্তু। ধরা পড়লো ছমাস পরে–ফাটলো মাথার খুলি, ছেলেটার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেছে

ভয়টয় দেখিওনা আমাকে, আমি আছি যদি লড়াই লড়াইয়ের মতো হয়, কেটে পড়ছি নয়তো–ফারার ভেবে দেখো, করো পেট্রোল যা বলছে। এখানকার যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করো আমার কথা বিশ্বাস না হয়, মাজাকি চলবেনা পেট্রিন্নির সঙ্গে রোশও জানে–ওর যে কথা সেই কাজ–

বোধ হয় তা চলবে না আমার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম এটাই শেষ লড়াই আমার আর শেষ হবে তা আমার ইচ্ছে মতোই, একথা তুমি জানিয়ে দিতে পারো পেটিল্লি সাহেবকে–এখন ওটা তোমার ব্যাপার, তুমি বলো বলতে হয়–ব্রাষ্ট কথা গুলি এক নিশ্বাসে ছেড়ে দিলো। না, দাদা–তুমি বলবে, তুমিই হোতা–এ ব্যাপারের। রিংয়ে যাচ্ছি আমি

ওরা ঢুকলো এ রকম একটা ভাব নিয়ে যেন জায়গাটা ওদের পৈত্রিক দখল। ওয়ালার ওদের দেখে কাধ মেরে গেল। আমার শরীর বেয়ে এক শীতল শিহরণ নামলো কেন জানি না ওদের দর্শনে।

চলো গলিয়ে নাও জামাটা ওস্তাদ–তোমার খবর শুরু নেবে–পেপি মেলে দিলো বুড়ো আঙুল আমার দিকে। বললাম গলাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে ব্যস্ত আছি, তাকে এখানেই আসতে হবে গুরুর দরকার থাকলে শুনলাম নিশ্বাস রুদ্ধ হতে ওয়ালারেরসন্দিহান হয়ে পড়েছে আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে, মনে হোলো ওর দৃষ্টিতে।

ও–পেপি খেকিয়ে উঠলো, জলদি গলিয়ে নাও জামাটা–পেপি কিছু খাটো আমার চেয়ে, আমার কোনো ইচ্ছে নেই ওর গায়ে হাত তোলার কিন্তু মনে হোলোহাত লাগাতে হবেনা পাল্টালে ওর কথাবার্তার ধরনধারন, তোমরা দুজনেই, এখান থেকে বেরোও বলছি, না হলে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

তাহলে দ্যাখো সেই চেষ্টা করেই–অটোমেটিক বেরোলে বেনোর পকেট থেকে, শুনছে আমাদের কথা আমাদের সঙ্গে চলো জামা গলিয়ে, যদি খেতে না চাও গুলিওর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালাম, বেনোর চোখ দুটো অঙ্গার। ও মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে না বুঝলাম। তুমি চেনোনা ওদের–ঠিক বলেছে ওয়ালারাদ–মৃদু হাসি ফুটলো পেপির ঠোঁটে, তুমি তো চেনোআমাদের, বেনো. তো ফেঁসে আছে গুলি মারার কেসে ও বছরেই তিনটে–না বাড়ালেই ভালো সংখ্যাটা–প্রকাণ্ড ক্যাডিলাক গাড়িটা চোখে পড়লো জামা প্যান্ট পরে ওদের সঙ্গে রাস্তায় নামতেই। অটেমেটিক ধরা বেনোর হাতে। দাঁড়িয়ে ছিলো পুলিসের

একটা সিপাই কিছু দূরে, সিপাইটা অদৃশ্য হয়ে গেলো দ্রুতপায়ে রাস্তার মোড়ে বেনোর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই। হাড়ে হাড়ে এবার ব্যাপারটা বুঝলাম।

পরিষ্কার হলো তাও কার খপ্পরে পড়েছি। বসলাম পেপির পাশে দরজা খুলে। পেছনে উঠলো বেনো। মিনিট খানেকও লাগলোনা ওসান হোটেলে পৌঁছতে। একটা লিফটের সামনে এলাম গাড়ি। থেকে নেমে। তিনজনেই ওপরে উঠে গেলাম। কথা নেই কারো মুখে, শুধু তাক করা আমার দিকে বেনোর নলটা। আমরা হেঁটে চললাম একটা লম্বা বারান্দা দিয়ে। আমিও এবং ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো একটা দরজার সামনে।

খোদাই করা প্রাইভেট কথাটা দরজার ওপরে। দরজা ঠেলে দিলো পেপি টোকা দিয়ে। একটি মেয়ে অফিস ঘরে টাইপ করে চলেছে। চিবোচ্ছে চিউয়িং গাম। চকিতে উদাস চাহনিতে মেয়েটা তাকালো চোখ তুলে। যাও চলে, ইশারা করলো মাথা হেলিয়ে ভিতরের দিকে, অপেক্ষা করছে উনি–ও পেপির উদ্দেশ্যেই কথাগুলো বললো। পেপি ঘরে উঁকি দিলো ভেতরের দরজায় টোকা দিয়ে। ঢুকে পড়োপরে আমাকে ইশারা করলো এক পাশে সরে গিয়ে। একটু সামলে কথাবার্তা!

ঢুকলাম। সিনেমার স্টুডিয়োর বাইরে আমি কখনও দেখিনি এরকম সাজানো। হালকা সবুজ রঙা কার্পেটে মোড়া সারা মেঝে। অগণিত হেলান দেওয়া চেয়ার সার সার। আয়না বসানো চারদিকের দেওয়ালে, চোখে পড়ে নিজের প্রতিবিম্ব প্রতিপদক্ষেপেই। পেটেল্লি বসে কনুইয়ের ভর দিয়ে টেবিলের ওপর, আমার দিকে চোখ।

বললো হাত তুলে টেবিলের গজ খানেকের মধ্যে পৌঁছতে, শোনো থোকা একটু মন দিয়ে যা বলছি–পেটেল্লির গলা ঠাণ্ডাকর্কশ, ভাল লড়িয়ে তুমি, পারতাম কাজ করাতে তোমাকে দিয়ে। কিন্তু তুমি চাইছে লড়াই ছেড়ে দিতে।

শুনলাম ব্র্যান্টের কাছে সত্যি কি কথাটা? হু–ভালই লড়ে মিয়ামির এই ছোঁড়াটা তবে ও শিশু তোমার ওই ঘুষির কাছে। যদি আমি না পাই তোমাকে, তাহলে আমাকে ওকেই ধরতে হবে।

ছোকরা এই প্রথম লড়ছে পেলোট্রাতে জেতাতে হবে ওকে–পেটেল্লি ছাই ঝাড়লো সিগারের, লাগিয়েছি দশ হাজার–চলবেনা গুবলেট হলে। সেইজন্যেই ব্র্যান্টকে বলেছি ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে তোমাকে, খেলা শেষ হবে তৃতীয় রাউন্ডে বসে যেতে হবে তোমাকে, মানে হারতে হবে। শুনলাম তোমার নাকি মনঃপূত হয়নি ব্যবস্থাটা। যাক, তোমার মাথাব্যথা ওটা। কিছুই করার নেই আমার তোমার একটাই সুযোগ ছিলো আমার সঙ্গে হাত মেলাবার, কিন্তু তুমি হারিয়েছে সেটা পেটেলি একটু নড়ে বসলো,

তুমি নিশ্চয়ই জেনে গেছে একথা যে এই এলাকা আমার। পেলোট্টার সব চলে আমার কথাতেই।

লোকের খবর নেওয়া যাদের কাজ, এমন কিছু লোকও আছে আমার।

তারা খবর নেবে তোমারও, এখন থেকে নজর রাখা হবে তোমার ওপর যদি ভুল রাস্তায় হাঁটো। চেষ্টা কোরো না নড়বার শহর ছেড়ে আর লড়বে মিয়ামির ছোঁড়াটার সঙ্গে শনিবার।

তবে ওই দ্বিতীয় রাউন্ড পর্যন্তই বেশ জমিয়ে। তারপর ওকে ছেড়ে দেবে আমার নির্দেশ এটা-পেটেল্লি ভঙ্গি করল আড়মোড়া ভাঙ্গার, শেষ করে দেওয়া হবে তোমাকে, এদিক ওদিক হলে-

বুঝলেন তো কেন? বান্ধবহীন, বড় নিঃসঙ্গ, রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুঝেছি। পা বাড়ালাম লিফটের দিকে। বেনোকে দেখলাম রাস্তায় নামতেই উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে। এগোলাম ব্যায়ামাগারের দিকে, বেনো ছায়ার মতো পেছন পেছনচলেছে। সেদিনইনা শুধু, পেপি বা বেনো আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চললো পরের চারটে দিনই, চোখের আড়াল করেনি মুহূর্তের জন্যেও। ভেবেছিলাম মিয়ামি চলে যাব চুপি চুপি শহর থেকে পালিয়ে। কিন্তু হোলোনা তো আর-চামচে দুটো আমার সঙ্গে আঠার মতো লেগেই রইলো।

রোশ একপলক তাকিয়ে বুঝললো আমার চোখে, বলতে গিয়েও বললো না কিছু একটা, রইলো চুপকরে। ব্র্যান্টকে বলি নি আমার সঙ্গে পেট্রেনির মোলকাতের কথাটা, কিন্তু জেনেছে ও, কারণ সে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে আমাকে।

শুরু করে দিলো প্রহার।

অবশেষে সেই বহুপ্রতীক্ষিত শনিবার দিনটি এলো।

আমার অন্তর ছুঁতে পারছে না রাস্তার জনতার উল্লাস। দেখলাম স্যাম উইলিয়ামস আর টম রোশকে। কোনরকমে একটা দুর্বল হাসি ফোঁটাতে পারলাম আমার ঠোঁটে, ওদের

উষ্ণ অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে। পেট্টেল্লি ফিগার টেনে চলেছে নির্বিকার মুখে কাটা ঘরের একটা কোণে। পেছনে দাঁড়িয়ে পেপি।

কঠিন রেখার সাক্ষর মুখে। দেখলাম জনতার অভিবাদন নিচ্ছে দাঁত বার করে মোটা চেহারার একটা লোককে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছোকরার ম্যানেজার লোকটা। ঢুকে পড়লাম সাজ ঘরে। জনতার আর এক দফা উল্লাস কানে এলো পোষাক পাল্টানোর ফাঁকে ফাঁকে। সম্ভবত ওই হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটা এবারে লক্ষ্য।

দেখলাম বস্তুটিকে উঁকি দিয়ে। তরুণটি বেশ বড় চেহারার। দৃষ্টি নামিয়ে আনলাম ওর হাতের ওপর–মনে হোলো কবজিতে হিম্মত আছে, সামান্য ভারী কোমরটা। আমি বেরোতে সে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো অবজ্ঞার একটা মৃদু হাসি দিয়ে।

পালা শেষ হলো ওজন নেওয়ার। আমার চার পাউন্ড ওজন বেশি ছেলেটার চেয়ে। আমার ইঞ্চি তিনেক বেশি ঘুষিরনাগালও। কি আছে–ওইগুলো পড়েও তত তাড়াতাড়ি যত বেশি দামড়া হয়। ছোকরা তার ম্যানেজারকে শুনিয়ে দিলো কথাগুলো উঁচু গলায়। জনতার সকলে শুনলো।

ধুস। সে হেসে উঠলো হ্যাঁ হ্যাঁ করে। কথা বলো হাত ছেড়ে। ওর দিকে তাকালাম কঠিন চোখে। হলো কাজ। ছোকরা নামিয়ে নিলো হাত। নেবে এলো নিস্তব্ধতা। আবার গুঞ্জন উঠলো আমি ফিরে চলতেই। আমার পিছনে দৌড়ে এলো ব্র্যান্ট।

আরে জনি–কান দিওনা ওর কথায়, আলফাল বকে ও শালা–তাই নাকি এর দাওয়াই জানি আমি। বুঝলাম কি বলতে চাইছে ব্র্যান্ট। সে এই আশংকা করছিলো বাড়বে মারের পরিমাণটা বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছোঁড়াটা।

মিথ্যে নয় কথাটা বাগে পেলে একবার–যাই হোক ব্র্যান্ট টাকার প্রথম কিস্তি নিয়ে এলো বিকেলেই। নিয়ে এলাম এ–গুলো, ব্র্যান্ট বলে গেলো অন্যদিকে তাকিয়ে।

খুলে দিলো বাক্সের ডালাটা ভেতরে আছে একটা সাদা সবুজ টাই, একটা তিনরঙা শার্ট রয়েছে রয়েছেসাদা লিনেনের স্যুট। এক কোণে এক জোড়া বাকস্কিনের জুতোও। ফারার তোমাকে এগুলো দারুণ মানাবে। ঠিক হয় কিনা পরে দেখো তো

ওগুলো থাক যেমন আছে, কেটে পড় তুমি

এগোলো এক পা ব্র্যান্ট। আরে, তোমার কি হোলো কি? তুমি তো চেয়েছিলে এই রকমই– সে আমার নাকের সামনে সুটটা মেলে ধরলো।

কেটে পড়, আমাকে উঠতে হবে আবার না হলে–

চেষ্টা করলাম নিজেকে বোঝাবার করার তো কিছু নেই আমার, আমি তো পান করেছি বিষ জেনে শুনেই–লড়াই ছেড়েছি নোংরামি এড়াতে, রিংয়ে ফিরে এলাম তবু আবার, সেই টাকার জন্যেই। ভালো ছিলো মিয়ামিতে ফুটানির স্বপ্ন না দেখলেই বাক্সভর্তি টাকা আর গাড়ি নিয়ে।

কেন ট্যাক্সি, তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি আমার গাড়িতেই। পাঁচ মিনিট–রোশ বেরিয়ে গেলো। মোটামুটি গায়ে লাগলো–তবু খুঁতখুঁত করতে লাগলো মনটা।

নিজের গুলো পরা যেত সেগুলো ময়লা না হলে।

তবে মনেপ্রাণে কামনা করছি আপনার জয়–নিজেকে শুনিয়ে বললাম মৃদুকরুণ কণ্ঠে আচ্ছা, তাহলে বেরোনো যাক। অ্যালিস একপাশে সরে দাঁড়ালো দরজা ছেড়ে, আপনি নিশ্চয় ফিরে আসছেন? উত্তর দিলাম অন্যমনস্ক হয়ে। আসছি কি? কে জানে–আসবেন বইকি, ওমা, সে কি কথা। এর গু আছে। ফেলুন তো পকেটে এটা–অ্যালিস আমার হাতে দিলো রুপোর পদক জাতীয় একটা বস্তু। পদকটা ফেলে দিলাম পকেটে।

রাস্তায় পড়তেই দ্রুতপায়ে নেবে, আমার সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো পেট্রেল্লির পেন্নায় ক্যাডিলাক গাড়িটা। ব্র্যান্ট পেছনে, বেনো বসে স্টিয়ারিংয়ে। ব্র্যান্ট মুখ বাড়ালো জানলার বাইরে। ভাবলাম তুলে নিই যাবার পথে তোমাকে। ভালো তো শরীর? ভালো। তুমি এগোও, আমি আসছি রোশের সঙ্গে। তুমি যাচ্ছে এই গাড়িতে। তাকালাম, পেছনে দাঁড়িয়ে পেপি, আগুনের টুকরো চোখ দুটো, খোকা তোমাকে কাছছাড়া করছি না লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত

নইলে–ধমকে থামিয়ে দিলাম, থাকো চুপচাপকথাটা আমার অনেকবার শোনা হয়ে গেছে। গাড়ি আর গাড়ি চারিদিকে। এবার বেনোর চাপা গলা পেলাম, পেয়ে যাবো মাল খেলা শেষ হলেই, পেছন দিকে থাকবে গাড়িও, পেট্রোল ভর্তি, ঠিক আছে?

থেকে থেকে কানফাটানো উল্লাস উঠছে। শালা কিছু লোকও হয়েছে–তৈরী হয়ে নাও ফারার–ব্র্যান্ট আমার কানে মৃদুস্বরে বললো। সাজ ঘরের বাইরে শুরু হয়ে গেছে জটলা–গুণ মুগ্ধদের আর সংবাদ পত্রসেবীদের। ব্র্যান্ট ঢুকতে দিল না তাদের ভিতরে, বন্ধ করা গেলো দরজাটা অনেক কসরৎ করে। ওদের সামলাতে পপপি বাইরে রইলো। ওয়ালার অপেক্ষায় রয়েছে আমার। ফিরলাম ব্র্যান্টের দিকে, তোমার দরকার নেই থাকার, দেখতে পারবে সব ওয়ালারই

কিন্তু জনি–আমি তোমাকে এখানে চাই না, রিংয়েও না–ব্র্যান্টকে থামিয়ে দিলাম।

কেন এত গরম হচ্ছো? ঠিক আছে, ঠিক আছে, উপায় তো ছিলো না আমার

আমার দরকার নেই ওসব জানার–তুমি আমাকে ভিড়িয়েছে এই ছেঁড়া ঝঞ্ঝাটে, সে জন্যেই তোমাকে বলছিদূরে থাকতে ব্র্যান্ট ফিরলো দরজার কাছে গিয়ে, ফারার চেষ্টা কোরোনা হিড়িক দেবার, নিষ্কৃতি নেই এ থেকে তোমার।

চেঁচিয়ে উঠলাম– ফোটো।

সে অনেক ক্ষতি করেছে সুস্থ বক্সিং পরিবেশের, করছেও। পূর্বনির্ধারিত লড়াই নয়তো এটাও আর একটা। সবতো জেনেইছে–আর কেন জানবেনাই বা, ব্যাপারটা জানতে বাকি নেই শহরের কারোই। অত টাকা লাগিয়ে বসে আছে ওই ছোকরার ওপর পেট্রেল্লি, তখন আশা করা যায় কি আর? আমাকে লড়াই ছেড়ে দিতে বলেছে তৃতীয় রাউন্ডে। একটা সহানুভূতির শব্দ বেরলল ওয়ালার-এর ঠোঁট থেকে, কিন্তু দোষ নেই মিঃ ব্র্যান্টের; খারাপ নয় লোকটা। নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা তার পেট্রেল্লির সঙ্গে টেক্কা দিতে যাওয়াটা।

লাশ পড়বে এদিক-ওদিক হলেই। ব্র্যান্টের ছেলে-বৌ আছে তোওসব যেতে দাওআমি পারছি না ওকে সহ্য করতে।

আর আছ তো তুমি–দরকার হবে না কারোরই থাকার যদি লড়াই তিন রাউন্ডেই শেষ হয়ে যায়–ওয়ালারের কথাগুলি কেমন ম্লান শোনালো। আচ্ছা বসলাম উঠে, ধর যদি আমি না হারি ওই রাউন্ডে? যদি প্যাদাই ওই চ্যাংড়াটাকে? তাহলে তোমার জানা আছে কোনো রাস্তা এখান থেকে জীবন নিয়ে বেরোবার? ওয়ালার তাকালো এদিক ওদিক ভয়ে ভয়ে, ভাবটা চুপ, কান আছে দেওয়ালেরও, জনি পাগলামি কোরো না, বের করে দাও ও চিন্তা মাথা থেকে তার চোখদুটো বিস্ফারিত।

আরে দোষ কি ভাবতে! একটু পরে বললাম জানলার দিকে তাকিয়ে কোথায় নামা যায় ওই জানলাটা দিয়ে? জনি মাথা ঠিক রাখো, ওসব ভেবো না একদম কাদো কাঁদো গলা ওয়ালার এর। ওর কথার জবাব না দিয়ে বাইরে চোখ মেলে দিলাম জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে। জানলার নীচে গাড়ি রাখার জায়গাটা মাটি থেকে ফুট তিরিশেক দূরে।

আমার হয়তো খারাপ লাগতো না অন্য সময় এটা পরতে। কিন্তু আজ এটাকে দুর্বিসহ মনে হচ্ছে। আমি বেরিয়ে আসতেই প্রতিপক্ষরা মিয়ামির, ছোকরাকে নিয়ে ঢুকলো বাদ্যভাণ্ডর সমারোহে। প্রবল হর্ষধ্বনি উঠলো ছোকরা রিংয়ে ঢুকতে।

এগিয়ে এলো ব্র্যান্ট, ফারার চলল, এগোনো যাক সামনে আমরা আছি পেছনে চিন্তিত দেখাচ্ছে ঘামে ভেজা ওর সারা মুখ। এগোলাম। বেনো, পেপি, ওয়ালার, ব্র্যান্ট আমার

পেছনে। . সারাটা পথ অভ্যর্থনার প্লাবনে মুখরিত হলো। উত্তেজনায় অনেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ফেরার সময় কল্পনাকরলাম কেমন হবে সম্বর্ধনার ধারাটা। চলে গেলাম নিজের জায়গায় রিংয়ে ঢুকে। হলদে ড্রেসিং গাউন প্রতিদ্বন্দ্বি ছোরার গায়ে কেরামতি দেখাচ্ছে শূন্যে ঘুষি ছুঁড়ে। টুলে বসলাম কানে নিয়ে দর্শকের উল্লাস।

ওয়ালার শুরু করলো দস্তানা পড়তে। আমাকে দেখছে আমার ঘাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে মিয়ামি ছোকরার ম্যানেজার। নাকে আসছে সিগারের ধোঁয়ার সঙ্গে হুইস্কির গন্ধও। রিংয়ের বাইরে তাকালাম মাথাটা সরিয়ে নিয়ে। আর দেখলাম ঠিক সেই মুহূর্তেই বসে আছে দড়ির নীচেই।

মাইকে বকবক করে চলেছে টাকমাথার ঘোষক, কিন্তু কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়। সে যখন আমার পরিচিতি দিচ্ছে শুনছিনা আমি তখনও–ওয়ালার দাঁড় করিয়ে দিলো আমাকে ঠেলে কানে তালা লাগানো চিৎকার আরও একবার উঠলো। আমি চোখ সরিয়ে নিতে পারছি না ওই মহিলাটির ওপর থেকে। আঙুলে আঙুলে ঠেকে যাবে ও যে হাত বাড়ালে এতো কাছে বসে।

জীবনে দৃষ্টি দিয়েছি অনেক নারীর ওপর। বাইরে এবং চলচ্চিত্র জগতে। কিন্তু কখনও তো চোখে পড়েনি এমনটি। সিঁথি কাটা চকচকে কালো চুলের মাঝ বরাবর প্রায় চোখেই পড়ে না এতো সূক্ষ্ম যে। চোখ দুটো ঝকঝকে। কেমন একটা জেল্লা মসৃণ গায়ের চামড়ায়। আমন্ত্রণের আভাস পুরু ঠোঁটে।

নানা বয়সের আরও তো কত মহিলা বসে রিংয়ের বাইরে নানা ভঙ্গিমায় সকলের অঙ্গেই সান্ধ্য সাজ, কিন্তু যেন ওকে অনন্যা মনে হচ্ছে ওর আপেল রঙা ফিকে সবুজ লিনেনের স্কার্ট আর রেশমী রাউজে। সাধারণের থেকে ওর উচ্চতা কিছু বেশিই হবে মালুম হয়।

ওর–চওড়া কাধ আর তন্বী পা দুটো থেকে আমার দৃষ্টি চলে গেলো ওর সজ্জার গভীরে। বেমালুম ভুলে মেরে দিলাম পেট্রেল্লির ব্যাপারটা। ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে উত্তেজনা থরথর দৃষ্টিতে। শুকিয়ে গেলো আমার ঠোঁট ওর চাহনিতে, দ্রুততর হলো হৃৎস্পন্দন। ওর চোখের ভাষা প্রাঞ্জল মঠের সন্ন্যাসীর কাছেও, আর মঠের লোক তত নই আমি। তোমার কি হলো কি?

মনে হচ্ছে দেখেশুনে ময়ুরের মতো নাচে হৃদয় আমারওয়ালার শেষ করলো দস্তানা পরানো।

হয়তো তাই কথাগুলো বললাম মেয়েটির দিকে মৃদু হেসেই, ও ফিরিয়ে দিলো হাসি–ভরপুর হাসিতে অন্তরঙ্গতার আমেজ। সঙ্গে কেউ আছে কিনা পাশের লোকটার দিকে চোখ ফেরালাম যাচাইয়ের জন্য এক বিত্তবান সঙ্গী চোস্ত স্যুটে মোড়া–মোটামুটি বলাচলে সুপুরুষই।

আমার কৌতূহলী চাহনির প্রত্যুত্তরে ক্রোধের বিস্তার দেখলাম অপ্রশস্ত চিবুকে। আরে ওঠো, অপেক্ষা করছে তো রেফারী। ওয়ালার ঠেলা দিলো আমাকে আলতো হাতে। হ্যাঁ। মিয়ামির ছোকরাটাও অপেক্ষারত। দাঁড়ালাম রিংয়ের মাঝে গিয়ে।

দোস্ত কুছ পরোয়া নেই, অতক্ষণ তোমাকে পড়ে থাকতে হবে না কোণা আগলে, এক্ষুনি তোমাকে ঝাড় দেবেনা–দাঁত বের করলো ছোকরা। রেফারী এবার তৎপর হলো, আচ্ছা ভাই শুনে নিন এবার কাজে নামা যাক মস্করা ছেড়ে...তার প্রাক্ লড়াই ফিরিস্তি শুরু হলো। যা আগে অনেকবার শুনেছি।

ওয়ালার ছাড়িয়ে নিলো আমার গাউন। তাকালাম শেষবারের মতো রিংয়ের বাইরে, দেখার জন্যে ওকে। ও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে–ওর অনেক প্রত্যাশা জ্বলজ্বলে চোখে, মুছে দিতে হবে ওই নোংরা হাসি ওর মুখ থেকে দিতে হবে শিক্ষা–মানবী বললো ফিসফিসিয়ে।

সঙ্গের লোকটা শান্ত করলো ওর কাঁধে হাত রেখে। অধৈর্য হাতে মেয়েটা তার হাত ঝেড়ে ফেলে দিলো, আমার শুভেচ্ছা রইলো–ওর গলা পেলাম নরম রিনরিনে। ধন্যবাদ–বললাম ওর চোখে চোখ রেখে। দাঁড়িয়ে গেলো আমাদের মাঝখানে ওয়ালার মরীয়া হয়ে, আরে নজর দাও তো লড়াইয়ের ওপর

বাজলো ঘণ্টা। মিয়ামির মস্তান তার কোণ থেকে বেরিয়ে এলো দ্রুতপায়ে। সেই চ্যাংড়াহাসির প্রলেপ মুখে তার। ওই–ই প্রথমে হাত চালালোবাঁ হাত, মার ফসকালে অল্পের জন্য। ডান হাত বাড়ালো ছোকরা–এবার ফাঁকা গেলো এটাও। ওর একপাশে আস্তে আস্তে সরে গেলাম। খুঁজছি। মওকা, ওর ছটফটানি কমাতে একটা মোটা মার দিতে হবে। আচমকা একটা মার পড়লো আমার। মুখে। সঙ্গে সঙ্গে দুহাতে কয়েকটা ঘুষি মারলাম ওর পেটে। আবার আমার মুখে একটা ঘুষি পড়লো ওর বাঁ হাতের ছোঁড়াটা সঙ্গে তুলেছিলো ডান হাতটাও, কিন্তু সেটা কোনোরকমে এড়িয়ে গেলাম। ও এগিয়ে

এলো আরো, ওর পায়ের কাজ অনেক দ্রুত আমার চেয়ে, মার পড়লো আরো কিছু আমার পাঁজরায়। ওকে এবার জড়িয়ে নিলাম। রেফারী এগিয়ে এসে আমাদের ছাড়িয়ে দিলো।

হাসলাম মনে মনে, ব্যাটার শিক্ষা হয়ে গেছে প্রথম দাওয়াইতেই। দুজনে আবার জড়িয়ে পড়লাম, ঘুষিও খেলাম পাঁজরায় একটা। ঘন্টা পড়লো। নিজের কোণে সরে গেলাম। বাইরে তাকালাম। ওয়ালার পরিচর্যা শুরু করেছে। আর আমন্ত্রণের ইশারা নেই মেয়েটার চোখে, ক্রুদ্ধ তিরস্কার দুচোখে। চাপা অভিমান ঠোঁটে। ফাঁকি দিতে পারে নি আমার অভিনয় ওর চোখকে। বুঝলাম। ওয়ালার ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিলো আমার মুখেচোখে। আমার মন কোথায় হারিয়েছে ও বুঝেছে।

আড়াল করে দাঁড়ালো সে; বললো ঘুরে এসে মেয়েটাকে, কি শুরু করেছে? ব্র্যান্টও এলো। ছোঁড়াটাকে ওভাবে মারলে কেন? মারবো না কেন? ও শালা লড়তে এসেছে নাকি? বলছে পেটেল্লি-পেটেল্লি চুলোয় যাক-ওর কথা কেটে দিলাম। ঘণ্টা পড়লো শুরুর ঘোষণা দ্বিতীয় রাউন্ড। দাঁড়ালাম উঠে। উঠলো মিয়ামি থোকা, ও সতর্ক চোখে পায়ে পায়ে এগোলো আমাকে জরীপ করে। সেবা হাত উঁচিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমাকে ফারাকে রাখার। কিন্তু বেশিনাগাল, একটা ঘাড়ের পাশে আর একটা মুখে, দুটো, দিলাম কষিয়ে। ছোকরা গরম হয়ে গেলো, পাটা চালালে সেও.. কয়েক সেকেন্ড দুজনে জড়িয়ে পড়লাম। বে-রে করে উঠলো দর্শকরা, মুক্ত করে নিলো থোকা নিজেকে; একটা হুক চালালাম ও সরে যাবার আগে। সৃষ্টি হলো একটা ক্ষতের, রক্ত পড়ছে ডান চোখের নীচে। ও লাফিয়ে পিছিয়ে গেলে একটা খিস্তি দিয়ে। ওরই মধ্যে কাজ চালিয়ে গেলাম দুহাতে। ছোকরা ঠেকা দিয়ে চললো বাঁ হাতে চোখ সামলে।

এবার পেটে মারলাম আরো এক পা এগিয়ে। এবার বোধহয় ছোকরার জয়ের ব্যাপারটা খুব সহজসাধ্য মনে হোল না। তাই সে এবার দৌড়ে এলো মরীয়া হয়েই। একটাক জমার্লো সর্বশক্তি দিয়ে সপাটে আমার মুখে। আমার মাথা ঘুরে গেলো।

ছিটকে গেলাম পেছনে। বাঁহাতে ঘুষি চালালাম পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে। কিন্তু ওতো বুঝে নিয়েছে আমার অবস্থা। ও এগিয়ে আসতে লাগলো...ওর হাতটা নেমে আসার সময় আমার মুখের ওপর, ঘুষি মারলাম ওর অরক্ষিত মুখ লক্ষ্য করে; মারটা পড়লো চোয়ালে। হাঁটু ভেঙ্গে মস্তান মাটিতে পড়লো। আবার ঘণ্টা বেজে উঠলো রেফারী গুনতে শুরু করার মুহূর্তে। ছোকরার লোকেরা এসে ওকে ওর জায়গায় তুলে নিয়ে গেলো। টুলে বসতে যাবো নিজের জায়গায় ফিরে, গলা পেলাম পেপির। হ্যাঁকোড়বাবু কিন্তু পরের রাউন্ডেই। যেন মনে থাকে–এখান থেকে সরে যাও। ওয়ালারও চমকে উঠলো আমার গলার আওয়াজে। ওয়ালার স্পঞ্জ করতে লাগলো আমার মুখ পেপিকে সরিয়ে দিয়ে। ভারী হয়ে এসেছে ওর নিশ্বাস উত্তেজনায়। হচ্ছে ভালোই।

নজর রাখো ওর ডান হাতটার ওপর ব্যাটা মারতে পারে ওই হাতেই। তাকালাম রিংয়ের অন্য প্রান্তে, খাটছে পাগলের মতো ছোকরার লোকগুলো। স্মেলিং সল্ট একজন ধরেছে নাকের কাছে, কাঁধের পাশে আর একজন দলাইমলাই চালিয়েছে।

কি বলো তাহলে শেষ হয়ে এলে লড়াই? একটা রাউন্ড আর–। হু যাক–সকলের কাছে মনে হয়েছে তো লড়াই বলেই, তুমি কাউকেই ঠকাওনি।

ওয়ালার বললো মৃদু গলায়। এবার চোখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকালাম রিংয়ের বাইরেও হাসছে। স্বাগত জানালো আমাকে হাত তুলে। বাজলো শেষ ঘণ্টা।

দাঁড়ালাম উঠে। মনে হচ্ছে পরিশ্রান্ত, অনভ্যাস অনেকদিনের। দুপা এগোতেই এবার ছোকরা রক্ষণাত্মক কায়দায় লড়ছে। লক্ষ্য করলাম ছড়ে গেছে নাকের পাশে, ক্ষত চোখের নীচে, অসংখ্য লালচে দাগ পাজরায়। কোণায় ঠেলে নিয়ে একটা প্রচণ্ড ঘুষি মারলাম ওর রক্তঝরা নাকের ওপরই। আবার শুরু করলে রক্ত পড়তে ঝলকে ঝলকে। হয়তো ও পড়েই যেতো আমি না ধরলে। বলে দিলাম কানে কানে দাঁড় করিয়ে দিতে দিতে ঠিক আছে মারো কষে পেলুবাবু। ছেড়ে দিয়ে সরে গেলাম।

ছোকরা হাওয়ায় বাঁ হাত ছুঁড়লো। মুখোমুখি হলাম এবার সুযোগ দিয়ে ওকে মারবার। একটা আপার কাট আমার চোয়ালে বসালো কোনো রকমে, বসে গেলাম হাঁটু ভেঙ্গে। আমার লাগেনি খুব বেশি কিন্তু আমাকে তো হারতে, হবে এই রাউন্ডেই, কাজেই দরকার তার প্রস্তুতি। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে সম্ভবত মিয়ামি থেকে এবারের গণউল্লাস। রেফারী গুনতে শুরু করলো আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে। আড়চোখে তাকালাম ছোরার ওপর। ওর চোখেমুখে স্বস্তির ভাব। দাঁড়িয়ে আছে হেলান দিয়ে দড়ির ওপর। কাঁপছে হাঁটু, ঝাঁকিয়ে নিলাম মাথাটা। চোখে দেখছি সরষে ফুল ভাবটা যেন। খাড়া হয়ে গেলাম ছয় গোনর সঙ্গে সঙ্গে। চোখে চোখ পড়লো ছোকরার। পটে লিখা ওর মুখটা যেন।

আমি আর উঠবো না ছেলেটা নিশ্চিন্ত ছিলো, তাই ও দুপা পিছিয়ে গেলো আমি উঠতেই। আরও একবার চিৎকার উঠলো দর্শকের। এবার সে উল্লাসে বিদ্রুপের ছোঁয়া। ওকে চেষ্টা করলো উত্তেজিত করার ছোকরার সমর্থকরা। ও এগিয়ে এলো ঘোর অনীহায়।

পেছোলাম–শুরু হলো আমারও অভিনয়। আমি ফেরত দিলাম মার সঙ্গে সঙ্গে ও বাঁ হাত চালাতে। মিয়ামির ছেলেটা ক্ষিপ্ত হলো যন্ত্রণায়। আগুনের টুকরো যেন চোখ দুটো। আবার পড়ে গেলাম মার খেয়ে। পেলাম তাই যা চেয়েছিলাম। বেশ ছিলাম প্রথম কয়েক মুহূর্ত–চোখ মেলোম আতে। পড়ে আছি মুখ থুবড়ে। পাশ ফিরে দৃষ্টি ফেরালাম। রিংয়ের বাইরে। উঠেদাঁড়িয়েছে আমার প্রেরণা, অজস্র ধিক্কার নিয়ে বিস্ফারিত চোখেও চেঁচিয়ে উঠলো চোখে চোখ মেলতেই। ওঠো লড়ে যাও উঠে, কেঁচো কোথাকার! এতো কাছে ও আমার, ছোঁয়া যায় হাত বাড়ালেই। উঠে পড়েছে আশে পাশের মানুষও–ধিক্কার তাদের কণ্ঠেও, কিন্তু আমি তো শুনছি শুধু ওর কথাই। জেনি ওঠরাস্তা নেই। আর ফেরার

ও বিকৃত গলায় বলে উঠলো। ক্রোধে ওর চোখে, হতাশা আর ধিক্কারের ছায়া–একের পর এক। আমার সারা শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত শিহরণ–চেয়েছিলাম এই তো। আমার কথা তো ছিলো না পেট্রেল্লির কথায় চলার, প্রেরণার মুখ বিকৃতিই পথ বাতলে দিলো আমার। শুনতে পাচ্চি রেফারীর গলা, সংখ্যার অনুরণন ভেসে আসা যেন কত দূর থেকে সাত–আট...উঠে পড়লাম কোনোরকমে ছোঁড়াটার হাত বাঁচিয়ে ও এগোতেই আর এক পা, দস্তানার বাঁধনে জড়িয়ে ধরলাম ওকে মৃত্যু আসে আসুক। ছেলেটা ব্যর্থ প্রয়াস চালালো অক্টোপাশের বাঁধন থেকে মুক্ত হবার...আমার মন ফাঁকি দিতে চাইছে পেট্রেল্লিকে। হারছেও–ওকে মরতে হবেআমাকে মারতে না পারলে। আমার আর দরকার কটা সেকেন্ড হালকা করার জন্য মাথাটাকে। সজোরে ঘুষি কলাম বাঁ হাতে বাঁধনমুক্ত হবার আগে।

মিয়ামির সেরা লড়িয়ে তেড়ে এলো হিংস্র শ্বাপদের পায়ে...কিন্তু আর তো পাবে না আমার নাগাল, ব্যাটাকে খেলিয়ে চললাম...তিনবারের পর চতুর্থ বারে ডান হাতে সোজা

হুক চালালাম আমার আওতায় পেয়ে–ছেলেটা ছিটকে পড়লোকাটা পাঁঠার মতো, রক্তে লাল সারা মুখ। না, সাড়া নেই কোনো মিয়ামির ছেলে অনড় পড়ে আছে। অনেক আশার ধন পেট্রেল্লির।

ব্যাপারটা বুঝলো রেফারীও, তবু ত্রুটি নেই তার কর্তব্যে। শুরু হলো গোনার পালা..শেষও হলো...কিন্তু পড়ে রইলো মাটি আঁকড়েই প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার হাতটা তুলে নিয়ে রেফারী এগিয়ে এসে ঘোষণা করলো ফ্যাকাশে মুখে, বিজয়ী–ফারার আজকের লড়াইয়ে। কাঁপছে ওর হাত।

আমার চোখ চলে গেলো রিংয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েছে মানবী, উত্তেজনায় উথাল–পাথাল তার ভরা বুক–চুম্বন ছুঁড়ে দিলো আমার দৃষ্টি মিলতেই।

তৎপর হলো কাগজ আর ক্যামেরার লোক আর দেখতে পেলাম না ওকে। এগিয়ে এলো ভিড় ঠেলে পেট্রেল্লি চাপা হাসি ঠোঁটে। তাকালাম চোখেরদিকে–সেখানে দেখা দিয়েছেআগুনের হলকা, ফারার সাবাশ–কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে যাবে তোমার প্রাপ্য–ছোকরার ম্যানেজারের দিকে পেট্রেন্নি সরে গেলো। আমার কাঁধে ফেলে দিলো ড্রেসিং গাউনটা ওয়ালার নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে।

পেপিকে দেখতে পেলাম রিংয়ের বাইরে বেরোতে দাঁড়িয়ে মুখে নরকের হাসি নিয়ে। লোকের ভিড় আমি নিশ্চিন্ত সাজঘরে যতক্ষণ থাকবে কিন্তু সরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা–আর পারছি না ভাবতে..ওয়ালারও সঙ্গেই সাজঘরে ফিরছিলো, বারবার ভয়ার্ত চোখে তাকাতে লাগলো দরজার দিকে পরিচর্যা পর্ব শেষ হতেই। এসেছিলো টম রোশও,

কিন্তু থাকতে দিলাম না ওকে বেশিক্ষণ–আমি চাই না আমার জন্য ও বিপদে পড়ুক। ঘরে জটলা চলছে কাগজওলা আর গুণমুগ্ধদের–ওরা আলোচনায় মুখর কে কবে জোরালো মার দিয়েছে হেভীওয়েট লড়াইয়ে, আর কারও দৃষ্টি নেই আমার ওপর। ওয়ালারের দিকে ফিরলামটাইয়ের গিট দিতে দিতে, অনেক ধন্যবাদ ভাই ওয়ালার–তুমি এবার এসো–মুছে নিলো ঘামচপচপে মুখটা হাতের উল্টোপিঠে অতিকায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটা। জনি সব করতে পারি তোমার জন্য সে গলা নামিয়ে দিলো, জলদি সরে পড় এখান থেকে–ওরা একা পেলে তোমাকে...তোমার কিন্তু উচিত হয়নি ওটা করা।

কোনটা? কি হয়নি উচিৎ। আমার হাত থমকে গেলো গিটে। আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নামছে সেই হীমশীতল অনুভূতি–তাকালাম ফিরে কালো হরিণ চোখ সেই বেশে দাঁড়িয়ে আছে চোখে চোখ রেখে আমার। জনি তোমার কি করা উচিৎ হয়নি। মেয়ে আবার প্রশ্ন রাখলো।

ওয়ালারকে যেতে দেখলাম লঘুপায়ে ঘর ছেড়ে। স্তব্ধ জটলার কাকলি–ক্ষুধার্ত চোখে মেয়েটাকে ওরা লেহন করছে। বলে উঠলো ওদের একজন, চলো হে, সরে পড়া যাক–মনে হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন নেই থাকার সাহেবের কাছে। ফোয়ারা ছুটলো হাসির মানুষগুলো যেন মজার কথা জেনেছেদুনিয়ার–ওরা একে একে বেরুলো। নৈঃশব্দনামলে সারা ঘরজুড়ে। বললাম বেশ খানিক পরে কি খবর। টাকা পেলেন বাজির?

তাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী মনে হয়েছে।

তাহলে তাকেই তো আপনার জানিয়ে দেওয়া উচিৎ সেটা জানেন তো মেয়েরা স্তুতি পছন্দ করে। ঠোঁটে ওর দুষ্টু হাসি। বলছি তো তাকেই–সত্যি! বিস্তৃত হলো হাসি। কিন্তু শান পড়লো চোখে তোষামোদের কথা ওটা, ওসব বিশ্বাস করি না আমি, আর–লড়াইয়ের ব্যাপারটাও আমার সাজানো মনে হোলো। আপনি কি বোঝেন লড়াইয়ের? চেষ্টা করলাম হাসবার বুঝি। প্রায়ই আমি দেখতে যাই এখানকার লড়াইকাজেই, নতুন কিছু নয় এ ব্যাপার আমার কাছে–ঘটানো হয়ে থাকে ওগুলো, বললো একটু চুপ করে থেকে তা কেন মত পাল্টালেন?

ওই মেয়েটার জন্য, তাদের কথা ভেবে–আর বাজি ধরেছে কারা আমার ওপর। মেয়েটা তাহলে জায়গা জুড়ে রয়েছে দেখছি আপনার বুকের অনেকখানি

পূর্ণদৃষ্টি মেলে দিলো আমার দিকে, ভালো লাগছে আপনাকে আমার, হঠাৎ আমার খেয়াল হলোহাতে নেই তো সময়, আর কেটে পড়া দরকার ভীড় থাকতে থাকতে। বেরোতে গেলে ও–ভাবেই বেরোতে হবে পেট্রেন্নির চ্যালা দুটোর চোখে ধুলো দিয়ে কিন্তু বেরোতেই মন চাইছে না এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে।

আচ্ছা কে আপনি? বলুন তো এখানে এসেছেনই বা কেন? ওর চোখে তাকালাম। ও ভাবছে কি যেন, ব্যস্ত হবার দরকার নেই আমি কে তা নিয়ে–আমাকে ডাকবেন ডেলা বলে। এখানে এসেছি আমি জেনেই বিপদে পড়েছেন আপনি, এবং এর জন্যে দায়ী আমি। ঠিক বললাম তো? ঝিলিক উঠলোকালোহরিণ চোখে। হ, তা আর কি করবেন তার আর আপনি, না মানে–জানতে পারি বিপদটা কি ধরনের? আমার পিছু নিয়েছে দুটো মস্তান ধরতে পারলে–বুঝেছি খপ্পরে পড়েছেন পেট্রেন্নির–তাকে আপনি চেনেন?

চমকে উঠলাম, কে না জানে ওরকথা? ওরনামটাই জানি আমি অবশ্য–প্রবৃত্তি বা ইচ্ছে নেই পরিচয় করার কিন্তু সময় নষ্ট করছি আমরা বোধ হয়, বের করে নেওয়া দরকার আপনাকে এখান থেকেও বাইরে তাকালো জানলার দিকে এগিয়ে।

আপনি এই জানলা দিয়ে নেবে নিশ্চয়ই যেতে পারবেন ওই গাড়ি রাখার জায়গা পর্যন্ত? অনুসরণ করলাম ওর দৃষ্টি। সেখানে এখনোদাঁড়িয়ে দু–চার খানা গাড়ি। আমার প্রথম সারির গাড়িটা ডান দিকের দ্বিতীয়–ডেলা দেখালো হাত বাড়িয়ে। আপনি ওখানে পৌঁছাতে পারলেই নিরাপদ সবার নজর এড়িয়ে।

দাঁড়ান আপনাকে জড়াতে চাই না এর মধ্যে বিপজ্জনক এই লোকগুলো করবেন না বোকামি জানতে পারবেনা ওরা–কিন্তু বাড়াবেননাকথা, আমি ফিরে যাচ্ছি গাড়িতে। এগোলো ডেলা, বন্ধ করে দিন দরজাটা নামতে শুরু করবেন আমি গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছলে। গাড়ি চালিয়ে আসবো আমি, উঠে পড়বেন আপনি। কিন্তু এতে বোধহয় খুশি হবেন না আপনার বন্ধু, আর আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন বোধহয় উনি; আঙুল বাড়িয়ে লোকটার দিকে দেখালাম, গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো।

লোকটাকে মনে হলো অধৈর্য। ডেলা ঠোঁটে, নিরস হাসি ফোঁটালো ও আমার স্বামী, বন্ধু না–ও দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলে দরজার দিকে, আমার লাগবে না পাঁচ মিনিটও কাউকে এখানে ঢুকতে দেবেন না–ডেলা অদৃশ্য হয়ে গেলো আমি মুখ খোলার আগেই। দরজা বন্ধ করে দিলাম ও বেরোতেই।

আমি একা, এখন একা। ফিরে গেলাম জানলায়। পায়চারী করছে ডেলার স্বামী। ধরালো একটা সিগারেট চমকে উঠলাম পেছনে একটা শব্দ হতেই। চোখ পড়লোদরজার হাতলের ওপর–চেষ্টা করছে কেউ ঘোরাতে–ঘুরল না হাতলধাওয়া শুরু করেছে ওরা। আমার দর্শনের জন্য ব্যাকুল ... হয়েছে স্টেডিয়াম ফাঁকা হতে। বাইরে সপ্তমে উঠেছে নাচের বাজনা। যথেষ্ট সোচ্চার।

দরজার ছিটকিনিটা দেখলাম সন্তর্পণে এগিয়ে, মনে হলো না খুব পোড়, কানে এলো বাইরে ফিসফিস কথা ও দুর্বোধ্য ভাষা; কিন্তু ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে গেলো তাতেই আমার। দরজার দিকে গেলাম ম্যাসাজের টেবিলটা টেনে নিয়ে, মনে ভয় ঢুকেছে। ওরা অনেক ভালো জানে আমার চেয়ে স্টেডিয়ামের আনাচ–কানাচ। জানে আমার পক্ষে শক্ত হবেনা জানলা দিয়ে নেবে পালানো। আমাকে নীচে খুঁজবেদরজা খোলার চেষ্টা ব্যর্থ হলে। ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেবে গাড়ি রাখার জায়গায় হাজির হবে তিন–চার মিনিটের মধ্যেই, নামতেও শুরু করেছে বোধহয়–কিছুকরা দরকার এখুনি। দরজার ওপর শারীরিক প্রয়োগের শব্দ উঠলো জানলার ওপর পা চড়িয়ে দিতেই। কার্নিশে নেমে গেলাম, ফিরে তাকালাম না। পা পিছলে গেলো পাইপে পৌঁছবার আগেই শুন্যে উঠে গেলো শরীরের বেশ কিছুটা অংশ।

তারই মধ্যে নখ বসালাম অসমতল ক্রংক্রীটের দেওয়ালে কোনোরকমে। পা ফিরিয়ে আনলাম কার্নিশে কোনোরকমে। নামতে লাগলাম এগিয়ে পাইপ লক্ষ্য করে। লাফিয়ে পড়লাম মাটিতে, মাটি থেকে ফুট দশেক ওপর থেকে। শব্দ উঠলো গাড়ির ইঞ্জিন চালু হবার দ্রুতগামী পায়ের আওয়াজও সেই সময়। থমকে গেলাম গাড়ির দিকে ছুটে যেতে গিয়ে অনেক নিরাপদ এখানকার দেওয়ালের ছায়া, আলো ঝলমল গাড়ি রাখার জায়গাটা।

নেভানো হেডলাইট গাড়িটা এগোচ্ছে আমার দিকে। আমার ডান পাশটা স্বল্পালোকে নজর পড়লো–পেপি নিশ্চল দাঁড়িয়ে একশো গজ দূরে আমার থেকে তার চোখ স্থির সাজঘরের জানলায়। আওয়াজ উঠলো একটা প্রচণ্ড। ভেঙ্গে গেলে সাজঘরের দরজা কমে এলো গাড়ির গতি ডেলার গলা পেলাম আমার সামনে আসতেই, শীগগির উঠে পড়ুন।

উঠে বসতেই গাড়িটা বিদ্যুৎগতিতে এগোলো একটা ঝাঁকি দিয়ে। ডেলা হাত দিলো হেডলাইটের বোতামে, দেখতে পায় নি তো আপনাকে? বলতে পারছি না ঠিক–তাকালাম পেছনে। পেছনেবসে কালো চুলো লোকটা। ডেলা পরিচয় দিয়েছেযাকে ওর স্বামীবলে। অন্ধকারে ঠাহর হচ্ছে না ওর মুখটা। চোখ মেলে দিলাম লোকটার মাথার পেছনে, না, চিহ্ন নেই কোনো অনুসরণ কারী গাড়ির। এখনো পিছু নেয়নি ওরা কেউ–এবার ফেটে পড়লো ডেলার স্বামী। মাথা খারাপ হয়ে গেছে ডেলা তোমার। দরকার নেই যাবার এই সব উটকো ঝামেলার মধ্যে, নামিয়ে দাও এ লোকটাকে। হেসে উঠলো ডেলা। পেলে তুমি বসো তো চুপচাপ, শেষকরে দিতে চাইছিলো ওকে ওরা। আর এটা হতে দেওয়া যায় না এক হাজার ডলার জেতার পর।

বোকা মেয়ে, সব সময়ই মাথা গলাবেই একটা না একটা ঝাটে–লোকটা স্বগতোক্তি করলো। আবার ডেলা হেসে উঠলো, দারুণ রোমাঞ্চকর আমার কাছে এর প্রতিটি মুহূর্ত। ঠিক আছে আসনে গা এলিয়ে দিলো একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে লোকটা, তাহলে জলদি বেরোও এ নরক থেকে, গরে একে ছেড়ে দিও রাস্তায়–ডেলা আমাকে আড়চোখে দেখলো।

আমার গায়ে একটা ঠেলা দিলো ডেলা, ওকে সে কথা বলতেই হতে পারে, শুয়ে পড়ুন তো আপনি নীচে। আরও কয়েকখানা গাড়ি আমাদের আগে, লাইন ধরে এগোচ্ছে ধীরে–ডেলাকে চলতে হচ্ছে পেছন পেছন মৃদু গাড়ির গতি। দেখুন, উঁকি দিচ্ছে সব গাড়িতে ব্যাটারা। বেরোলে পরে অন্য গাড়িগুলো। শেষ হলোনা ওর কথা, পল বলে উঠলোবিকৃতগলায়, গাড়ি আসছে পেছনে একটা দারুণ জোরে। নেমে যাই বরংআমি–চুপ। ডেলা জোর করেনামিয়ে দিলো আমার মাথাটা কথা থামিয়ে দিয়ে, বলছি যা করুন–ডেলা তাকালো পেছনে।

আমি মুখ নামাতে চোখ আটকে গেলো ডেলার নিটোল পায়ের গোছে–জুতোয় মোড়া সাদা বাস্কিন চামড়ায়। পেছনের গাড়ি মারতে শুরু করেছে হেডলাইট। পেছন থেকে হর্ন বেজে উঠলো ডেলা গতি কমাতে।

কেন থামাচ্ছো–চালিয়ে যাও মাঝরাস্তা দিয়ে পলের অধৈর্য গলা। গেট সামনে। মাথা তুলবার চেষ্টা করলাম গাড়ির গতি বাড়তেই, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেলো পাহারাদারদের একজনের সঙ্গে, অ্যাই এক মিনিট উত্তেজিত গলায় সে গাড়ির হাতল ধরে ফেললো কথাগুলো ছেড়ে দিয়েই। আমি হাতল ধরে রাখলাম প্রাণপণ শক্তিতে, খুলল না দরজা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডেলা পায়ের চাপ বাড়ালো অ্যাকসিলারেটারে; স্পিডোমিটারের কাটা নব্বইয়ের ঘরে উঠলো কাঁপতে কাঁপতে, বিরানব্বই, তিরানব্বই, চুরানব্বইতে করতে লাগলো লটপট। তীব্রতা কমছে পেছনে আলোর দূরত্ব বাড়ছে দুটো গাড়ির। আর পাচ্ছে না ওরা আমাদের।

রাস্তায় জোয়ার এলো আলোর। আরে সামনে বাঁক আছে, দেখে চালাও। গতি একটু কমাও না, পল চেঁচিয়ে উঠলো, ক্ষিপ্ত গলায়। সে ঝুঁকে বসেছে।

আঃ, কোরো না তো, গলা চড়ালো ডেলাও। তাকালাম আবার ফিরে। খুব পেছনে পড়ে নেই পেছনের গাড়ি, মনে হোল দুশো গজের মধ্যেই। বাঁকের মাথায় ডেলাকে কমাতেই হোলো গাড়ির গতি, পেছন থেকে অনেক কাছে এসে গেলো বিশাল ক্যাডিলাকটাও।

ডেলা জুড়ে রেখেছে রাস্তার মাঝখানটা, কাটা ওঠা নামা করছে সত্তরের ঘরে; গতি অনেক বেশিই বলা যায় এরাভার তুলনায়। সামনে গাড়ি সাবধান। সামনে এগোতে দেখে ককিয়ে উঠলাম। বাঘের জলন্ত চোখের মতো দুটি হেডলাইড। ডেলা পা সরিয়ে নিলো আলো নিভিয়ে দিয়ে অ্যাকসিলারেটার থেকে। বাদুরের মতো গাড়িটা এগোচ্ছে পাখনা ঝাঁপটে। পেছনে আওয়াজ পেলাম ব্রেক কষার–তাকালাম, থেমে গেছে ক্যাডিলাক। আমাদের গাড়ি ডাইনে ঘুরলো একটা ঝাঁকুনি দিয়ে।

চোখ ফেরালাম সামনে রাস্তার মাঝবরাবর গাড়ি একেবারে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে চায় আমাদেরই ওপর চোখ ধাঁধানো আলোর সম্ভার নিয়ে আরো ডাইনে সরলো ডেলা–লাফিয়ে উঠলো পেছনের চাকা দুটো। ডেলা স্টিয়ারিং নিয়ে প্রচণ্ড কসরৎ চালালো। সোজা রাখার জন্য গাড়ি। কিন্তু আমাদের যেন দেখতেই পাচ্ছে না সামনের গাড়িটার চালক–চিৎকার করে উঠলো পল–গাড়িটা বেরিয়ে গেলো বেন্টলের গা ছুঁয়ে। কানে এলো ডেলার আর্তনাদ–সামনের ঝোপে গিয়ে পড়লো মড়মড়িয়ে অন্য গাড়িটা।

আমি আঁকড়ে ধরলাম ড্যাশ বোর্ড শূন্যে উঠতেই। আমাদের গাড়িটা মাকড়সার জাল হয়ে গেলো কাঁচ ভেঙ্গে। শব্দ উঠলোকাঠ ফাটার। প্রবল ঝাঁকুনি। একটা সাদা আলোর ঝলকানি। একটা তীব্র আর্তস্বর ভেসে আসছে ডেলার। এসবের মধ্যে মিলিয়ে গেলো আলোআমার চোখে নেবে এলো আঁধার। আয়োডফর্ম আর ইথারের গন্ধে আমি হাসপাতালে মালুম হলো। পারলাম না চেষ্টা করেও চোখের পাতা খোলবার, পাতা ভারী হয়ে আছে।

২. সাঁতরে চলেছি কুয়াশার সাগরে

ভালো কি একটু? আমার অনুভব নারকীয়, বলতে পারলাম না ওর প্রত্যাশা ভরা চোখে তাকিয়ে। চোখ বুজলাম ঠোঁটে হাসি ফোঁটাবার চেষ্টা করে। আর এক অনুভূতি চোখ বোজার পরেই–আলোর কাঁপুনি পাতার আড়ালে–যেন সাঁতরে চলেছি কুয়াশার সাগরে–কিসের ভাবনা? সে স্রোতে ছেড়ে দিলাম নিজেকে। একবারই ত মরে মানুষ।

যেন থমকে গেছে সময়। বাড়ছে আধার–চলে গেলাম নৈঃশব্দের আর কুয়াশার রাজ্যে রইলাম সেই অবস্থায় অনেক–অনেকক্ষণ। আলোর কাঁপুনি আবার শুরু–আমি শুয়ে বিছানায় আমার হাতটাছুঁলো চাদরের প্রান্ত। আমার সামনে সরে আসতে বুঝলাম চোখে আলো, মনে পড়লো পাশে পর্দা, এই ব্যবস্থা তো থাকে মুমূর্ষদের বিছানা ঘিরেই। তাকাতে টুপিটা ঠেলে দেওয়া মাথার পেছনদিকে, মুখে আঁকিবুকি কঠিন রেখার।

খড়কে চুষছে দাঁত খোঁচার। বিরক্তির স্বাক্ষর মাংসল মুখে পুলিস চিহ্নিত সারা অঙ্গে। হাওয়া খেতে লাগলো টুপিটা হাতে নিয়ে আমাকে চোখ মেলতে দেখে, আমার কি ভাগ্যি লিখে দিয়েছিলাম খরচার খাতায় আমি তো তোমাকে। সেবিকা বেরলো পর্দার আড়াল থেকে না–এটি তন্বী নয় সেই মেদবহুল।

বলুন ত কি ব্যাপার? মনে হচ্ছে যেন ভেসে আসা অনেকদূর থেকে নিজের কানেই আমার কথা। বলবেন না কথা–শুয়ে থাকুন চুপচাপ–ধমকে উঠলো সেবিকা। ঘুমোবে। ধূর শুনতে হবেওর কাছে সব–নার্স কেটে পড়ুনতোআপনি–বিড়বিড় করে উঠলো আইনের খুঁটি, ভাইটি, তুমি বলতে চাও তো কথা, না?

আবার আমার চোখ বুজে এলো সার্জেন্ট সাহেব। এবার সেই সাদা কুর্তাকে চোখ মেলতে দেখলাম, কেমন আছি আমি? ডাক্তার দেখালেন মশাই আপনি ভেস্তালকি। ভালো করে তাকালাম, আমার ওকে ভালো লাগলো। কোথায় আমি?

চেষ্টা করলাম মাথা তুলতে, কিন্তু ভারী বড্ড-অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিলো আপনার একটা, তা, সেরে উঠেছেন ও কিছু না-ঢুকলো পুলিস সাহেব, এখন কথাবলা যাবে তো ওর সঙ্গে? প্রশ্ন দু-একটা। ঘটাবো না কোনো অস্বস্তি ভালো নয় ওর আঘাতটা, তাড়াতাড়ি করুন- সরে দাঁড়ালো ডাক্তার। পেনসিল হাতে, এগিয়ে বসলো সার্জেন্ট। মেলা নোটবইটা। কি ভাই তোমার নাম? বোলো না যেন উল্টোপাল্টা, আমার সব জানা দরকার

জন ফারার ঠিকানা? নেই কিছু বলছে শয়ন হট্টমন্দিরে? ও হাসলো দাঁতের ফাঁকে।

বলা যায় বাউণ্ডুলেও-চেষ্টা করলাম আমিও হাসবার। লোকটা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কড়িকাঠের দিকে তাকালো একটা ফুঁ দিয়েও নিলো, আচ্ছা বেশ। তা ঘরণী, বাপ-মা, বা অন্য কেউ তাদের। পাত্তা নেই কেউ। আমিও চোখ তুললাম কড়িকাঠে। পুলিস সাহেব এবার ফিরলো ডাক্তারের দিকে। আপনাকে বললাম তো আমার নাড়ি ধরলো ডাক্তার, উনি এখনো আসেন নি কথা বলার অবস্থায়

আরে দাঁড়ান দাঁড়ান-পুলিস বাবাজী বলে উঠলো পেনসিল চিবোতে চিবোতে, সবকিছু তো আমাকে জানতে হবে।

এবার সে ঘুরলো আমার দিকে, কেউ নেই তোমার ওয়ারিসন, এই তো? ঠিক আছে ভাই তা, কে ঐ মহিলটি–পাওয়া গেলে তোমাকে যার সঙ্গে? এবার মনের চোখে ভেসে উঠলো। একটা ছবি। কামার্ত একটা মুখচ্ছবি আর কালো কালো চুল একরাশ

ডেলা বলে ডাককেন আমাকে ও বলেছিলো। বলেনি পদবী কিছু? জানিনা–একটা অদ্ভুত শব্দ করলো পুলিস সাহেবনাকে বলা যায় আর্তনাদও। কেমন আছে ও? খুব বেশী কি আঘাত? প্রশ্ন করলাম।

চিন্তা করবেন না ভালোই আছে–ও মুখ খোলার আগেই ডাক্তার বলে উঠলো। তিনি ওর স্বামী? কে আবার সেটি? পুলিস আমার দিকে তাকালো ছানাবড়া চোখে, যেন আমাকে ভূতে পেয়েছে। বসেছিলেন পেছনে, পল ওর নামও বলেছিলো তিনি কেমন আছেন?

ওর জন্যেও আপনাকে চিন্তা করতে হবেনা–এবারও ডাক্তারই কথা বললো পুলিসসাহেব মাথা নাড়লো কপালে হাত রেখে। জানতে পারি কি করে ঘটলো ব্যাপারটা? তার গলায় আশার সুর ধ্বনিত হলো না তেমন। এদের তো বলা যাবেনা পেটেল্লির খবর। আমি ভুলে যেতে চাইলাম গাড়ির ব্যাপারটা চোখ বুজে।

না, গেলোনা তো ভোলা। বললাম, বেশ কিছুক্ষণ পরে, বেশ জোরেই একটা গাড়ি আসছিলো সামনের দিক থেকে। শালারা যেন দেখতেই পাচ্ছিলো না আমাদের–ও, মানে–ডেলা চেষ্টা করছিলো সরে যাবার, কিন্তু পারলো না–গাড়িটা হুমড়ি খেয়ে পড়লো প্রায় আমাদের ওপর। কি হয়েছে ও শালাদের? লম্বা নিঃশ্বাস গলায় একটা, সার্জেন্ট আমাকে মাপলো আপাদমস্তক।

থাক চাদু ওসব কথা–আসা যাক কাজের কথায়। বাউণ্ডুলে তুমি তো–তা বাবাজী, ঘুরছিলে কেন বুইক চড়ে? ভূত দেখার পালা এবার আমার। বুইক নয় গাড়িটা বেন্টলে। মেয়েটাই চালাচ্ছিলো। ওর পাশে আমি বসেছিলাম–পেছনে স্বামী, উঠলাম হাঁফিয়ে। যাঃ এ যে শ্রাদ্ধ ভূতের বাপের।

টুপি সরিয়ে চাদি ঘষে নিলো রুমাল দিয়ে। জোরে টেনে দিলো টুপিটা বাপু শোনো–তুমিই গাড়িটা চালাচ্ছিলে মেয়েটা বসে ছিলো পেছনে–কেউ ছিলো না ভাতার–মাতার–সে আঙুলটা মেলে দিলো আমার দিকে ঝুঁকে। আর বুইক ছিলো গাড়িটা।

এবার আমি খেপে গেলাম, দূর মশাই আপনি ভুল করছেন–মুঠোয় ধরলাম বিছানার চাদরটা, মেয়েটাই গাড়ি চালাচ্ছিলো বলছি তো–বেন্টলে গাড়ি কালো রঙের। অন্যদিক থেকে এসে ধাক্কা দেয় একটা গাড়ি–চেপে ধরুন ড্রাইভারটাকে, বলবে সেই শালাই। মামা নোট বইটা নাচালো। আমার নাকের ওপর, গাড়ি ছিলো না অন্য কোন।

আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে বলতো? কি আছে লুকোবার, অ্যাঁ?

থামুন তো এবার অনেক হয়েছে

রুক্ষ গলা পেলাম ডাক্তারের। চিৎকার করে দরকার নেই বের করার ওর কানের পোকা। ভালো না ওর অবস্থা–সার্জেন্ট, একলা ওকে থাকতে দিন, লুকোইনি আমি কিছুই–চেষ্টা করলাম উঠে বসতে। পারলাম না। আবার ঝলসে উঠলো মাথার আলো–ছিটকে পড়লাম আঁধারে। সারা ঘর ভরে গেছে দিনের আলোয় যখন জ্ঞান হলো। পর্দাটা সরে গেছে পায়ের দিকে, শুধু রয়েছে পাশের দুটো।

চোখে পড়ছে সামনের খাটটা বেড়েছে কোলাহল। বুঝলাম আমাকে আনা হয়েছে ওয়ার্ডে। নজর করলাম ভালো করে কেউ নেই। মনে হচ্ছে অনেক সুস্থ, যন্ত্রণাটাও গেছে মাথার–যদিও শুকোয়নি ঘাটা। তুললাম হাতদুটো, উঠলো অনায়াসে। ভাবতে শুরু করলাম সার্জেন্টের কথাগুলি–অস্বস্তি বাড়লো ভাবনায়।

গাড়ি ছিলো না অন্য কোন। ও বলছে, স্বামীও না, বুইক গাড়ি। আর আমিই ছিলাম স্টিয়ারিঙে–লোকটা তাহলে কি বলতে চাইছিলো? নাকি আমি দর্শন করেছি স্বপ্নে হয়তো কুয়াশারই ফসল লোকটা হাতাইনা, হয়তো আমাকে গুলিয়ে ফেলে। অন্য কারুর সঙ্গে। ডাক্তার বেরোল পর্দার আড়াল থেকে, মুখে একগাল হাসি।

ভালোই তো আছে দেখে মনে হচ্ছে–তা আছিতাকিয়ে নিলাম একমুহূর্ত ডাক্তারের চোখে। আচ্ছা, বলুন তো এখানে কতদিন আছি?

সে চোখ বুলিয়ে নিলো খাটের পায়ায় লটকানো কাগজটায়। এখানে ভর্তি করা হয়েছে আপনাকে ৬ই সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে এগারোটার সময়। বারো তারিখ আজছদিন হলো,

সেপ্টেম্বর?

হ্যাঁ–তাই তো। কেন? বিস্ময় ডাক্তারের চোখে। কি করে হবে সেপ্টেম্বর, বলুন জুলাই।

লড়াইয়ের দিনটা ছিলো উনত্রিশে–আর দুর্ঘটনাটা ঘটে সেই রাতেই, জানি না তো তা–তবে ৬ই সেপ্টেম্বর আপনার ভর্তির তারিখটা আমি স্থির নিশ্চিন্ত এসম্পর্কে, উই আমাকে খুঁজে পাবার আগে বলছেন আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম এক মাস ধরে?

হাসি ফুটলো ডাক্তারের ঠোঁটে, না, তা নয়–আপনাকে তো পাওয়া যায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সেখানে আওয়াজ শুনে ছুটে যায় পুলিসের এক টহলদার কনস্টেবল–অবশ্য সে বলতে পারেনা কি করে কি হলো তবে সে হাজির হয়েছিলো ঘটনার মিনিট দুয়েকের মধ্যেই। ওরা এখানে আনে আপনাকে তার ঘন্টা খানেক পরে। চেটে নিলাম ঠোঁট জিভ দিয়ে ডাক্তার ঠাট্টা করছেন? ডাক্তারসলে বিছানার এই কোণে, না, তবেমাথা খারাপ করার তো কিছু নেই এই নিয়ে আপনার। এ অবস্থা চলবে আপনার এখন বেশ কিছুদিন, মনে হবেসব এলোমলো ঘটনা–দিনক্ষণ অতীত। তারপর, ক্রমে ঠিক হয়ে যাবে সব। স্বাভাবিক হয়ে আসবে স্মৃতিশক্তি। সে একটু থেমে বললো, একটা কথা আর, জ্বালাতে দেবেন না বেশী খোচড়গুলোকে। আমি বলেদিয়েছি ওদের। ওরা সাহায্য চায় আপনার–ওরা এটা উপলব্ধি করেছে যে স্বেচ্ছাকৃতনয় আপনার ভুলগুলো। আপনার শুধু বিশ্রাম চাই এখন পূর্ণ বিশ্রাম।

আর কি শুধু সময়ের ব্যাপার–উদার ডাক্তার মানুষটা অনেক করেছে আমার জন্য, কৃতজ্ঞ আমি। কিন্তু এতে ছেদ পড়ছেনা তো আমার ভাবনার। জানি আমি তো, আমার লড়াইয়ের দিনটা ছিলো উনত্রিশে জুলাই মিয়ামির ছোঁড়াটার সঙ্গে আর সংঘর্ষটা ঘটেছিলো সেই রাতেই। ঘটনার হেরফের হবেনা তাতেও যাই বলুক। ডাক্তার আর তর্ক করে লাভ নেই এব্যাপারে। একটা উপকার করবেন আমার? নিশ্চয়, বলুন। ডেলা–মানে এখানে নিশ্চয় আছে সেই মেয়েটাও, ওকেই করুন না জিজ্ঞাসা–সে আপনাকে খুলে

বলতে পারবে উনত্রিশে জুলাইয়ের ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করতে পারেন ওর স্বামীকেও, সেও বলবে একই কথা।

মুখের হাসি তরুণ ডাক্তারের মিলিয়ে গেলো, আচ্ছা, ধরা যাক এ ব্যাপারটাই–স্বামীর ব্যাপারটা ওর ওই-এরকম পাওয়াই যায়নি তো। গাড়িতে ছিলেন ওই মহিলাটি আর আপনি আওয়াজ উঠলো বুকে টিকটিক, বেশ তো বললাম খানিক পরে মানলাম–গাড়িতে ছিলো না আর কেউ। তাহলে জিজ্ঞাসা করুন ওই ডেলাকে আপনারা এটা তো মানছেন ও ছিলো জিজ্ঞাসা করুন ওকে যান

কষ্ট হচ্ছিলো বলতে একসঙ্গে অনেক কথা। ডাক্তার হাত চালিয়ে দিলো তার মসৃণ কালে চুলে। নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে ঠোঁটের হাসি, এটা আপনাকে জানাতাম না দুদিন আগে হলে–কারণ অবস্থা ছিলো না আপনার শোনার মতো। এখন বলি–ঘাড় মটকে গিয়েছিলো মহিলাটির। পাওয়া যায় যখন আপনাকে, বেঁচে নেই উনি তখন পুলিস লেফটেনান্ট বিল রিস্কিন এলো বিকেলে। সন্দেহ থেকে যেতো ওর পদমর্যাদা সম্পর্কে নার্স পরিচয় করিয়ে না দিলে।

বিষাদের ছোঁয়া কেমন একটা উত্তর চল্লিশের ছোট খাটো মানুষটার মুখে, নিরীহ একজোড়া চোখ শুড়ওলা চশমার ফাঁকে। রিস্কিন নিঃশব্দ পায়ে ঢুকলো টুপি হাতে নিয়ে। লোকটা কথা বলে অত্যন্ত নরম গলায়।

আমার উদ্বেগ বাড়লো কারণ ঘুম পাড়িয়ে গিয়েছিলো আমাকে মোটা সার্জেন্টটা হৈ–হুঁঙ্কার করে। কিন্তু এ তো রিস্কিন বসলো আমার বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে। নজরে

পড়লো ওর জুতো আর সাদা মোজা পায়ের ওপর পা-চাপিয়ে বসতে। সে নাচাতে লাগলো সরু পাটা।

ভাই কেমন আছো? রিস্কিন প্রশ্ন করলো মোলায়েম গলায়।

ভালোই আছি বললাম। সেই সঙ্গে আবার মুঠোয় নিলাম চাদরের কোণাটা। সন্দেহ করছি ওকে-ঘেমে গেছি, শুধু ওকে কেন সবাইকে।

আচ্ছা, বিকৃতমস্তিষ্ক ভাবছে কি ওরা আমাকে? কে জানে। তুমি বিপর্যস্ত ডাক্তার বলেছিলো কিন্তু কেন তা হবে। তোমার আগে অনেকেই পেয়েছে তোত মাথায় চোট, স্মৃতিভ্রংশও হয়েছে তাদের সাময়িক। এখন আমার ওপর ওসব ছেড়ে দিয়ে একটু হাল্কা হওতো চিন্তা ভাবনার ব্যাপারটায়। লেফটেনান্ট সাহেব পা নাচিয়ে চললো।

তাহলে এই রকম দাঁড়াচ্ছে ঘটনাটা-মারা গেছে মেয়েটা। তাহলে সে পালিয়েছে। তোমাকে যদি কেউ মেরেও থাকে। আমাদের কাজ হচ্ছে তাদের শিক্ষা দেওয়া এই লোকটাকে এবং তার দলবলকে খুঁজে বের করার কাজটা সহজ হবে তোমার সাহায্য পেয়ে, আর তুমিও চাও তাই তো-তাই না? চাই, বললাম।

রিস্কিন চোখে চোখ রাখলো আমার। আচ্ছা তুমি ভবঘুরে কি সত্যি?

হু গাড়ি চালাতে দিয়েছিলো মেয়েটা তোমাকে?

দিলাম না জবাব। ওরা বুঝলাম না কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছে আমার গাড়ি চালানোর ব্যাপারটায়। আমার ঘাড়ে কি চাপাতে চেষ্টা করছে ডেলার মৃত্যুর ব্যাপারটা? আবার বাড়লো অস্বস্তি। প্রশ্নটা পুনরুচ্চারণ করলো রিস্কিন তার স্বভাবশান্ত গলায়, সে মুখে হাসি ফোঁটালো আমাকে সাহস যোগাতে।

চালাচ্ছিলাম না আমি গাড়ি। বললাম গলা তুলে। মেয়েটাই চালাচ্ছিলো–পাশে ছিলাম আমি ওর স্বামী পেছনে ছিলো আর একথাকতবার বলতে হবে আপনাদের? ভেবেছিলাম এবার খেপে যাবে রিস্কিন। কিন্তু...না সে শুধু একটু হেলালো মাথাটা আরো স্পষ্ট হলো মুখে বিষাদের অভিব্যক্তিটুকু ভাই, আমি দুঃখিত–কোনো কারণ নেই তোমার উত্তেজিত হবার। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে আমার মনে হচ্ছে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে। হয়েইছে তো! ঐ সার্জেন্ট ভদ্রলোকটা আপনাদের যেতে দাও–ভাই যেতে দাও ওর কথা। ওতো শুধু লোক খেপাতে শিখেছে গলা হাঁকড়ে–দোষ লাইনের।

কিন্তু ওসব কিছুই আমি।

কথাটা রিস্কিন শেষ করলো হাসি দিয়ে। কিন্তু, থেকেই গেলো সন্দেহের রেশ–তবুও ভালো। লাগছে ওকে। কোত্থেকে তুললো বল তো তোমাকে মেয়েটা? হেঁটে চলেছিলে তুমিনাকি দিতে চাইলো লিফটব্যাপারটা কি হলো?

না। অনুমান ভুল আপনাদের। আমাকে বলতে দেবেন দয়া করে সব গোড়া থেকে? হ্যাঁ, চাইছি তো ঠিক তাই–ই... রিস্কিন নোটবই বের করে ফেললো দ্রুতহাতে পকেট থেকে। ভাই কিছু কিছু নোট করবো আপত্তি না থাকলে মনে থাকে না সব কথা–বয়েস হচ্ছে

তো–সে লেখার আসল ব্যাপারটাও বোঝালো চোখ মটকে। সব খুলে বললাম। বড়লোক হবার স্বপ্ন, পিটসবার্গের কৈশোর কাহিনী, কি করে এলাম পেলোট্রায়।

বললাম চোয়াল ভাঙার গল্প ম্যাক্রেডীর বললাম লুকোচুরির কথাটাও পেট্রেল্লির সঙ্গে। জানাতে ভুললাম না সে কথাও। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো ডেলা। সবিস্তারে বললাম পেপি–বেনোর উপাখ্যানও। সবশেষে বললাম ব্র্যান্টের প্রস্তাবিত গাড়ি আর টাকার কথাটাও। অনেক সময় গেলো কাহিনী শোনাতে–শেষে ফিসফিসানিতে নেমে এলোগ। তবু স্বস্তি পেলাম ভেবে সব বলতে পেরেছি। একটা কথাও বলেনি রিস্কিন সমস্ত সময়টা। কি সব লিখলো নোটবইতে সময় সময়। শেষে বললে কান চুলকে নিয়ে, যাক জানা গেলো তো সবই–তুমি ভাই একটা ঘুম দাও এবার শুয়ে, খুব পরিশ্রম গেছে।

পরিশ্রম যাচ্ছে আমারও, আর ঘুম কেড়েই নিয়েছে তো কর্তারাচলি তাহলে রিস্কিন উঠে দাঁড়ালো, আবার দেখা হবে দু–একদিনের মধ্যে। শোনা যাবে কিছু মনে পড়ে যায় তো এর মধ্যে কিছু–আর আমার বলার কিছু নেই, গা এলিয়ে দিলাম নিশ্চিন্তে। আচ্ছা, চলি তাহলে শুয়ে পড়, রিস্কিন ওয়ার্ড থেকে বেরোলো বেড়ালের পায়ে। কেটে গেলো দুটো দিন। বোধ করছি ভালো অনেকটা খুশী ডাক্তারও।

উঠতে পারবেন আপনি দিন দুয়েকের মধ্যেই হাসলাম, অন্য কোনোখানে তো আমার ভাবনা। রিস্কিন তো এ কদিন ঘুম দিচ্ছে না নাকে তেল দিয়ে। কে জানে এবার সে উদয় হবে কি মূর্তিতে! ডাক্তার কেমন হয় একটু ঘুরে দেখলে শহরটা? এত কথা শুনেছি যে লিঙ্কন বীচ সম্পর্কে। এটা লিঙ্কন বীচ কে বললো আপনাকে? এতো মিয়ামি, বিস্ময় ডাক্তারের কথায়– মিয়ামি। ওর দিকে তাকালাম অবিশ্বাসের চোখে। কিন্তু একটা

হাসপাতাল আছেনা লিঙ্কন বীচে? আছে হুইস্কি প্রায় আমাদের এটার মতোই ভালো হাসপাতালই–তাহলে ওরা ভর্তি করালো না কেন আমাকে ওখানে? আসার দরকার ছিলো না কিছু দুশো মাইল দূরে মিয়ামিতে।

মাইল সত্তরেক হবে–দুশো নয়–শান্তস্বরে বললো ডাক্তার। এখানে আপনাকে আনা হয়েছে লিঙ্কন বীচ থেকে মিয়ামির কাছাকাছি ছিলেন বলেই বাড়লো উত্তেজনা, কিন্তু পেলোট্রার শহরতলীতে লিঙ্কন বীচের রাস্তায় আমরা তো দুর্ঘটনার সময়

বারণ করেছি না আপনাকে ভাবতে।

ডাক্তার বললো কপট গাম্ভীর্যের গলায়। ঠিক হয়ে যাবে সব–বিশ্রাম নিনতো কটা দিন।

আবার দুর্ভাবনা শুরু হলো একা শুয়ে থাকতে থাকতে। গোলমাল হয়ে গেলো নাকি সবকিছু।

ঝাঁকিয়ে নিলাম মাথাটা শক্ত রাখতে হবেনার্ভ। নইলে পাঠিয়ে দেবেহয়তো পাগলা গারদে। ওদের ব্যবস্থা মেনে নিলাম। ঘরটা সত্যিই সুন্দর বসে বসে দেখতে পাবো দিনভর সমুদ্রের ঢেউ ভাঙা। কিন্তু সায় দিলো না মন। মনে হলো আমাকে এখানে আনা হয়েছে কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই জানা দরকার...কি সেটা? প্রায় ছটা বিকেল। জলের ঢেউ গুনছি বিছানায় বসে।

ঢুকলো রিস্কিন–ব্রাদার কি খবর? আছো কেমন? ভালো বলে ফেললাম কোনো ভূমিকা না করেই। আচ্ছা, ওরা কেন আমাকে ঢোকালো এ ঘরে?

রিস্কিন ধীর পায়ে এগিয়ে এলো বিছানার দিকে, খরচ কত জানো এ ঘরে থাকার? জানি, আর জিজ্ঞেস করছি জানি বলেই তো–রিস্কিন বসলো চেয়ার টেনে, বললো গলা নামিয়ে, আমি যে যাতায়াত করছি সেটা রুগীদের জানতে দিতে চান না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। ভালো তো ডাক্তার লোকটা–তাই খারাপ লাগবে ভেবে তোমার কাছে ব্যাপারটা

রিস্কিন মুছে নিলো মুখটা রুমাল দিয়ে। ওর নিরীহ মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। নিঃশ্বাস নিলাম একটা লম্বা।

রিস্কিন সাহেব কি জানেন মনেই হয়নি ওটা আমার। আমার ধারণা সরানো হয়েছে আমাকে মানসিক অস্থিরতা বাড়ছে ভেবেই রিস্কিন বের করলো সিগারেটের প্যাকেট পকেট থেকে। একটা খাবেনাকি? সিগারেটটা নিলাম হাত বাড়িয়ে। ভাই ওসব একদম ঝেড়ে ফেলো মাথা থেকে আজে বাজে চিন্তা– হালকা গলায় রিস্কিন বললো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা, হাতকড়া আমার হাতেই পরাবে আবার এ ব্যাপারটা দেখলে নার্সা।

তবে, এ জন্যেই তো আছে ওরা, কি বলো, রিস্কিন মুখে নির্মল হাসি ফোঁটালো। আমিও বের করলাম দাঁত, আজ মনে হচ্ছে অনেক ভালো। তবে বড় খারাপ মনটা–আমি ছিলাম আপনার অপেক্ষাতে–লম্বা টান দিলাম সিগারেটে। ব্যস্ত ছিলাম একটু। রিস্কিন অনেকক্ষণ দেখলো সিগারেটের আগুনটা।

তোমাকে চমকে দিবো একটা খবর দিয়ে–পারবে তো সহ্য করতে?

হয়তো পারবো, ব্যাপার কি? গাড়িটা ছিলো না বেন্টলে, বুইক ছিলো। পাওয়া যায় তোমাকে চালকের আসনে। পেছনে ছিলো মহিলাটি, তাকে বের করতে হয় গাড়ির দরজা কেটে। গাড়িতে আর কেউ ছিল না। আমি সেই জায়গায় নিজে ঘুরেছি, দেখেছি ছবিগুলো, দেখেছি বুইকটাও। প্রথম দেখতে পায় যে কনস্টেবলটা আমার কথা হয়েছে তার সঙ্গেও–আমি ওর কথা নিঃশব্দে শুনেছি। বলতে পারলাম না মুখের ওপর এটা যে ও মিথ্যা কথা বলছে।

নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে সমস্ত রক্ত আমার মুখের বুঝতে পারছি, মাটিতে পড়ে গেলো সিগারেটটা হাত থেকে।

রিস্কিন সেটা ঝুঁকে তুলেছিলো। আরে, হোলো কি? চমক আছেবললাম তো তোমাকে হলো কি! তাকাচ্ছো যে অমন ভাবে? আপনি মিথ্যা কথা বলছেন–আপনি! বলে উঠলাম স্বাভাবিক গলায়। আহা–কেন চটছো? এসো, যদি আর কিছু বেরোয় একটু আলোচনা করা যাক ব্যাপারটা নিয়ে–উন্মাদ হয়ে যাবো এবার সত্যিই মনে হলো আমার। ভাবলাম দৌড়ে পালাই খাট থেকে নেমে, দু চোখ যায় যেদিকে..সমস্ত ব্যাপারটাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে রিস্কিন মিথ্যে না বললেও। কানে এলো ওর শান্ত গলা, ব্যাপারটা ঘটেছিলো উনত্রিশে জুলাই তাইনা? তুমি বলেছিলে। এদিকে দ্যাখো, যে তারিখে তোমাকে পাওয়া গেলো সে তারিখটা হলো ৬ই সেপ্টেম্বর দুর্ঘটনার পর। পরিষ্কার তার উল্লেখ আছে বলস্টে। একই কথা লেখা হাসপাতালের খাতাতেও, তাহলে? কি বলবে এবার? কিছুই না, এখনও তাই বলছি আগেও যা বলেছি–সেটা হচ্ছে উনত্রিশে জুলাই লড়াইয়ের দিনটা ছিলো মিয়ামির ছোকরার সঙ্গে আমার লড়াইয়ের, আর অ্যাকসিডেন্টটা হয় লড়াইয়ের

পর-যাক, কিন্তু খবর পেলাম আমি তোএকটু হদিস পেয়েছি আমি এ ব্যাপারে আমার মনে হয়।

কথাও হয়েছে এ নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে, ঠিক পথেই আমি চলেছি ওর মতে। অবশ্য শক্ত হতে পারে ব্যাপারটা গ্রহণ করা তোমার পক্ষে। শোন-আরো কয়েক সপ্তাহ লাগতে পারে স্মৃতিশক্তি ফিরে আসতে তোমার, ডাক্তারের ধারণা। মানুষের মনে উদ্ভট চিন্তা ঢোকে মাথায় আঘাত পেলে। এখন মেনেনাও আমি যা বলছিদুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে। সহজ হয়ে আসবেব্যাপারটা অনেক, দুজনের কাছেই।

বুলিয়ে নিলাম জিভ শুকনো ঠোঁটে। বলুন, একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিলো রাস্তায় পেলোট্রার বাইরে প্রচণ্ড গতিতে সংঘর্ষটা হয়েছিলো ধাবমান পরস্পরমুখী দুটো গাড়ির মধ্যে। উল্টে গিয়েছিলো দুটো গাড়িই। ওঁরই একটায় আগুন ধরে যায় বেন্টলে গাড়িটায়-রিস্কিন নতুন করে সিগারেট ধরালো, জনি ফারার বলে একজন মুষ্টিক গাড়িটা চালাচ্ছিলোমারা গেছে সে। চেঁচিয়ে উঠলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে আপনার-বললাম হাত দিয়ে নিজের বুকে, জনি ফারার-আমিই ফারার-সস্নেহে রিস্কিন হাত রাখলো আমার পিঠে। জট ছাড়াবো দুজনে বসে বলেছি তো ভাই, সুযোগ দাও আমাকে একটু, শোনো শেষ পর্যন্ত কি বলতে চাইছি—এগিয়ে দিলাম মাথার বালিশ, আমার শরীর কাঁপছে আতঙ্কে।

কাগজে ছাপা হয়েছে দুর্ঘটনার পূর্ণ বিবরণ-ওরা লিখেছে সবই। দেখাবো, দেখতে চাও? রিস্কিন তাকালো জানলার বাইরে লম্বা টান দিয়ে সিগারেটে, পরে ঘুরলো আমার দিকে। নিশ্চয় পড়ে থাকবে তোমার চোখে খবরটা, হয়ে থাকতে পারে মানসিক প্রতিক্রিয়াও।

ভাবতে শুরু করে দিলে নিজেকে ফারার বলে, তুমিও অ্যাকসিডেন্টে পড়ে সপ্তাহ পাঁচেক পরে। নিশ্চিত হলে জ্ঞান হওয়ার পর বুঝলে, তুমিই ফায়ার! এই বিভ্রান্তি থাকবে তোমার মনে আরও কিছুদিন, তাই মত ডাক্তারেরওরিস্কিন সিগারেটটা পিষলো ভালো করে পায়ের তলায় ফেলে, শুধু বিশ্রাম এখন, আর ভুলে যেতে হবে এটা–যে তুমি ফারার। ছিলে না তুমি গাড়ির গ্যাড়াকলে। ঊনত্রিশে জুলাইয়ের–মুষ্টিযোদ্ধা নও তুমি।

তুমি অংশ নাওনি কোনো লড়াইয়ে কুঁচকে তাকালাম রিস্কিনের দিকে। আমি বিশ্বাস করছি না আপনার এসব ভূতুড়ে গল্প। আপনার কি মনে হয়? মুহূর্তের জন্যেও নয়। ফারার আমি–লড়াই হয়েছিলো আমারই মিয়ামির ছোঁড়াটার সঙ্গে আর আমিই লাগিয়েছি ওর দাঁতকপাটি–এই হাতেই আমার–রিস্কিনের নাকের সামনেহাতটা মেলে ধরলাম। আর আমার হাতে লোকও আছে শুনুন। এ সব প্রমাণ করাব, তারা থাকে পেলোট্রাতেই। কাফে চালায় টম রোশ আর তার স্ত্রী অ্যালিস। তাদের নিয়ে আসুন–হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে রোশনামটা। কথা হয়েছে তার সঙ্গেও কথা হয়েছে ও ছাড়া ওর স্ত্রী অ্যালিস আর সলি ব্র্যান্ট বলে একজন লোকের সঙ্গেও। তারা সনাক্ত করেছে মৃতদেহ। কাগজে পড়েছে বলেই বোধহয় ওদের সম্পর্কে...

দাঁড়ান–খামচে ধরলাম ওর হাতটা।

বললেন সনাক্ত করেছে। কার মৃতদেহ?

কেন ফারারের–এই দ্যাখোরিস্কিন পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে ধরলো ভাজ করা কাগজ, সব আছে এতেই

হ্যাঁ। আছে সবই, সবই রিনি যা বলছে। শুধু ব্যাপার একটা ছাড়া। বেন্টলে গাড়িটা আমি নাকি চুরি করেছিলাম কাগজে বলছে। আর দায়ীকরেনিনাকি মালিক। ফেলে দিলাম ছুঁড়ে কাগজটা, রীতিমত এবার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বলে চললো রিস্কিন।

চেষ্টা করেছি খুঁজে বের করতে বেন্টলে গাড়িটা, কিন্তু নম্বরটা জাল। পাওয়া গেছে বুইকটা ওটা কার! পেয়েছেন? কথাগুলো ছাড়লাম একদমে। রিস্কিন হাসলো, তোমার জনরিককা তোমার নাম ঠিকানা–৩৯৪৫, ৪নং অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্র্যাঞ্চবুলেভার্ড, লিনবীচ–মিথ্যে মিথ্যে কথা–মিথ্যে কথা নয় করা হয়েছে সনাক্ত তোমাকে–কে? শুনি কে করেছে সনাক্ত? বলে উঠলাম অধৈর্য গলায়।

এক সম্পর্কের ভাই তোমার। আর এই কেবিনে তুমি তার দৌলতে। ও এই ব্যবস্থা করেছে তোমার খবর পাওয়া মাত্র–ভাই নেই কোনো আমার আর রিককা নামও আমার নয়বসিয়ে দিলাম একটা ঘুষি। আপনি বকছেন আবোল–তাবোলনা। রিস্কিনের গলা তেমনি শান্ত, ও দেখে গেছে তোমাকে গতকাল রাতে, তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে। সে সেই সময়ই দিয়ে গেছে তোমার পরিচয়ও। তাই বলছে গাড়ির রেজিস্ট্রি খাতাও। মাথায় শুরু হয়ে গেছে অসহ্য যন্ত্রণা, বললাম কোনো রকমে, বিশ্বাস করি না আমি এর এক বর্ণও–আমি ফারার–ছেড়ে দিলাম বালিশে মাথা। রিস্কিন একটু কান চুলকে নিলো আমার মুখে দিকে তাকিয়ে। এখন উত্তেজনার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর তার চোখেমুখে। কিন্তু ঠোঁটে রেখেছে উদার হাসিটুকু–যে অভিব্যক্তি দেখা যায় কথা বলার সময় অপ্রকৃতিস্থ মানুষের সঙ্গে। রিস্কিন মুখ খুললে বেশ কিছুক্ষণ পরে। এক কাজ করা যাক তাহলে আমার মনে হয় হয়তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে ওর সঙ্গে দেখা হলে।

জনি একটা ঝড় বয়ে গেলো তোমার ওপর দিয়ে ডাক্তারের ধারণা তুমি–সান্ত্বনা দিতে পারবো আমি তোমার এই অবস্থায়। আমি এসেছি সেজন্যেই–আবার মনটা কেঁপে উঠলো অজানা আতঙ্কে। এমন কিছু ছিলো যা সাবধান করে দিলো আমার মনকে লোকটার হাসি মুখের আড়ালে।

কথা বলতে চাই না আমি আপনার সঙ্গে–রিককা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, আমার নাকে পৌঁছলো সে নিঃশ্বাসের ঢেউ। ঝলসে উঠলো আংটি বাইরে থেকে আসা সূর্যের আলোয়, কিন্তু একবার ভাবো জিনির কথা–দেখতে চায় ও তোমাকে, জনি–আচ্ছা শেষ নেই কি এর! আমার হাত চলে গেলো চাদরের প্রান্তে। সেটা খামচে ধরলাম। বুঝতে পারছি না আপনি কি বলছেন।

কোন দরকার নেই এখানে আপনার, আসুন আপনি। ভুলে গেলে জিনিকে? ওকে তুমি বিয়ে করতে চেয়েছিলে। রিককা ঝুঁকে পড়লো আমার মুখের ওপর।

জানো কি বলে ডাকে ও লোকটাকে দপ্তরের সবাই–শেয়ালে রিস্কিন! রিককা হাসলে খ্যাক খ্যাক করে। করছে দেখছি খুব ভাই বেরাদার। অবছে ও সাহায্য করবে তোমাকে? না, লোকটা মাড়াবে না সে ধারই–খুনের গ্যাড়াকলে ফাসাবে কথা বের করে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে। কিছুই বুঝছি না মাথামুণ্ড। একেবারে মেরি গেছি ঠাণ্ডা।

কয়েদখানার বাইরে আছে এখনো তুমি আমার জন্যেই রিস্কিন শুধু বের করার অপেক্ষায় রয়েছে খুনের মোটিভ। আমি বলে দিতে পারতাম ওকে সবই। শুধু একটা কারণে মুখ বন্ধ রেখেছি, একটা চুক্তি করবো বলে তোমাতে আমাতে–শুনতে চাই না আমি কিছু,

বেরোও তুমি–মেয়েটা কে ওরা জানে নালোকষ্টা নির্বিকার বলে চললো, তুমি ডুববে ফাস করে দিলে। অবশ্য, আমি এটা চাই না ওরা জানুক–কিন্তু হয়েই যায় যদি জানাজানি, আমি মোকাবিলা করি এসবের সেভাবেই।

যা খুশি করো আমার কেউ ভাই নেই, তাছাড়া কখনো এর আগে তোমায় দেখিনি, কেমন? রিককা পূরণ করে দিলো আমার পদ, কিন্তু ভালো হবে কি জানিয়ে দেওয়াটা রিস্কিনকে যে আমি তোমার ভাইনই–তোমার ঘাড়ে তিন–তিনটে খুনের ঝামেলা, যথেষ্ট নয় কি একটাই? সেই হাসির বিস্তার তার ঠোঁটে। দেখা দিলে সরষে ফুলের প্রাচুর্য আবার আমার চোখে কি করবো যা অবস্থা মাথার গুলিয়ে ফেলছে অন্য কারোর সঙ্গে আমাকে বললাম কোনোরকমে। আমার নাম রিককা নয় জন ফারার। আমার কোন সম্পর্ক নেই তোমার সঙ্গে

নিয়ে নিলাম একটা ঢোঁক, এখন বিদেয় হবে কি দয়া করে? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে একসঙ্গে কথা বলে। জানি। আমি জানি যে তুমি জন ফারার। বাইসনারকে আর পল ওয়াদমকেতুমি সাবাড় করেছো এও জানি, আর–ওর ঠোঁটে একফালি দুষ্টুমির হাসি খেললো, খতম করেছো তুমিই মেয়েটাকেও। অবশ্য ব্যাপারটা অ্যাকসিডেন্ট বলে চালিয়ে দেওয়া যেতো, বন্দুকটা না পাওয়া গেলে, কিন্তু বন্দুকে ছাপ পাওয়া গেছে ওর আঙুলের–ওর চোখে তাকিয়ে একটু ঝুঁকে, বললাম ফিসফিসিয়ে, এসব আসছে কোত্থেকে রিককা–ফিকার ব্যাপার? তুমিই রিককা রিস্কিনের ধারণা, কপালে বোলালো লোকটা মোটা আঙুল, আর সুযোগ নেবো আমরা যতক্ষণ পরিবর্তন না ঘটছে ওর ভাবনার–তুমিই ফারার ও জানবে যে মুহূর্তে–শুনতে পারছি না আর কিছু চাইও না। ঢেকে ফেললাম মুখ হাত দিয়ে।

বিশ্বাস করতে পারছে না তাহলে আমাকে, এই ত? বেশ প্রশ্ন করো তুমি নিজেকেই–এই মাথা ব্যাথা কেন তোমার জন্য আমার–ভাবো সেটা। তুমি বেরিয়ে যেতে পারো যখন খুশি এখান থেকে, তাতে যায় আসে না আমার কিছু, আমি শুধু তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি ওই মেয়েটার কথা, ও ভাবছে তোমার জন্যও বসে আছে তোমার পথ চেয়ে–সে আরো নামালো গলা।

আমাকে দিয়ে দাও টাকাটা। বলল, কোথায় রেখেছে টাকাটা?

জানি না–আর, বলব না জানলেও। বেরোও তুমি এখন দিলাম গলা চড়িয়ে। ওর মুখটা হয়ে গেলো হিংস্রতার মুখোশ, প্রতিমূর্তি যেন দানরে।

বোকা কোথাকার! ওর গলা কাঁপছে। ভাবছে, আমি বিশ্বাস করি তোমার এই স্মৃতি বিলুপ্তির অভিনয়। তুমি এমন অবস্থায় পড়বেনা বললে কোথায় রেখেছে, না জন্মালেই ভালো ছিলো তখন মনে হবে। কি, রেখেছো কোথায়? বলছি বেরোও–খামচে ধরলাম বিছানার চাদর। বন্ধ হলো হাঁটু বাজানো, রিককা উঠে দাঁড়ালো। মুখে বিস্তৃত হলো অর্থহীন নির্বোধ হাসিটুকু। চলি–তুমি তো খেলতে চাইছে এই ভাবেই? ঠিক আছে তাহলে জানিয়ে দিই ব্যাপারটা রিস্কিনকেও চোখ রাখলো হাত ঘড়িতে। ব্যবস্থা হয়ে যাবে কয়েদে পোরার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই; রেহাই থাকলেও একটা খুনের। জুটবে না তিনটের রেহাই, কি বলো? রিককা ফিরে দাঁড়ালো নিঃশব্দে দরজা পর্যন্ত গিয়ে। কি করবে? দরজা দেখিয়ে দিলাম বুড়ো আঙুলের ইশারায় শরীরী রিককা যেমন ঢুকেছিলো বেরিয়ে গেলো তেমনি। একজন সেবিকাঢুকলোমন তৈরীকরার আগেই এসবের বিশ্লেষণ করার।

সেবিকা আলমারির দিকে হাত বাড়ালো।

ডাক্তার বলছিলো ছেড়ে দেবে শীগগিরই তাই–আচ্ছা, ঘুমাবার চেষ্টা করি এবার একটু।

–হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিলাম সুন্দর ফুলগুলো বিছানাতে উঠে বসলাম ও বেরোতেই। পালাতে হবে এখান থেকে দূরে কোথাও রিককা আর ওই রিস্কিনের কাছ থেকে। আমার মনে হচ্ছে দুটো জিনিষ এক, হয় ওরা আমাকে গুলিয়ে ফেলছে অন্য কারুর সঙ্গে না হয় আমাকে প্যাঁচে ফেলতে চাইছে ওদের একজন বা দুজন। দেখলাম ঘড়ি, ছটা বেজে কুড়ি।

বেরোতে হবে সিঁড়ি ধরেই। ফিরলাম। ঘরে ফিরে দাঁড়ালাম জানলার সামনে। ঘরটা সাত তলায়। তাকালামনীচে, মানুষের ভীড় অসংখ্য সূর্যস্নানরত না হবেনা এখান দিয়েও ফিরে এলাম গলার আওয়াজ পেয়ে দরজার বাইরে। সন্তর্পণে ডাক দিলাম, ফিরতে হতে পারে বিছানায় যে কোনো মুহূর্তে। একজন চালক আর সেবিকা এগিয়ে আসছে একটা ট্রলি ঠেলে। ফিরে তাকালাম টেবিল ঘড়ির দিকে–দশ মিনিট বাকি সাতটা বাজতে। হাতে সময় বিশ মিনিট, কাজ সারতে হবে এর ভিতর। দাঁড়িয়ে আছি দরজায়, চিন্তার জট মাথায়।

কানে এলো ট্রলি চালকের কথা। ওকে নামাবো কথা বলে ডাক্তারের সঙ্গে। ফেলে এসেছি মর্গের কাগজটা। এটা না ভুলে বসে থাকো কোনদিন নিজের মাথা আছে–তাহলে কিন্তু বিপদ আছে। বললো ঠোঁট উল্টে সেবিকাটা। দ্রুত সরে গেলো সেবিকা চালক তার দিকে হাত বাড়াতে। নীচে নামতে শুরু করলো সেবিকা।

পেছন পেছন চালক। বাইরে পা দিলাম এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে। ঝুঁকে রেলিং ধরে সিপাই দুটো, চোখ নীচের দিকে–সেবিকার বোধহয় অবয়ব। ওরা পেছন ফিরে রয়েছে আমার দিকে। পেয়ে গেছি আমার পথ। উল্টোদিকের ঘরের সামনে দাঁড়ালাম বারান্দা দিয়ে হেঁটে। ঘরে ঢুকে পড়লাম দরজার হাতল ঠেলে। পাথর হয়ে গেলাম ট্রলির দিকে চোখ পড়তেই–মৃতদেহ স্ত্রীলোকের... আচ্ছাদিত সাদা চাদরে। বাড়ছে উত্তজনা...মুখের ওপর ভালো করে টেনে দিলাম চাদর।

এখন কি করা যায়। সরাতে হবে একে কিন্তু কোথায়? চোখ বুলিয়ে নিলাম ঘরের চারপাশে, না, চোখে পড়ছে না সেরকম কোনো জায়গা। তাহলে? নজরে পড়লো একটা দরজা কোণের দিকে, প্রায় সেদিকে দৌড়ে গেলাম–ঘরের হাতল ঘুরিয়ে দিলাম।

কলঘর। কলঘরের দিকে ট্রলি ঠেলে নিয়ে চললাম দ্রুতপায়ে ফিরে, নামিয়ে দিলাম স্নানের টবে ট্রলি থেকে তুলে মৃতার হিমশীতল দেহটা। শীতল অনুভূতি হলো একটা নিজের শরীরেও। ঘুরে উঠলো মাথাটা। দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত কলঘরের দরজা ধরে। আগের জায়গায় ফিরে এলাম ট্রলি চালিয়ে। চাদরটা আপাদমস্তক টেনে দিলাম নিজের শরীরটাকে তার ওপর ছেড়ে দিয়ে। শুরু হলো প্রতীক্ষা। কাঁপুনিও, মাথার যন্ত্রণার সঙ্গে।

ধরা পড়ে যাবো না তো এখান থেকে বেরোবার আগেই! ফিরে যাবো নিজের ঘরে? সময় আছে এখনও...ঘরের দরজাটা খুলে গেলো দোদুল্যমান ভাবনার মধ্যেই...রুদ্ধ হয়ে এলো নিঃশ্বাস...শুনছি নিজের হৃৎস্পন্দন..শুরু করলো ট্রলি চলতে...কান দিয়ে পড়ে রইলাম।

চালকের মৃদুস্বর শিস...গাড়ি চললো বারান্দা দিয়ে যেন অনন্তকাল এক একটা মুহূর্ত। কথার টুকরো কানে এলো। ওতে কি আছে?

মড়া মেয়ে মানুষের গলা পেলাম চালকের। দুশশালা বোধহয় জ্যান্ত মানুষ বাড়ি ফেরে না হাসপাতাল থেকে উকবরওলাদের কাছ থেকে যে কমিশন খায় ডাক্তার সাহেবরা। হু– হয়েছিলো কি? রোগটার যেন কি নামটা বলেছিলো নাকি যে পেরিটোনাইটিস গাড়ি চড়লো লিফটে। নেমে চললাম নীচে। চালক হালকা মেজাজে শিস দিয়ে চলেছে।

আওয়াজ উঠলো দরজা খোলার, নড়ে উঠলো ট্রলি। আই জো– ভেসে এলো বামাকণ্ঠ।

কি গো সোনা– থেমে গেলো ট্রলি।

আবার মরলো কে?

মিসেস এনিসমোর ওই চুয়াল্লিশ নম্বরের চালক গলা নামিয়ে দিলো।

তোমাকে কিন্তু আজ দারুণ দেখাচ্ছে এক মিনিট ছেড়ে দিয়ে আসি এটাকে চালক গাড়ি, ঠেলে দিলে ঝোলানো দরজার ফাঁকে–গাড়িটা থমকে দাঁড়ালো দেওয়ালে একটা ধাক্কা খেয়ে। চিৎকার করে উঠেছিলাম প্রায় যন্ত্রণায়। নৈঃশব্দ কয়েক মুহূর্ত। উঠে বসলাম চাদর সরিয়ে লিফটের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেতেই। অন্ধকার বন্ধ একচিলতে আলো আসছে দরজার ফাঁক দিয়ে–ট্রলির সারি সারা ঘর জুড়ে। বাতাসে শীতল ঘ্রাণ। নেমে পড়লাম, এবারও প্রায় ভুলেছিলাম টুপিটা। ওটাকে চাপিয়ে দিলাম মাথায়। মুখ বাড়ালাম দরজার বাইরে চোখে অন্ধকার সয়ে আসতেই, ফুরিয়ে এসেছে দিনের আলো।

দেখতে পাচ্ছি দূরে গেট, আশেপাশে কেউ নেই। নেবে গেলাম রাস্তায়–যাবো কোথায়, জানি না কি করবো। পয়সা নেই পকেটে, রুমাল পর্যন্ত না একটা–কিন্তু, আমার তো ভাবনা নয় তা নিয়ে...দূরে সরে যেতে তো পারছিরিস্কিনের কাছ থেকে রিককার সংস্পর্শ থেকে...হাসপাতাল থেকে ছড়িয়ে পড়েছে চাঁদের পীতাঙ্ক আলো মিয়ামির সৈকত জুড়ে।

একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে বালিয়াড়িতে নেভানো আলোগুলো। পাশে দুটো মানুষ বদলাচ্ছে পোষাক। একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ মানার্থী সম্ভবত। শুনতে পাচ্ছি ওদের কথা কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে কি বলছে। জনহীন সারা সৈকত।

লুকিয়ে বসে আছি আমি গড়ান গাছের আড়ালে ঝাড়া তিনটে ঘণ্টা, ওরা এলো এমন সময়। গাড়ির কাছে চলে গেলাম আমি দ্রুত পায়ে, ওরা দৌড়ে জলে নামতেই। লোকটার কোটটা পড়ে চালকের আসনে–কোটটা তুলে নিলাম হাত বাড়িয়ে।

চামড়ার ব্যাগ টাকার ভারে স্ফীত কলেবর। টাকা অনেক! না, নিলাম না সব–মুড়ে ফেলে দিলাম পকেটে দেড়শো ডলার তুলে নিয়ে ফিরে গেলাম গাছের আড়ালে আবার ব্যাগটা যথাস্থানে রেখে। মনটা থেমে থাকেনি তো, শরীর নিশ্চল থাকলেও তিনঘণ্টা। মিয়ামিতে বসে থাকবো না আমি নিশ্চয় ভাবছে রিস্কিন হাঁটার অভ্যেস আছে আমার ও জানে। এতক্ষণে সাড়া উঠেছে কাছেই চেকপোষ্টগুলোতে। তাহলে–আপাতত থেকে যেতে হবে মিয়ামিতেই। গা ঢাকা দিতে হবে খুঁজে নিয়ে একটা শান্ত ছোট্ট হোটেল। একটা ঘর দখল নিতে হবে গল্প ফেঁদে। অপেক্ষায় রয়েছি বাক্স প্যাটরার।

কিন্তু দৈহিক অবস্থা নেই আমার খোঁজাখুজি করার মতো। মানসিক তো নয়ই। বেড়ে চলেছে মাথার যন্ত্রণাও আর এতক্ষণে আমার চেহারার বর্ণনা চলে গেছে সব ফাঁড়িতে। শহর তোলপাড় করছে আমার খোঁজে, রিককাও। খুলে ফেলেছি ব্যান্ডেজ, এখন কিছু স্বস্তি পাচ্ছি টুপিটা পরে। একদিকে রেস্তোরাঁর ভীড় আর দোকান পসরা সারা তল্লাট জুড়ে আর একদিকে পোতাশ্রয়, সামনে সমুদ্র।

দেখেশুনে একটা হোটেলে ঢুকলাম আলো জ্বালিয়ে দিলো ঘরে ঢুকে বেয়ারা ছোরাটা। বারান্দার ওই কোণে বাথরুমটাও দেখালো আঙুল বাড়িয়ে, খুলবেন না ঝরনাটা। খারাপ হয়ে গেছে ওটা।

ছোট্ট ঘর। একপাশে খাট, একটি চেয়ার আর টেবিল। এক কোণে আয়নাও আছে। জীর্ণ কার্পেট মোড়া মেঝেয়। কি বলো বাকিংহাম প্রাসাদ? ঠাট্টা করলাম।

স্যার তার চেয়ে বড়ই হবে একটু। ছোকরা জবাব দিলো অম্লান বদনে। বেয়ারাটা আমার দিকে তাকালো প্রত্যাশার চোখে টেবিলের ওপর চাবিটা রেখে। ওর হাতে গুঁজে দিলাম একটা ডলার, ছোকরা একটা ঢোঁক গিলে ফেললো বিস্ময়ে, স্যার আর কিছু চাই? রাত তো পড়ে আছে। মানে ওদের ফোনের নম্বরগুলো আমার কাছে আছে। ছোঁড়াটা চোখের একটা ভঙ্গি করলো।

এখন কেটে পড়ো তুমি দিলাম নম্বরের চিরকুট পকেট থেকে বের করার আগেই। স্যার আমাকে ডাকবেন মন চাইলে–ম্যাডক্স আমার নাম।

আমাকে নীচেই পাবেন। শুধু উত্তরে তাকালাম মুখ তুলে দরজাটার দিকে। ম্যাডক্স বেরিয়ে গেলো ম্লানমুখে। একপাশে টুপিটা ছুঁড়ে দিলাম লোকটা বেরোনোমাত্র। কষ্ট হচ্ছে চোখ তুলে রাখতে এত শ্রান্ত হয়েছি যে।

মোলামেয় না বিছানাটা। কিন্তু তবু বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই আমার, এতে শরীর ছেড়ে দিতে। কিছুক্ষণ বসে রইলাম হাই তুলে শূন্য মনে। হঠাৎ মনে পড়লো আমার চিরকালীন অভ্যেস টুপির মধ্যে একটা দশ ডলারের নোট রাখার, কাজে লাগতে দুর্দিনে। ভাবলাম সে অভ্যেস থাকা সম্ভব হয়তো এই টুপির মালিকেরও।

লাইনিংয়ের ফাঁকে ডলারটি রেখে দিলাম টুপিটা হাতে নিয়ে। পেনসিলে কটা কথা লেখা? জন ফারার সি বোর্ড এয়ার লাইন রেলওয়ে, গ্রেটার মিয়ামি। বর্ণনা লেখা নীচের মালের; স্যুটকেস একটা। ঘুম চলে গেছে চোখ থেকে–আমারই এই জামা-প্যান্ট–টুপি। খুঁজলাম রসিদের তারিখটা রয়েছে সেটাও ৬ই সেপ্টেম্বর। সময়ও দেওয়া ছটা বেজে পাঁচমিনিট। আমি যেন ভূতুড়ে পরিবেশে বসে নাস্তিকের চোখ নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম কার্পেটে চোখ রেখে। নেই কোনো সন্দেহ উধাও হয়ে গেছে আমার স্মৃতিপট থেকে পঁয়তাল্লিশটা দিন।

আর ঐ সময়টুকুর মধ্যে বিশ্বাস করলে, রিককার কথা বিশ্বাস করলে, তিন তিনটে খুন আমার হাতে হয়েছে। একটি নারী আর দুটো পুরুষ। হয়তো সত্যি নয় রিককার কথা কিন্তু ওই দিন গুলিতে কি ঘটেছে তা জানতে হলে ফিরে যেতে হবে প্রকৃতিস্থ অবস্থায়–একটা খতিয়ান মিলবে ভাগ্য প্রসন্ন হলে। মাথায় চোট পেয়ে ছিলাম বেন্টলে থেকে

ছিটকে পড়ে। সেই মুহূর্ত থেকে আমার মন থেমে ছিলো হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পাওয়া পর্যন্ত।

হাতে নাড়াচাড়া করছি কাগজটা, হয়তো রহস্য লুকিয়ে আছে আমার হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো এই সুটকেসের মধ্যেই। আমার নাম লেখা রসিদে, সুতরাং স্যুটকেসও আমার। কিন্তু আমার তো জানা নেই কোথায় এয়ার লাইনের অফিস। অথচ আজ এখনই আমার চাই স্যুটকেসটা আমি স্থির হতে পারছি না ওটা না পাওয়া পর্যন্ত, আমার স্বস্তি নেই। হাত বাড়ালাম বেলটার দিকে। ওপরে পাঠিয়ে দিতে বললাম ম্যাডক্সকে। সিগারেট চাই আমার, নির্দেশ দিলাম টাকমাথাকে। রিসিভার নামিয়ে দিলাম টেকো বিড়বিড় করে কথা শুরু করতেই। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলো ম্যাডক্স মিনিট, দুয়েকের মধ্যে। হাঁপাচ্ছে, স্যার মত পালটেছেন–চকচক করছে তার চোখদুটো, স্যার আপনার। কি পছন্দ। ওর নাকের সামনে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

সিগারেট? উত্তরে বাড়িয়ে দিলো দ্রুতহাতে প্যাকেট বের করে। অল্পবয়সী মেয়ে–হ্যাট খোকা ভুলে যাও এসব একমুখ ধোয়া ছেড়ে দিলাম সিগারেটে আগুন দিয়ে। মেলে ধরলাম ওর চকচকে চোখের ওপর দুটো দশ ডলারের নোট।

রোজগার করতে চাও এগুলো? এবার ছেলেটার চোখদুটো যেন বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে। কি করতে হবে বলুন। এগিয়ে দিলাম রসিদ, আনতে হবে এটা–এই–স্যার এখন? যদি চাও টাকাটা। ম্যাডক্স চোখ বুলিয়ে নিলো রসিদটায়। ক্রসবি তো আপনার নাম। ওর চোখে ছোঁয়া লাগলে সন্দেহের। ঢুকিয়ে দিলাম পকেটে নোট দুখানা মুড়ে। ম্যাডক্স জিভ কাটলো, না না স্যার, ও ব্যাপারটা ভুলে যান তাহলে ব্যবস্থা করো ওটা

আনার–ম্যাডক্স ছিটকে বেরিয়ে গেলো বন্দুকের গুলির মতো। স্মৃতিরোমান্থনে মগ্ন হলাম অপেক্ষার মুহূর্তগুলোতে। একটা বুইক কনভার্টিবল আমি চালাচ্ছিলাম ৬ই সেপ্টেম্বরের রাতে। জন রিককা গাড়ির মালিক। মিয়ামি থেকে গাড়িটা চলছিলো পঁচাত্তর মাইল দূরত্বের রাস্তায়। একটা মেয়ে ছিলো আমার সঙ্গে বলতে পারবো না সে ডেলা কিনা। ওই লোকটা ব্যাপারটা জানে–য়ে পরিচয় দিলো রিককা বলে।

কিন্তু সম্পূর্ণ এ ব্যাপারে অজ্ঞ রিস্কিন। ঘটেছিলো একটা দুর্ঘটনা–আমি যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম গাড়ির ওপর আপাতদৃষ্টিতে তা বোঝা যাচ্ছে। কারণ খবর নেই কোনো গাড়ির প্রতিপক্ষের। মারা যায় মেয়েটি, পুলিসের লোক আমাকে উদ্ধার করে অচৈতন্য অবস্থায়। ছিলো নাকি একটা বন্দুকের ব্যাপারও।

তাতে নাকি পাওয়া গেছে মেয়েটির আঙুলের ছাপও। রিস্কিনের বিশ্বাস দুর্ঘটনাটা ইচ্ছাকৃত যে কোনো কারণেই হোক। মুখটামুছে নিলাম হাতের চেটোয়। এটা বের করতে হবে যে মেয়েটা কে এবং বন্দুক কেন ছিল তার হাতে।

কেন গাড়ির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিলাম, সে ব্যাপারটাও বের করতে হবে। আমার নাকি লিঙ্কন বীচের ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্ডে ডেরা আছে রিস্কিন বলেছিলো। লিঙ্কন বীচে ডেলা আর তার স্বামী যাচ্ছিলো মনে পড়লো–সঙ্গী করতে চেয়েছিলো আমাকে তাহলে লিঙ্কন বীচে হারানো দিনগুলো কেটেছে এই দেড় মাস সময়ের মধ্যে। শুধু তাই নয়–ওই সময় টুকুর মধ্যে হয়ে গিয়েছিলো আমার একটা পাকা আস্তানাও। দামী স্যুট ছিলো আমার পরনে, মালিকও নাকি হয়েছিলাম দামী বুইক গাড়ির কাজেই মালিকও হয়েছিলাম অনেক টাকার। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হলে ওই সময়ের মধ্যে মনে পড়লো রিককার কথা–

লোকটা সরবরাহ করেছে অনেক অস্বচ্ছ তথ্য। আমার বাগদত্তা নাকি জিনি বলে একটা মেয়ে। আচ্ছা, তার দেখা পেয়েছিলাম কোথায়? সে এখনই বা কোথায়?

বলেছিলো লোকটা বাইসনার আর ওয়ার্দমকে তুমি মেরেছে কে ওরা?

কোথায় লুকিয়েছো টাকাটা? টাকা কিসের? তুমি যা খুশি করতে পারো এখান থেকে বেরিয়ে–ভাববে ওই! ও কে? আর কেন ওভাবতে যাবে আমার জন্যে? শূন্য মনে সিগারেট টেনে চললাম কড়িকাঠে চোখ রেখে। শেষ নেই যেন এ প্রশ্নের কিন্তু উত্তর?

উত্তর কে দেবে? বার বার মনে হচ্ছে একটা কথাই এ সমস্ত ছাপিয়ে চলতে পারবো না এক পাও টাকা ছাড়া। হাতে আছে শ খানেক ডলার–বেশী সময় লাগবে না তা ফুরোতে। আর ফুরোলেই ত্যাগ করতে হবে আমাকে মিয়ামির মায়া–মানুষের ভীড়ে হারিয়ে যেতে হবে। ছেদ পড়লো ভাবনায় পায়ের শব্দে।

উঠে বসলাম টুপিটা মাথায় চাপিয়ে। ম্যাডক্স সশব্দে মাটিতে নামালো একটা বড় চামড়ার স্যুটকেস। স্যার এই নিন, শালা ভারী প্রায় মনখানেক–দেখেনিলাম ভালো করে সুটকেসটা– মনে হোল না এই স্যুটকেসটা কোনদিন দেখেছি। একটা লেবেল সাঁটা হাতলে–লেখা আমার নাম, হাতের লেখা আমারই! চেষ্টা করলাম তালাদুটো খোলার। নাড়ানো গেলোনা। মজবুত তালা, ভারী, সময় লাগবে ভেঙে ফেলতে। স্যার শক্তই মনে হচ্ছে জিনিষটা, ম্যাডক্স আমাকে লক্ষ্য করছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে হ্যাঁ, কিন্তু হারিয়ে তো বসে আছি চাবিটা, তোমাদের আছে– ড্রাইভার? আবার সন্দেহের ছায়া নামলো ওর

চোখে, অগ্রাহ্য করে আমি তা লক্ষ্য করলাম। ভাঙ্গ বেন না তালা, একটা যন্ত্র আছে আমার কাছে।

সেটা আনো– আবার ম্যাডক্স ছিটকে বেরোলো। বসে রইলাম একদৃষ্টে তাকিয়ে সুটকেসটার দিকে, মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ভয় আর উত্তেজনায়। এই স্যুটকেসের ডালা তুলে ধরার সঙ্গে কোনো হদিশ কি মিলবে হারানো দিনগুলোর?

আমি কি কিনেছিলাম এটা? চুরির মালনাকি? ম্যাডক্স হুমড়ি খেয়ে পড়লোটকেসটার ওপর। তালা লাফিয়ে উঠলো একটা ধাতব বস্তু ঢুকিয়ে মোচড় দিতেই।

স্যার, সোজা কাজ–কিন্তু জানতে হয়–বিজ্ঞের ভঙ্গিতে ম্যাডক্স হাত ঝেড়ে নিয়ে বললো। ওর হাতে তুলে দিলাম দুটো দশ ডলারের নোট। আচ্ছা, তাহলে কাল দেখা হবে–আমি ব্যাকুল ওকে তাড়াবার জন্য। ম্যাডক্স সুটকেসটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো প্রত্যাশার চোখে, তারপর দ্বিধাভরা গলায় বললে দরজার দিকে সরে গিয়ে, তাহলে দরকার নেই অপর কোনো–যেতে পারি আমি?

হ্যাঁ ম্যাডক্স খিল তুলে দিলাম ও দরজা পেরোতেই। তালা খুলে দিলাম এক ঝটকায় বিছানায় ফিরে গিয়ে–ভাবিনি কি দেখব। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি যা দেখলাম–প্রতি ইঞ্চি জুড়ে টাকা সুটকেসের–হা–হাজার হাজার ডলার–চোখ ধাধিয়ে যাচ্ছে তাকিয়ে থাকতে থাকতে...বিছানায় সাজালাম একে একে বের করে আনকোরা নোটের বান্ডিলগুলো কাঁপা হাতে। সোয়া লাখ ডলার–কেন টাকার জন্য মাথা খুড়ছিলো রিককা সেদিন, এখন বুঝলাম।

ঘুরে উঠলো মাথাটা, ধরে ফেললাম খাটের রেল–আসছে হাঁটু ভেঙে–পড়ে গেলাম মাটিতে। কিন্তু চোখ সরাতে পারলাম না টাকার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও। খুনের মোটিভ। তাহলে কি আমি তিনটে খুন করেছি কোন উদ্দেশ্য নিয়েই?

রিস্কিনের হাতে স্যুটকেস তুলে দিতাম কোন অভিযোগ না থাকলে আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু, রিস্কিন তো সোজা হাতকড়া লাগিয়ে দেবে আমার হাতে আমার ঘাড়ে খুনের ব্যাপারটা চাপিয়ে দিয়ে। ওরা আমাকে তো খুঁজে বেড়াচ্ছে সেজন্যেই! জানা দরকার ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত, আর টাকা চাই সেজন্যেও। টাকাআছে আমার, খরচও করবোযখন মনস্থির একবার করা গেল, জলবৎ হয়ে গেলে বাকি ব্যাপারটাও হাত করলাম টাকা দিয়ে ম্যাডঅকে, একশো দিতে হলো ম্যাডক্সকে টেকো সন্তুষ্ট হলো পঞ্চাশ নিয়েই। ওরা পেয়ে গিয়েছিলো আমার পরিচয়–আমার ছবি ছাপা হয়ে গিয়েছিলো খবরের কাগজে। খবরটা হচ্ছে এই লোকটাকে খোঁজা হচ্ছে একটি অজ্ঞাতনামা স্ত্রীলোককে খুনের অপরাধে। হোমিসাইড (নরহত্যা) বিভাগের লেফটেনান্ট বিল রিস্কিনকে জানান কোনো সূত্র দেবার থাকলে বা এর পরিচয় কারো জানা থাকলে।

লিঙ্কন বীচের মাইল পঞ্চাশেক আগে কমিয়ে দিলাম গাড়ির গতি–কোথাও হবে জায়গাটা এখানেই। চোখে পড়লো সামনে একটা টিবি, ঝোঁপও ছায়া ছায়া, থামিয়ে দিলাম গাড়ি। পাঁচের ঘরে ঘড়ির কাটা–ফোঁটার দেরী নেই ভোরের আলো, দিনের আলোয় দিক–বিদিক ভরে যাবে মিনিট কয়েকের মধ্যেই। নিভিয়ে দিলাম হেডলাইট।

নেমে পড়লাম গাড়ি সরিয়ে দিয়ে রাস্তার এক পাশে। বসেরইলাম স্টিয়ারিংয়ে সিগারেট ধরিয়ে, বাড়ছে উত্তেজনা। করতে হবে অপেক্ষা, খুঁটিয়েদেখতে হবে সবদিক দিনের

আলোয়। ফুটলো দিনের আলো, ছেড়ে দিলাম গাড়ি, থামালাম বেশ কিছু এগিয়ে। ওপড়ানো গাছ একপাশে চাকার স্পষ্ট দাগ হেঁচড়ানো ঘাসে। তেমনি আছে সবই–মোছেনি ষাট দিনেও। এগিয়ে গেলাম আরো। গাড়ি থামালাম একটা ঝোঁপের আড়ালে, চলবে না কোনো ঝুঁকি নেওয়া। কোনো গাড়ি রাখা মানে বিপদ ডেকে আনা দুর্ঘটনার জায়গায়। ফিরলাম হেঁটে। হাত রেখে পকেটে বন্দুকের গায়। খাড়া রেখেছি চোখ কান। না, আশেপাশে কেউ নেই। জমি পরীক্ষা করলাম আধ ঘন্টা ধরে, চোখে পড়লো না আর কিছুই। বোঝা গেল পুলিস এসেছে, জানতাম নিয়েও গেছে কিছু পেয়ে থাকলে, আমি কিছু পাবো না, কিন্তু মনে পড়ে যাবে এমন কোনো ব্যাপার, যা আমার অর্ধপ্রাপ্ত রহস্যের কিনারা করবে।

ঘেমে উঠলাম–বাড়ছে অস্বস্তি...স্বপ্ন দেখছি কি আমি? নাকি সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোতে কোনো ভূমিকা ছিলো ওই বিশালাকায়া আর সিংহের? পরে–চিত্র ফুটলো একটা পরিষ্কার অনেক পরে...একটা ছোট্ট বাড়ি সৈকতে, সাজানো আরাম কেদারা বারান্দায়...বসে আছি কান পেতে রেডিওর কাছে। শুনতে পাচ্ছি বাজনার রেশ–সমঝদার না হয়েও বলতে পারি রাগাশ্রয়ী বাজনার এটা বিঠোফেনের ঐক্যতান বাদন এক তন্বীকে দেখেছি পীতাস সাঁতার পোষাকে এগিয়ে আসছে ঘরের ভেতর থেকে বন্ধ করতে বলছে রেডিও....সে বর্জন করতে রাজি সাঁতার পোষাক বাজনা থামালে...তার আকর্ষণ কি কম বাজনার চেয়ে? না...। সে একটা চড় কষালো আমার গালে আমার নেতিবাচক উত্তরে। একই ছবি বারবার কিন্তু অর্থহীন। একটা সেগারেট ধরালাম ছিন্নমূল গাছের ওপর বসে–মনে করবার চেষ্টা করছি সমস্ত ব্যাপারটা যদিও ঝোঁপের পরিবেশে চোখ নিবদ্ধ। একটা গাড়ি ছুটে এসেছিলো উল্টোদিক থেকে প্রচণ্ড গতিতে কানে বাজছে মেয়েটার আর্তনাদ ও আমাদের গাড়ির ওপর ভেঙ্গে পড়ার শব্দের সঙ্গে...

মনে পড়ছে ড্যাশবোর্ডটা আঁকড়ে ধরেছিলাম বেন্টলে উল্টে যাবার মুহূর্তে। ফেলেছিলাম চোখ বুজে..আলোর ঝলকানি একটা চোখ ধাঁধানো...অন্ধকার তারপর...একটা ছবিও ভেসে উঠলো ছোট্ট কুটিরের...কুটিরটা সৈকতের মুখোমুখি। স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবার...ভাঙা শার্সি সামনে টিনের ছাদ। একটা ফাটল সদর দরজাতে–আগে ছিলো না তো এটা।

এটা তাহলে দুর্ঘটনার পর হয়েছে, তাই–ই। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আবিষ্কারে উল্লসিত হয়ে। দেখতে লাগলাম চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে। সৈকতমুখী পায়ে হাঁটা পথ চলে গেছে পামবনের ভিতর দিকে। সে পথে চালিয়ে দিলাম দ্রুতপায়ে–যেন চেনা পথ। আমি এ পথে হেঁটেছি এর আগে। সামনে সাগর বালিয়াড়ি ঝোঁপ থেকে। চোখ বোলালাম দুপাশে, কোথাও নেই কুটিরের চিহ্ন। মন পাল্টালাম হাঁটতে শুরু করে ডানদিকের রাস্তা ধরে ঘুরলাম বাঁ দিকে। নিজের ঘরে অন্ধের মতো যেন আমার অবস্থা। হয়ে চলেছি স্বভাব–প্রবৃত্তিতাড়িত–সেখানে পৌঁছবোই জানি। কুটিরটা চোখে পড়লো বালিয়াড়ি ধরে মিনিট দশেক হাঁটতেই–যে ছবি এঁকেছি মনের মনিকোটরে সবই মিলছে–ফাটল ধরা শার্সি, টিনের ছাদ, ঠিক তেমনি। বর্ষীয়ান এক পুরুষ ধূমপানরত কুটিরের দরজায়।

বেশভূষা মলিন, তার দৃষ্টি আমার দিকেই। সে চমকিত হলো ভালো করে আমাকে নজর করে, সতর্কও একটু। সুপ্রভাত, জায়গা বড় নির্জন–আপনাদের এদিকটা, তাই না? বলে বসলাম কাছাকাছিহতে। মানুষটা তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ রেখাবহুল মুখে। আসছেন কোথা থেকে? গাড়ি চালিয়ে এলাম সারারাত–একটু বিশ্রাম নিতে চাই হাত পা ছড়িয়ে পাওয়া যাবে কফি, মানে–পয়সা দিয়ে?

করেছি খানিক আগেই–পাবেন। আনছি–আপনি বসুন। বসে পড়লাম কাঠের প্যাকিং বাক্সে, দেখেছি একে আগে। খানিক পরে লোকটা বেরিয়ে এলো ধূমায়িত দু বাটি কফি নিয়ে। অনুভব করলাম কফির বাটিতে চুমুক দিতে দিতে। ও আমার দিকে তাকিয়ে পূর্ণদৃষ্টিতে। মজার ব্যাপার এর আগে দেখেছি আপনাকে? লোকটা বললো মৃদুস্বরে।

দেখেছো আমার ভাইকে–মিথ্যে কথা বললাম কথা বের করবার জন্যে। মনে পড়ছে, কাছেই একটা গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটেছিলো ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে? ও চোখ সরিয়ে নিলো দ্রুত, না, না কিছুই জানি না ওসবেরও বলছে মিথ্যে কথা। আহত হয়েছিলো আমার ভাই–সে হারিয়ে ফেলেছে স্মরণশক্তি। আসলে বুঝতে পারছি না কি ঘটেছিলো।

জানা যায় কিনা কিছু বললাম ওর চোখে চোখ রেখে। আমি জানি না কিছু বলছি তো ঐ ব্যাপারে, বললো কথাগুলো কেটে কেটে। শেষ হয়েছে আপনার খাওয়া?

বেরোতে হবে আমাকে। কয়েকটা নোট বের করলাম পকেট হাতড়ে ছড়িয়ে দিলাম হাঁটুর ওপর গুনে গুনে একশোটা ডলার–তাসের কায়দায়।

তাহলে নষ্ট করবো না তোমার সময়–তাই বলছিলাম তবে আমি খবর সংগ্রহ করবো না শুধু হাতে।

আমাকে বারণ করেছিলো মুখ খুলতে ওই মেয়েটা লোকটার চোখদুটো জ্বলে উঠলো প্রাপ্তির আশায়। তবে আপনার ভাই বলছেন যখন আপনি। টাকাটা বাড়িয়ে দিলাম হাতে।

আমার হাত কাঁপছে। বাড়ছে হৃৎস্পন্দন। ব্যাপারটা কি হয়েছিলো ভাই? এসেছিলো আপনার ভাই আর ওই মহিলা। ও বললো মাথায় নাকি চোট পেয়েছে আপনার ভাই, আর চুরি গেছেনাকি গাড়িটাও।

মিথ্যে কথা বলছে পরে বুঝলাম, কারণ জানলাম, হয়েছিলো একটা অ্যাকসিডেন্ট এবং ধরে যায় গাড়িতে আগুন। গাড়িতে পাওয়া যায় একটা লোকের মৃতদেহও। আচ্ছা আচ্ছা তা চেহারা কেমন ওই মেয়েটির? ময়লারটা, তবে জেন্না আছে চেহারায়, খাণ্ডারনি মেয়ে, দাদা–লোকটা হেসে উঠলো, মনেহয় যাদের দেখে প্রথম দর্শনেই–আছে মালকড়ি–ডেলা! ভাই বলে যাও। মনেহলো অবস্থা বেশ খারাপই আপনার ভাইটির–সে অভিনয় করছে পরে বুঝলাম। আর চেষ্টা করছে ধোকা দেবার আমাকে মেয়েটাও পরিষ্কার করে নিলো গলা একটু কেশে, মেয়েটা একজনকে ডাকতে বললো আমাকে একটা ফোননম্বর দিয়ে। প্রায় আধমাইল দূর হবে এখান থেকে ফোনের বুথা। লোকটাকে ডাকলাম নম্বর ধরে, বললো সে আসছে।

কি মনে হলো ফিরে জানলায় উঁকি দিলাম দরজায় না গিয়ে কথা বলছে মেয়েটার সঙ্গে তোমার ভাই। ঘরে ঢুকলাম ঘুরে গিয়ে পড়ে আছে লোকটা চোখ বুজে–অজ্ঞান।

বললাম না কোনোকথা, কারণ আবার জট পাকিয়ে গেছে সবকিছুই। বেরিয়ে গেলো আচমকা মুখ দিয়ে, তোমার মনে আছে নম্বরটা? হ্যাঁ আছে। নম্বরটা ভুলিনি মনে রাখা সহজ বলেই–লিন বীচ ৪৪৪৪। মনে পড়ে কাকে ডেকেছিলো?

হ্যাঁ, নিক রাইসনার। মনে হচ্ছে নামটা তাই বলেই যেন শিরদাঁড়া বেয়ে মাকড়সার পা উঠলো। আচ্ছা, কি বলেছিলো মহিলাটি? লোকটা চুলকে নিলো মাথাটা রিককা কে এক –অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে নাকি তার–ওদের যেন নিয়ে যায় রাইসনার এসে। তুমি দেখেছিলে রাইসনারকে? না, শুয়ে পড়েছিলাম আমি। প্রশ্ন করলাম আরো অনেক, কিন্তু জানা গেলো না আর এমন কিছু যা লাগবে আমার কাজে।

লিনবীচের চৌরঙ্গীসুটকেসটা ঢুকিয়ে দিয়ে গাড়ির পেছনে গাড়ি চালিয়ে দিলামরুজভেল্ট বুলেভার্ডের দিকে। ভীড় শুরু হয়ে গেছে মানুষের, রাস্তার দুপাশে–পরনে সাঁতারের পোষাক অধিকাংশরই। প্রায় বিবস্ত্র মেয়েদের দু–একজন, কিন্তু উদাসীন।

গাড়ি ভিড়িয়ে দিয়ে নেমে পড়লাম। একটা বড় প্যাকার্ড গাড়ির পেছনে। ৪৪৪৪নম্বর চাইলাম টেলিফোন বুথে ঢুকে। একটা মেয়ের গলা পাওয়া গেল কিছুক্ষণ বেজে চলার পর। নমস্কার, বলছি লিঙ্কন বীচ ক্যাসিনো থেকে করতে পারি কি সাহায্য?

দিন নিক রাইসনারকে–কথাগুলো ছেড়ে দিলাম, বিকৃত গলায়। কি বললেন নামটা? নিক রাইসনার। আবার গলা পেলাম সামান্য নিস্তব্ধতার পর। উনি তো এখন নেই আমাদের সঙ্গে, কে বলছেন আপনি? শুকনো ঠোঁট বোলালাম শুকনো জিভ দিয়ে। বন্ধু বলছি আমি তার এই শহরে সবে এসেছি। আচ্ছা, ওকে পেতে পারি কোথায়? তাৎক্ষণিক উত্তর এলো বিব্রত গলায়, দুঃখিত। পাবেন না তো ওকে মারা গেছেন উনি। মারা গেছেন, বিস্ময় আনলাম গলায়। জানতাম নাতো কবে? তিরিশে জুলাই। সৈকত থেকে নিয়ে আসার পরের দিন। আমার হাড়ে কাপুনি লাগলো আবার। হয়েছিলো কি? প্রস্তুত ছিলাম না তারজন্য। এবার মেয়েটা যা বললো।

লাইনটা ধরুন তো একটু —

ছাড়বেন না–আরে শুনুন। বসে গেছে আমার গলা। সাড়া নেই আর অনেকক্ষণ। শুরু করলাম ঘামতে। শব্দ হলো একটা খুট করে। কে বলছেন কথা? গলা ভারী–রিককা! রইলাম চুপ করে, কানে নিয়ে রিসিভার। ওঠা–নামা করছে ওর ভারী নিঃশ্বাস।

আমার শীতল স্রোত নামানো মেরুদণ্ড বেয়ে। কে, জনি নাকি? ওর গলা পেলাম আবার। নিরুত্তর আমি। নামাতে পারছি না রিসিভার। সম্মোহিত হয়ে পড়েছি ওর নিঃশ্বাস আর ভারী গলায়।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলো একটা কর্কশ গলা পরমুহূর্তে। অপারেটর–শীগগির, আমাকে জানান কলটা কোথাকার।

৩. এগিয়ে এলো পাহারাদারদের একজন

এগিয়ে এলো পাহারাদারদের একজন গাড়ি থেকে নামতেই, দাঁড়িয়ে পড়লো অন্যেরা, চোখ রেখে আমার দিকে।

ওখানে রাখতে চাই একটা স্যুটকেস। কি করতে হবে?

স্যার, ওটা কি সঙ্গেই আছে?

হ্যাঁ, এই যে মাটিতে নামালাম স্যুটকেস বের করে। হাতের আন্দোলনে পাহারাদারকে থামিয়ে দিলাম ওটা নেবার জন্য হাত বাড়াতে। আমি ঠিক ততোটা দুর্বলনই আমাকে দেখে যতটা মনে হচ্ছে বাতলাও কোথায় যেতে হবে।

আসুন আমার সঙ্গে। ওর পেছনে ভেতরে ঢুকলাম। চওড়া ইস্পাত মোড়া রেলিং চারদিকে। সশস্ত্র পাহারা চলেছে বাইরে লবিতেও। ঘাড়ে একটা করে অটোমেটিক রাইফেল। আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলো একটা ফ্যাকাশে মুখের সামনে পাহারার লোকটা। আভিজাত্য আছে লোকটার চেহারায়, চালিয়ে দেওয়া যায় কোন বিদেশী রাজদূত বলে। আমাকে অভিবাদন করলো উঠে দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকে আমি সামনে আসতেই মিঃইভশ্যাম সব ব্যবস্থা করে দেবেন ইনি আপনার। নিজের জায়গায় ফিরে গেলো পাহারাদার একটা সেলামঠুকে। আঙুল দেখিয়ে দিলাম স্যুটকেসটার দিকে।

রাখতে চাই এটা। রাজপুত্র আর একবার ঝুঁকে জানালো সে কৃতজ্ঞবোধ করবে আমার সেবা করতে পারলে। নেবেন কি স্ট্রংরুম ভাড়া? দিলাম ঘাড় এলিয়ে। আমার সঙ্গে আসুন। লিট থামলো ছ তলায়।

একটা ইস্পাত মোড়া দরজার সামনে দাঁড়ালাম বারান্দা দিয়ে হেঁটে গিয়ে। পাহারা এখানেও। পাহারার লোক দরজা খুলে দিলো সেলাম করে।

চাবিটা দাও ছেচল্লিশ নম্বরের। ইভশ্যাম যুবরাজোচিত গলায় নির্দেশ জারি করলো। চাবি বাড়িয়ে দিলো পাহারাদার। খুলে গেলো দরজা ঢুকলাম একটা ছোট ঘরে। সর্বস্তরে ইস্পাত এখানেও। একটা টেবিল দুটো আরাম কেদারা। ধূসর কার্পেট মোড়া মেঝেতে। একটা দেয়াল সিন্দুক আমাদের মুখোমুখি। মশাই এখানে তোরাত্রিবাসও করা যায়, বললাম হালকা গলায়। কাগজ পত্র দেখেন এখানে বসেই আমাদের কিছু পৃষ্ঠপোষক। ব্যবসা করলে আমরা চেষ্টা করি যতটা সম্ভব সুযোগ সুবিধে দেবার–ইভশ্যাম ঘুরলো সিন্দুকের দিকে, মনে রাখতে পারবেন কি?

কথাটা দাঁড়ায় সংযোগের অক্ষরগুলো মিলে মিতব্যয় পারবো বললাম। আপনাকে সিন্দুক খুলতে হলে। জানি, দুএকবার করেছি আগেও এ ধরনের ব্যাপার। টিপলাম বোতাম। থেমে প্রতিটি শব্দের মাঝখানে।

ফাঁক হলো দরজাটা কথার বানান করা শেষ হতেই। চাবি পড়ে আপনা আপনি সংযোগের কাজ হয়ে যায় দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। মনে করিয়ে দিলো ইভশ্যাম। ব্যবস্থা ভালোই তো মনে হচ্ছে। পাহারাদারের কাছে থাকে ভল্টের চাবি।

আমরা কাউকে চাবি বাইরে নিতে দিই না। জানিয়ে দিতে পারেন কোনো বিশেষ নির্দেশ থাকলে। পরে আপনার হয়ে অন্য কেউ আসতে পারেন, নাকি নিজেই আপনি? সিন্দুক ছুঁতে দেবেন নাকাউকে আমি সঙ্গে না থাকলে। বললাম একটু থেমে। আমাকে চিনবে তোআপনার পাহারাদার? হাসলো যুবরাজ। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আপনার ছবি উঠে গেছে সিন্দুক খোলার সঙ্গে সঙ্গে। ওটা রাখা হবে পাহারার ঘরে। মিলিয়ে চাবি দিয়ে দেবে আপনি এলে। হাসলো ইভশ্যাম, স্যার আসুন, সইটই করার আছে নীচে আরো কিছু। ভাবলাম একমুহূর্ত আমি একটা তালিকা রাখতে চাই স্যুটকেসের জিনিসপত্রের। এগোন আপনি, আমি আসছি মিনিট কয়েকের মধ্যেই। নিশ্চয়ই, জানেন কোথায় আমি বসিচলে আসুন।

লিফটে পৌঁছে দেবে আপনাকে পাহারার লোক। পকেটে ফেলে দিলাম একশো ডলারের দশখানা নোট বের করে আমি স্যুটকেস খুলে ইভশ্যাম বেরোতেই।

স্যুটকেসে রেখে দিলাম ২২ বোরের পিস্তলটা। দরকার হচ্ছেনা দুটো আগ্নেয়াস্ত্রের। লিটের দিকে এগোলাম দরজায় চাবি দিয়ে। আমি গাড়ি চালিয়ে দিলাম ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্ডে আমার ফ্ল্যাটের দিকে মিনিট বিশেক পরে।

অনেকদিন পর গুনগুনিয়ে গান ধরলাম। স্বস্তি পেলাম টাকাটা রইলো নিরাপদ জায়গায়। টাকায় হাত পড়বে না রিককার।

পেপি আর বেনোর নোংরা হাত। গাড়িটা চোখে পড়লো বুলেভার্ডের ভেতর মাইল খানেক চালাবার পর। একটা পেট্রোল পাম্পের সামনে গাড়িটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে। এগোতেই বললাম পাম্পের ছেলেটাকে। গাড়িটা রাখতে চাই কিছুক্ষণের জন্যে।

স্যার আপনার যতক্ষণ খুশি।

ও জনি, ফিরে এসেছো তুমি। ঘটলো দ্রুত আকস্মিকতায় পরের ঘটনাগুলো ভয়ের চমক খেলে গেলো জিনির চোখে। খুলে গেলো মুখ...ওর গলা থেকে আর্তনাদ উঠলো।

পড়ে যাবার মুহূর্ত ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম মর্যাদা হয়ে...কিন্তু এখানে নেই তো জিনি...পড়ে, চললাম..নীচে...আরো নীচে...বর্তমান থেকে অতীতে...কানে বেজেছিলো আর্তনাদ একটি মেয়ের কিন্তু জিনিরনয় তা। চেষ্টা করলাম হাত তুলতে, পারলামনা–ভারী ঠেকছে লোহার মত। নেই কিছুই। চালালাম হাত শূন্যে। চেষ্টা করলাম উঠে বসলাম। যন্ত্রণা বড়...মিলিয়ে গেলো আর্তনাদ..কানে এবার শুধু নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ..মৃদু...গতি তার আর্ত মৃদু...এবারের স্পন্দনই বুঝি শেষ স্পন্দন প্রতিবারই মনে হচ্ছে।

জনি আমি চিনি এগুলো। ডেলার কণ্ঠ সমৃদ্ধ অতীতের স্মৃতিভারে। স্মৃতির রোমন্থনে ডুব দিলে মনটা আমার..ভেসে উঠলো তার দৃশ্য যে মারটা দিয়েছিলো আমাকে মিয়ামির ছোকরাটা–ডেলার তন্বী শরীরটা সেই সঙ্গে। ওঠো...লড়ে যাও উঠে।

আস্তে আস্তে চোখ খুললাম কোনো রকমে...চারিদিক আঁধারে ছেয়ে রয়েছে...কিন্তু এত আলো স্টেডিয়ামের হাতুড়ি দিয়ে কি পেটালো ছোকরা তাহলে?

গেছি কি অন্ধ হয়ে? আবার চেষ্টা করলাম উঠে বসতে জনি, জনি কথা বলো, লেগেছে কি খুব? আমার মুখে ঝুঁকে পড়েছে ডেলার মুখটা। রাতের আকাশ দেখতে পাচ্ছি ওর কানের পাশ দিয়ে, গাছের সারি ছায়া ছায়া। উল্টো দিক থেকে ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে গাড়ির আওয়াজ চাকার মাটি কামড়ানো–অনুভব শূন্যে বিচরণের।

ঠিক আছি আমি, একা থাকতে চাই একটু হাত দিলাম মুখে। মুখ ভিজে চটচটে।

বলো তো কি হয়েছিলো? বললাম মৃদুস্বরে ওঠো, সাহায্য করতে হবে আমাকে। ওর গলায় বিপদের সঙ্কেত। ও মারা গেছে মনে হচ্ছে?

পল। জনি উঠে পড়ো, চলবে না বসে থাকলে। সাহায্য করো আমাকে। এক মিনিট ঠিক আছে। উঠতে গেলাম হাতের চেটো ঠেকিয়ে মাটিতে, শুরু হলো বুকের যন্ত্রণা। উঠলাম তবু, দাঁড়িয়ে পড়লাম। কয়েক মুহূর্ত আমাকে ধরে ফেললো ডেলা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বার আগেই, তোমার কি হলো? দাঁড়াও ঠিক হয়ে। চমকে উঠলাম ডেলার কর্কশ গলায়।

ও পড়ে আছে ওইখানে। ওর নিঃশ্বাস পড়ছে না। হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লাম বালির ওপর। ছিড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায় বুকটা। পলের দেহটা পড়ে আছে কাত হয়ে, পাশেই দুমড়ে যাওয়া বেন্টলের মাথাটা হেলে পড়েছে হাতের ওপর। প্রায় থুতনিতে ঠেকেছে একটা পা। সেটা উপুড় হয়ে গেলো ওর দেহটা ধরে নাড়া দিতেই। থেকে গেলো সেখানেই মাথাটা যেখানে ছিলো।

মটকে গেছে ঘাড়টা। নাড়ি নেই, তুলে নিলাম হাতটা। আমার কাঁধে হাত রেখে ডেলা হাঁটু মুড়ে বসলো, কাঁপছে। বললাম, মারা গেছে। কোনো জবাব দিলোনা ডেলা, শুধু ওর হাতটা আরও ডুবিয়ে দিলো আমার শরীরের গভীরে।

থাকো এখানে পাই কিনা দেখি কাউকে। দাঁড়ালাম উঠে। ও বেঁচে নেই তুমি ঠিক বলছো? আবার চমকালাম ডেলার হীম শীতল কণ্ঠস্বরে। হ্যাঁ। কোমর ঠেকিয়ে দাঁড়ালো একটা তালগাছে ভেলা আস্তে আস্তে উঠে। হাওয়ায় উড়ছে ওর এলোমেলো চুল। ছিঁড়ে গেছে স্কার্ট। গোড়ালীতে নেমে গেছে এক পায়ের মোজা। ওর মুখে চাঁদের আলো এসে পড়েছে গাছের ফাঁক দিয়ে রক্ত শুকিয়ে গেছে নাকের পাশে।

মেলে দিয়েছে আমার দিকে উদাসীন কোটরগত চোখদুটো। অন্যখানে মন। অন্য গাড়িটা পড়ে আছেরাস্তার ওপারে একটু দেখবে ওটার ড্রাইভারের অবস্থাটা? গাড়িটা পেপির। পাত্তাই নেই ওটার কোনো। বেঁচে নেই আমরা হয়তো ভেবেছে।

কিন্তু অবস্থাটা দেখো ওই গাড়ির পায়ে পায়ে রাস্তার দিকে এগোলাম যন্ত্রণা নিয়েই। চাঁদের আলোয় স্নান করেছে সারা রাস্তা, তবুওই জায়গায় পোঁছতে আমার অনেক সময় লাগলো।

পড়ে আছে গাড়ি-থেতলানো কাত হয়ে ঝোঁপের মধ্যে। এখন ভগ্নস্তূপ প্রকাণ্ড ক্যাকার্ডটা। চোখ চালিয়ে দিলাম ভাঙ্গা জানলার ফাঁকে। স্টিয়ারিংয়ে বসে ড্রাইভার। আতঙ্ক সারা মুখে। এফোঁড়-ওফোড় করে দিয়েছে স্টিয়ারিং ওর শরীরটাকে। যেন বর্শার ফলক। তালগোলে পাকানো শরীরের উর্বাঙ্গ।

ব্যাগ চেপ্টে রয়েছে ক্লাচ আর ব্রেকের মধ্যে। যাক, এবার তো পেয়েছে তোমার সাধের ব্যাগ। বিশ্রাম করো এবার একটু, আমি করে আসি ফোনটা। ডেলা ঘুরে দাঁড়ালো আমার পাশে এসে, না জনি আমরা যাবো না পুলিসের ব্যাপারেও, জানানোও চলবে না সেটা কাউকে, ওযে মারা গেছে।

আরে পারযেই তো পরে জানতে সনাক্ত করবে গাড়িও। সোজাসুজি তাকালাম ডেলার চোখে। তবে আর উদ্দেশ্যটা কি চেপে যাওয়া এ ব্যাপারটা?

জানতে চেয়ো না এখন কিছু পরে বলবো তোমাকে সব। উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই তোমার এত, ঠিক আছে সব। ডেলা কথাগুলো বললো স্বাভাবিক গলায়।

গোলমাল হয়েছে তোমার মাথার অ্যাকসিডেন্টে বস তো চুপ করে। আমি খবরটা দিয়ে আসি পুলিসে। ডেলা হাত ঢুকিয়ে দিলো ব্যাগের মধ্যে আমার দিকে তাক করলো একটা অটোমেটিক, পিত্তল বের করে, আছ যেখানে থাকে সেখানে।

আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো একটা গাড়ি ঝড়ের গতিতে পেলোট্রার দিক থেকে হেডলাইট জ্বালিয়ে। নিশ্চল বসে আমরা দুজন। চাঁদের আলো পড়ে ভীতিজনক করে তুলেছে ডেলার হাতের পিস্তলটায়। কিছু কার বসোনা বোকামি করে। ডেলার গলা বরফ ঠাণ্ডা।

নামিয়ে রাখো ওটা ডেলা– কোনোরকমে বললাম কাঁপা গলায়। চেপে বসেছে জগদ্দল পাথরের মতো মাথার যন্ত্রণা। ডেলা মৃদু হাসলো ঠোঁটের ফাঁকে। পরম মুহূর্ত এসেছে আমার জীবনে। আমরা দুজনেই শুধু জানি যে পল নেই। জনি তুমি বুঝতে পারছে না

তুমি জানো না এই অবস্থায় যে কত জরুরী পলের মৃত্যু সংবাদ গোপন করাটা। শোনো, আমার সঙ্গে যদি হাত না মেলাও তুমি, তাহলে আমায় সরিয়ে দিতে হবে এ পৃথিবী থেকে তোমাকে। আর কোনো রাস্তা দেখছিনা তোমার মুখ বন্ধ করার। মনে হলো লোপ পেয়েছে ডেলার শুভবুদ্ধি। কিন্তু কোনো কারণ দেখছি না ও যা বলছে তা অবিশ্বাস করার।

আর একবার শীতল স্রোত নামলো মেরুদণ্ড বেয়ে। এখন সময় নেই সব কিছু খুলে বলার তবে বলে রাখছি একটা কথা–অনেক টাকা পাবে আমার সঙ্গে কাজ করলে। ডেলা আমার দিকে মেলে দিলো তার মৃত্যুনীল চোখ। কি করার আছে? আমাকে কি করতে হবে? ভাঙা গলায় প্রশ্ন করলাম ওর চকচকে চোখে চোখ রেখে।

দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো একটা বিদ্রুপের হাসি ডেলার নিষ্করুণ ঠোঁটে। তোমার গুলো ওর গায়ে চাপিয়ে দাও ওর জামা-প্যান্ট ছাড়িয়ে দরকার এটা রটে যাওয়া যে তুমি মরে গেছে মি? আমাকে চেনে পেলোট্রার সকলে– ডেলা আমাকে থামিয়ে দিল হাতের ইশারায়। গাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দাও। পলকে গাড়িতে তুলে দিয়ে। নানা আঁতকে উঠলাম, পারবো না আমি তা করতে। দাঁড়াও..

তোমাকে পারতে হবে–মরতে হবে নইলে, কোনো রাস্তা নেই দ্বিতীয়। দুরত্ব কমে এলো ওর হাতের অটোমেটিকটার। স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি, মাথায় যে আঘাত পেয়েছি। কেড়ে নেওয়া যেতো ওটা ওর হাত থেকে মদের মাত্রাটা বেশী না হলে কিন্তু এখনও গুলি করে বসবে হাত বাড়ালেই। আমি খুন করেছি ওর চোখে। নাও শুরুকরে দাওকাজ, নষ্ট হয়েছে অনেক সময়। এবার ডেলার নরম গলা। কিন্তু আমার জানা

দরকার ব্যাপারটা জানবে পরে। ডেলানড়ে বসলো একটু কি, উঠবে? না? ওর ঠোঁটে আবার খেললো সেই বীভৎস হাসি।

উঠেছি–হাত বোলালাম মুখোর্ভিজে গেছে ঠাণ্ডা ঘামে। পল যেখানে পড়ে আছে সেদিকে আস্তে হেঁটে গেলাম। শুরু করলাম ছাড়াতে ওর জামাকাপড়। তেমন রক্তপাত হয় নি ঘাড় মটকে যাওয়ায়। পাল্টালাম আমার জামা কাপড়। ডেলা দাঁড়িয়ে পিস্তল উচিয়ে। ওকে জুতো পরাতে গিয়ে আবার ফ্যাসাদ বাঁধলো।

হবেনা আমার দ্বারা। ঘাসে বসে পড়লাম। হবেনা পরাতে, ফেলে দাও গাড়ির মধ্যে। লোকে ভাববে খুলে পড়েছে পা থেকে। ওকে বসিয়ে দাও স্টিয়ারিংয়ে। চললাম পলের দেহ টেনে নিয়ে। মানুষটা ছিলো দশাসই চেহারার রীতিমত কসরৎ করতে হলো। একটুও কমল না কিন্তু আমার যন্ত্রণা। ওকে ঠেলে দিলাম গাড়ির দরজা খুলে, পল গড়িয়ে গেলো। খুলে আগুন লাগিয়ে দাও লিক–এ রুমাল বেঁধে। জেল খাটানোর ব্যবস্থা করছো তুমি আমাকে। আমার ভারী হয়ে আসছে নিঃশ্বাস করো যা বলছি যন্ত্রপাতির বাক্সটা আছে হুডের ভেতর। জলদি বের করে নাও স্প্যানার। খুলে দিতেই কারবুরেটারের পাইপটা, হাতটা পুড়ে গেলো সিলিন্ডারের ঢাকনিতে। নেই বোধশক্তি, হয়ে গেছি আত্মস্থ।

বাড়ছে কমছে মাথার যন্ত্রণা। ভারী হয়ে গেছে রবারের মতো পা দুটো। রুমাল বেঁধে দিলাম লিক পাইপে। কাঠি জ্বেলে দাও। ভাঙ্গা গলা এলো ডেলার। দিলাম। আগুনের হাছুটলো মুহূর্তে গাড়ির ইঞ্জিন থেকে।

সারা গাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো সে আগুন। কাঁপতে কাঁপতে লাফিয়ে সরে এলাম। ডেলা ছুটে এলো আমার পাশে। চলে এসো এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে কেউ দেখে ফেলার আগে...। হাঁটতে শুরু করলাম আমি ওর সঙ্গে। দুজন দ্রুতপায়ে চলেছি। নিঃশব্দ প্রাণী দুটি। মিলিয়ে গেলো গাড়ির আগুন চোখ থেকে।

ডেলা দাঁড়িয়ে পড়লো সৈকতের শ্বেতশুভ্র বালিয়াড়িতে পৌঁছে, হাঁফাচ্ছে, ওঠানামা সুস্পষ্ট উন্নত বুক দুটোয়। জনি দাঁড়াও। এবার ওর দিকে ভালো করে তাকালাম ঘুরে দাঁড়িয়ে। ওর হাতে এখনো আছে পিস্তলটা। তবে আর আমি নই সেটার লক্ষ্য। বেশী সময় নেই হাতে, কথা বলে নিই তোমার সঙ্গে। অবশ্য দরকার ছিলো খোঁজখবর নেওয়ার তোমার সম্পর্কে। কিন্তু যাক গে। ভাবিনি দেখা হবে এরকম একটা অস্বাভাবিক অবস্থায়।

ডেলা একটু থামলো, পরস্পরকে বিশ্বাস করতে হবে আমাদের এখন থেকে। থাকতে হবে একসঙ্গে। কতকালের চেনা আমরা যেন, আচ্ছা কি রকম তোমার সাহস? মানে, কতটা ঝুঁকি নিতে পারো জীবনে বড় হবার জন্য? কিন্তু, একবারও ভেবেছো কি সেটা যে আমাদের একুকর্মের জন্য কয়েদ খাটতে হবে? তোমাকে ভাবতে হবে না সে জন্য শোনো টাকা চাও তুমি? অনেক টাকা? আমরা আধাআধি কয়েক লাখ ডলার রোজগার করতে পারি নার্ভের জোর থাকলে। গেলাম শক্ত হয়ে। লাখ ডলার! মনে গাঁথা হয়ে আছে এই টাকার স্বপ্নই তো...ঠিক বলছো তো তুমি? বললাম অবিশ্বাসের স্বরে। বলছি শোনোই আগে সবটা। বসলো ডেলা, আমাকে দেখিয়ে দিলো পাশের জায়গা। ওখানে বসো–সামান্য দূরত্ব রেখে বসলাম, কোলে ফেলা ওর পিস্তলটা। আবার ওর মুখে চাঁদের আলো। ওকে সুন্দর দেখাচ্ছে এলোমলো চুল আর রক্তরেখায়িত মুখ।

ডেলা তার কথা রুদ্ধশ্বাসে বলে চললো। পল ওয়ার্দামের কাহিনী। কুখ্যাত জুয়াড়ী, তিনতিনটে, ক্যাসিনোর মালিক লোকটা, মালিক কোটিকোটি টাকার। তাই শকুনির দল ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর মৃত্যুর খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ম্যানেজার আছে ক্যাসিনোগুলোর আলাদা আলাদা। তৎপরতা বেড়ে যাবে ওদের কানে খবরটা পৌঁছলে। আমাদের চুষতে হবেবুড়ো আঙুল। আমাদের কাজ গুছোতে হবে পলকে বাঁচিয়ে রেখে, আমার পরিকল্পনা এটাই।

কাজটা সহজ হবে তুমি সঙ্গে থাকলে কয়েক লক্ষ ডলার মনে রেখো। নার্ভের দরকার শুধু একটু। তাই করবে আমি যা বলবো। আমরা ঠিক বেরিয়ে যাবো। হওয়া উচিৎ আমার উত্তর না এবং উঠে শুরু করে দেওয়া চলতে কিন্তু একটা কাজই হবে তাতে। মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে হবে বালিয়াড়িতে। পিঠে গুলি খেয়ে। আমার মনে পড়লো টম রোশের কথা। জনি, হঠাৎ বিপদ আছে অনেক টাকা হাতানোর। বলিনি আমি। না, পারিনি বলতেডেলা এখনো খুনের মেজাজে আছেও হাল্কা চালে কতাবার্তা বললেও, আমার মনে হলো। ভাবলাম টাকার কথা–কি করা যেতে পারে ও টাকায়? বললাম শেষে, কিন্তু কি করে চেপে রাখছে ওর মরার খবরটা? আর মনে করে কতদিনই বা চেপে রাখবো? ডেলা এলিয়ে দিলো শরীরটা মৃদু হেসে, স্পষ্ট হলো নিতম্বের রেখাঁ হাঁটু মুড়তে।

মুখ না খুললেই হলো তিন চারটে দিন। এসে যাচ্ছে টাকাটা আমাদের হাতে। সব শুনি বলে যাও সরানো আছে পর্যাপ্ত টাকা প্রতিটি ক্যাসিনোতে–যাতে কারবারের অসুবিধা না হয় ব্যাঙ্কের গোলমাল হলেও। জানো তো লিঙ্কন বীচের ক্যাসিনোটা বিশ্রামস্থল কোটিপতিদের টাকাটা রাখা আছে ওইখানেই জ্যাক রিককা লস এঞ্জেলসের ক্যাসিনো চালায়। নিক রাইসনারের দখলে লিঙ্কন বীচের ক্যাসিনো, পিট্রলেভিনস্কার হাতে

প্যারিসেরটা। ডেলা আমার দিকে ঘুরলো বুক দুটো টান করে, রাইসনার জানতে পারলো পল ক্যাসিনোর উদ্বৃত্ত টাকা, জুয়োতে লাগাচ্ছে প্যারিস যাওয়ার মুখে।

সামনে একটা লোক এসে দাঁড়াল। লোকটাকে যথেষ্ট শক্তিমান মনে হলো বেঁটে হলেও। সে তুলে ফেললো আমাকে অবলীলায়। শরীরের সমস্ত ভার আমি ওর ওপর ছেড়ে দিলাম। ঠিক আছে, আমার ঘর এইতো কাছেই–স্যার ঘাবড়াবেন না আপনি। মনে হলো ডেলাও হাত ধরেছে আমার একটা। টলতে টলতে এগোলাম আমি ধীর পায়ে ওদের দুজনের সাহায্যে। চোখ বুজে ফেললাম বিছানায় শুয়ে। শুনলাম লোকটার গলা। দিদি ভালো নয়তো ওঁর অবস্থা, ডাকি ডাক্তার ডেলার গলা। কতদূরে টেলিফোনটা? হবে আধমাইলটাক? লোকটা দূরে সরে গিয়েছে আমার কাছ থেকে। ভালো করে দেখতে পাচ্ছি এখন ওর চেহারাটা শেষ সীমায় বয়স প্রৌঢ়ত্বের, অনেক জীবনযুদ্ধের স্বাক্ষর ঝাকড়া চুল আর রেখাঙ্কিত মুখে। চোখ ফেরালাম ডেলার দিকে, সে বসে আছে একটা চেয়ারে। সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় কঠিন মুখের রেখাগুলি। ও শোকার্ত হয় নি পলের মৃত্যুতে কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবেনষ্ট হয়েছে ডেলার মানসিক স্থৈর্য এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে। একটা হুইস্কির বোতল বের করে আনলো দৌড়ে ভেতর থেকে লোকটা ওর দিকে একবার তাকিয়ে। ডেলা একচুমুকে শেষ করে দিলো গ্লাস ভর্তি পানীয় বাড়িয়ে দিতেই।

লোপাট হয়ে গেছে আমাদের গাড়িটা ডেলানামিয়ে রাখলো গ্লাস। শয়তানগুলো ডাণ্ডা বসিয়ে দিলো আমার বন্ধুর মাথায় আমাদের গাড়িটা আটকে। একটা খবর দেওয়া দরকার এখুনি লিঙ্ক বীচে–ভাইটি দেবে? ওরা এসে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে আমাদের এখান থেকে। দেখাতে হবে তত ওকে হাসপাতালে। খবর দিয়ে দিচ্ছি এখুনি সব সময় হাজির আপনাদের সেবায় হার্কনেস। হার্কনেস শোধ হবে না কখনও

তোমাদের ঋণ। লীলাময়ী হাসি ফোঁটালো ডেলা তার ঠোঁটে আমরা যাচ্ছিলাম লিঙ্কন বীচে। দিদি নম্বরটা দিন খবর গিয়ে দি একটা পুলিসেও–না এখনও না।

আগে দরকার ওকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া, তারপর খবর দেওয়া যাবে পুলিসে। হ্যাঁ, নম্বরটা লিঙ্ক বীচ ৪৪৪৪, পারবে মনে রাখতেনা, লিখে দেবো? না, না, হবে না লিখতে চাইবে রাইসনারকে–রিককার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছেবলবে, তার আসা দরকার তাড়াতাড়ি হার্কনেস এলিয়ে বেরিয়ে গেলো কথাগুলো একবার আওড়ে। বিছানায় উঠে বসলাম লোকটা অদৃশ্য হতেই কেন বলতে গেলে ওসব? এসে হাজির হবে পুলিসের খোচড়গুলো–আমার দিকে তাকাল ডেলা, অনেক দূরে কোথাও তার চোখ দুটো–উধাও, সে ভাবছে অন্য কিছু, এই জন্যে বললাম যে–ঠিকই গাড়িটা পলের, কিন্তু ভুয়ো নম্বরটা। ওটা চুরি গেছে খোঁজ পড়লে জানবে, বুঝলে

সেই হাসি ডেলার ঠোঁটে। ঠিকই বলছে ও হয়তো কিন্তু মনে ধরলো না আমার কথাগুলো কারণ পেলোট্রাতে খবর চলে যাবে দু–এক দিনের মধ্যেই। আমি ড্রাইভারটিকে খতম করে গাড়ি নিয়ে ভেগেছি রোশ আর অ্যালিস জানবে। ছিনতাইবাজ ভাববে ওরা আমাকে, এটা পারছি না। কিছুতেই মেনে নিতে। ডেলা আমার বিছানার পাশে বসলো লঘু পায়ে এগিয়ে।

এখুনি এসে পড়বে জনি, রাইসনারদারুণ চালাক কিন্তু লোকটা খুব সাবধান, তোমার সঙ্গে কথা বলতে দেবে না ওকে। আমিই বলবো যা বলার। মাথায় চোট তোমার, কাজেই বলা বারণ কথা। সায় দিলাম মাথা হেলিয়ে। ও সন্দেহ করবে শুধু একটা

ব্যাপারেই–কেন এসেছি আমি তোমার সঙ্গে। হয়তো ও যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে পলের সঙ্গে ক্যাসিনোতে ফোন করে।

পল প্যারিসের পথে উত্তরে জানাবে, আর রিককা যাত্রা করেছে লিঙ্কন বীচের দিকে। শুধু ও এইটুকু জানুক, তবে বড় জোর কিলবিল করে উঠলে মাথার পোকা কথা বলার চেষ্টা করবে। প্যারিসের লেভিনস্কীর সঙ্গে; কিন্তু লেভিনস্কীও কিছু বলতে পারবে না স্টিমার প্যারিসের ডকে না ভেড়া পর্যন্ত।

আটকে গেলো ঠোঁটে সিগারেট, বুলিয়ে নিলাম জিভ শুকনো ঠোঁটে। এক পাশবিক ইচ্ছা হলো ডেলাকে কাছে টেনে নেবার। পড়তে পেরেছে আমার মনের কথা ও বোধ হয় সরে গেলে সামান্য।

চেষ্টা করলো চোখে কাঠিন্য আনার, তাই ভাবো যা বলছি বুঝলে? তোমার কিছু জেনে রাখা দরকার পলের সম্পর্কে সে থাকতো কিভাবে। পছন্দ করতে কি কি...হোঁচট খেতে হয় বেশী এসব ছোটো খাটো ব্যাপারেই–বলে চললো ডেলা। কোথায় থাকত লস এঞ্জেলসের পল ওয়ার্দাম; টেলিফোন নম্বর তার। তার সব পরে পাওয়া গেল।

ডেলা খেলালো ঠোঁটে সেই বিচিত্র হাসি। সত্যি নয় পুরোপুরি কথাটা কিন্তু বললাম না তা আর ওকে। শুধু এটুকুই মনে হয়েছে ওকে পেতে চাই, ভাবতে পারো যা খুশী, কিন্তু পরস্পরকে জানা দরকার আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হলে। ম্লান হাসলো ডেলা, বুঝলাম। শোন তবে–পলের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা বছর দুই আগে।

আমি তখন ঘোরঘুরি করছিছবির রাজ্যে ঢোকার জন্য। আমার অবস্থা প্রায় কপর্দকহীন, আমার জীবনে দেখা দিলে পল এমন সময়। ওর কাছে আমার কোনো মূল্য ছিলো না মানুষ হিসাবে নিষ্ঠুরতা পুরোদস্তুর স্বার্থপর আর লোকটা ঔদ্ধত্যের প্রতিমূর্তি।

কিন্তু ওর টাকা ছিলো, দরাজ হাতে খরচও করতো। তা, আমি পড়ে গেলাম পলের চোখে। আর যত রকম প্রক্রিয়া জানা আছে পয়সা হাতাবার, চললাম প্রয়োগ করে। টাকা খরচ করে চললো জলের মতো আমার জন্য। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই একসঙ্গে কিন্তু, গাঁটছড়া বাধা তো আমার ধান্দা। বাক্সে কৈলো সিগারেট বের করে ডেলা তিক্ত হেসে। ঘৃণা ওর রক্তিম ঠোঁটে, পল তার শিকার ভেবে ছিলো আমাকে–তাই সেকি হলো বিয়ের অনুষ্ঠানটাও, কারণ জীবিতা পলের স্ত্রী। কিন্তু আমার দেড় বছর কেটে গেলো ব্যাপারটা জানতেই। পল বললো ওকে ডিভোর্স করবে, অবশ্য শেষ পর্যন্ত করলোও।

ও পরিষ্কার করে নিলো গলাটা কেসে, সই হয়ে যাওয়ার কথা সামনের মাসেই ডিভোর্সের কাগজপত্র, কিন্তু দেরি হয়ে গেলো বড্ড। ওর স্ত্রী এখন টাকা পয়সা সবই পাবে, নিঃসঙ্গ হয়ে যাবো আমি আবার। ডেলার কেমন বিষয় গলা, বেশ কেটে গেলো দুটো বছর। আমি আর ফিরে যেতে চাই না আগের জীবনে, জনি এটা করছি এত ভেবেচিন্তে সেই জন্যেই, আর নিরস্ত করতে পারবে না তা থেকে কেউ আমাকে দরজার হাতল ঘোরার আওয়াজ উঠলো ডেলার কথা শেষ হবার মুহূর্তে। শুয়ে পড়লম বিছানায় সটান। চিতপাত হয়ে। ঢুকলো জুড হার্কনেস। ত্বরিতে ঘুরলো ডেলা। রাইসনারকে পেলে? হ্যাঁ আসছে। আমার কানে লাগলো ওর কথা বলার ভঙ্গি ওকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করলাম চোখের কোণে। আমার দিকেই তাকিয়ে হার্কনেসও। জ্ঞান হয়নি? বোধ হয় ঘুমোচ্ছ নিঃশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক, জবাব দিলো ডেলা। সারা ঘর জুড়ে একটা দীর্ঘ অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ

নামলো। হার্কনেস কথা বললো অনেকক্ষণ পরে, ফোন ধরেছিলেন যিনি, বললেন তার আসতে দেরী হবে ঘণ্টাখানেক।

এবার আমি শুতে যাবো আপনাদের অসুবিধা না হলে অনেক রাত তো হলো হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে। আর বিরক্ত করবো না ভাই, তোমাকে। ধন্যবাদ অনেক, তুমি যা করলে–ঠিক আছে।

লজ্জা দেবেননা একথা বলে বারবার। আচ্ছা, তাহলে, আর কিছু লাগছে আপনাদের? না–, রয়েছে তো সবই। তোমাকে আর উঠতে হবে না মিঃ রাইসনার এলে–

থামলো ডেলা, হার্কনেসের দিকে বাড়িয়ে ধরলো ব্যাগটা খুলে কয়েকখানা নোট বের করে, মনে যদি কিছু না করো, তাহলে, এই সামান্য দরকার নেই।

হার্কনেস ডেলাকে থামিয়ে দিলোনা, একশো আছে, তোমাকে নিতেই হবে এটা। একটা কথা আর–তোমাকে গোপন রাখতে হবে এ সবই।

বলবে জিজ্ঞাসা করলে কেউ কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা কেমন? হার্কনেস টাকাটা নিলো সামান্য ইতস্তত করে, ধন্যবাদ।

আমি মুখ খুলি না আমার মাথা গলাবার নেই এমন কিছু ব্যাপারে। সে দরজাটা টেনে দিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম। ডেলা আঙুল তুললো পর্দাহীন–জানলাটার দিকে, ওইখান দিয়ে দেখেছিলো ও আমাদের। ওর গলা প্রায় খাদে। মনে হলো আমারও তাই। ডেলার কাছ থেকে যেটকু জেনেছিলাম রাইসনার সম্পর্কে, তাতে

আমার ধারনা হয়েছিলো ওকে হলিউড মার্কা নৃশংস চরিত্রের একটা জীব বলে। কিন্তু ধারণা পাল্টাতে হলো ওকে দেখার পর। মনে হলো চল্লিশের নীচেই লম্বা ছিপছিপে চেহারার রাইসনারের বয়স। কিন্তু খড়ির মতো সাদা তার চুল, চোখে মুখে মাস্টার মশাই ছাপ। বাজ পাখীর মতো টিকালো নাক, সারা মুখে বিষণ্ণতার ছোঁয়া। রাইসনার ডেলাকে দেখেছিলো দরজায় দাঁড়িয়ে।

ডেলা তাকে অভ্যর্থনা জানালো মৃদু হেসে চোখে চোখ মিলতেই, নিক এলে। পরে হবে কথাবার্তা আগে বেরোনো যাক এখান থেকে। রাইসনার বঙ্কিম হাসি ফোঁটালো ঠোঁটের কোণে। ডেলাকেই যেন উদ্দেশ্য করলো আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে।

মিঃ রিককা? রাইসনারের নরম মেয়েলি গলা আশা করি নি যা। চোখ বোলালাম ওর সারা শরীরে ছিমছাম পোয়াক কেতাদুরস্ত।

নষ্ট হতো বোধহয় প্যারিসের অভিজাতমহলে পলের ইজ্জত আমি সঙ্গে থাকলে– ডেলা বললো ঠোঁট উল্টিয়ে, তাছাড়া এটাও হয়তো ওর অভিপ্রায় আমি জনির সঙ্গে থাকি। জানি। রাইসনার উচ্চারণ করলো অস্ফুটে, গাড়ি তুলে দিয়ে বড় রাজায়।

চোখে পড়েনি অসাধারণ কিছু তুলতেই বা গেলে কেন? লোকটা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো শহর ছেড়ে বেরোবার জন্য, যেতে চায় মিয়ামিনা কোথায় বললো। খারাপ হয়ে গেছে তার গাড়িটা নাকি। অনুনয় করতে লাগলো পৌঁছে দেবার জন্য লিঙ্কন বীচ পর্যন্ত।

বললো কিছু শহরের নাম? হ্যাঁ, পেলোটা। ঠিক আছে কি করা যায় দেখি। মনে হয় না পল চট করে ভুলতে পারবে বেন্টলে গাড়ির শোক। যা বলেছে। ডেলা খুললো সিগারেটের প্যাকেট।

গাড়ি এগিয়ে চললো দ্রুতগতিতে। কেউ কোনো কথা বললো না অনেকক্ষণ। প্রথম স্তব্ধতা ভাঙলো রাইসনারই, কমই বলেন দেখছি আপনি তোকথা, রিককা সাহেব। নিরিবিলি পছন্দ বেশ, তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু আপনিই যেন বক্সিং রিং থেকে নেমে এলেন আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে। ডেলাই মুখ খুললো আমি কিছু বলার আগেই, একটা লোক মার খায় তুমি নিশ্চয় আশা করো না আর একজনকে ভাগতে হবে গাড়ি নিয়ে সুড়সুড়িয়ে। জনি যুঝেছে যতক্ষণ পেরেছে। তাহলে আর একটা বিশেষণ যুক্ত হলো শান্তর সঙ্গে বলবান। এবার বিদ্রুপের সুর সুস্পষ্ট রাইসনারের গলায়, তাহলে তোমার মতোনয়, মিসেস ওয়ার্দাম, হাততালি দেবে দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। তখন কি করা উচিৎ ছিলো আমার, চেল্লানো?

ডেলা বলে উঠলো গলার শির ফুলিয়ে। একটা বন্দুক থাকে সব সময় তোমার সঙ্গে আমি তো জানতাম, তাহলে ওটা রাখার কি দরকার যদি সময়ে ব্যবহার নাই করা গেলো। এবার শক্ত হয়ে মুঠো হতে দেখলাম ডেলার হাত দুটো। রাইসনার জিতলো প্রথম পর্যায়ে। ডেলা বলে দিলে নির্বিকার মুখে, বন্দুক ছিলো না আমার সঙ্গে।

ছিলো না? এই প্রথম, তাই নয় কি? রাইসনার ডেলার দিকে তাকালো গাড়ির আয়না দিয়ে। বৃষ্টি হয় ছাতা সঙ্গে না থাকলে, তাই না? বুঝলাম রাইসনার কথাগুলি বলছে না নিজের কানে মধুবর্ষণ করানোর জন্য। সন্দেহ করছে ও। যদিও সে বকেছিলো আমাদের

উত্তরের অপেক্ষা না করে, কিছু বের করতে চাইছে তবু মনে হোল। টোকা দিলাম ডেলার হাঁটুতে। ইশারায় দেখিয়ে দিলাম হাত ব্যাগটা ও ফিরতেই। ও বুঝলো ইঙ্গিতটা, পিস্তলটা বের করে দিলো ব্যাগ থেকে আসনের নীচে নামিয়ে। সেটা ফেলে দিলাম পকেটে। আচ্ছা, কেন হঠাৎ থামতে গেলে পেলোট্রায়? আচমকা রাইসনার প্রশ্ন করলো।

মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম আমরা। ধরিয়ে দিতে হোল না আমাকে আর খেই, ইতি ঘটানো দরকার ওর প্রশ্নোত্তরের আসরে, মশাই দেখুন বাদ দিন তো এইসব হেঁদোকথাবার্তা–জাম খেয়ে আছে মাথাটা শালা–পৌঁছে দিন তাড়াতাড়ি একটু ঘুমোবো। রাইসনার চুপ করে রইলো একটুক্ষণ। নিশ্চয় নিশ্চয়। সে বাড়িয়ে দিলো গাড়ির গতি, মনে করবেন না কিছু, আমার বহুকালের বকুনির অভ্যেসটা।

উঠতে লাগলো গাড়ি চড়াই। তাকালাম জানলার বাইরে। লিঙ্কন বীচ। জানালো ডেলা। রইলাম তাকিয়ে সমুদ্রের মুখে, শহর অর্ধবৃত্তের আকারে। শহরের অল্পই দেখা গেলো গাড়ির প্রচণ্ড গতির জন্য কিন্তু দেখলাম যেটুকু তাতে শহরটাকে আলাদাই মনে হলো আর পাঁচটা সৈকত শহরের থেকে। ঘড়িতে এখন রাত দুটো–স্ফটিকের সমাহার আর আলোর লাল–নীল ফোয়ারা শহরের সর্বত্র। চোখে পড়লো নিওনের প্রাচুর্যও। মনে হয় রূপকথার রাজত্ব।

বাহবা দিলাম। বাঃ জায়গাটা তো বেশ; ক্যাসিনো ওইটে হোল–যেটা দেখছো উপসাগরের শেষে হাত বাড়ালো ডেলা, তারপর বললো রাইসনারের উদ্দেশ্যে, নিক দেখাচ্ছে কিন্তু ভালোই। যেন স্বগতোক্তি করলো রাইসনার। আমরা ক্যাসিনোতে পৌঁছে গেলাম অল্প

কিছুক্ষণের মধ্যেই। পাহারা রয়েছে গেটে; কালো পোষাকের দুজন দুপাশে। হিটফলারের ঝটিকা বাহিনীর পোষাক। হাত তুললো ওরা, ভাবলেশহীন মুখে।

এগিয়ে চললো গাড়ি, দুপাশে আলোর সারি। বিভ্রম সৃষ্টি করা হয়েছে আলোর কারসাজিতে, গাড়ি যেন চলেছে জলের তলা দিয়ে। এগুলো লাগিয়েছিমাসদুয়েক হলো, আলোর ব্যবস্থা করেছি সম্ভাব্য সব জায়গাতেই; যেন দেওয়ালী পোকা পয়সাওলা মানুষগুলো, রাইসার বললো, ছুটে আসে আলো দেখলেই। বেড়েছে ব্যবসাও।

নিজের মনের কথা যেন বলে চলেছে রাইসনার।

রাইসনার আবার শুরু করলো ডেলা কি একটা বলার জন্য মুখ খুলতেই; আলো দিয়েছি প্রতিটি ফুলের বাগানেও। পল তো মাঝে মধ্যে গাই-গুই করতে টাকা খরচ হচ্ছে বলে কিন্তু টাকায় টাকা পয়দা করে এখন বুঝেছে। দূরদূরান্ত থেকে কত মানুষ ছুটে আসে শুধু ফুল দেখতে। বারে ঢোকে পরে খরচাকরে মালের পেছনেও। ঘাসে ঢাকা এক ফালি জমিতে পড়লোরাভা এবার। ক্যাসিনো দাঁড়িয়ে আলোর সমারোহ নিয়ে আমাদের সামনে, স্বপ্রতিষ্ঠিত আপন মহিমায়। যেন একটা দৃশ্য আরব্যরজনীর : কেল্লা মূরীয় ভাস্কর্যের অনুকরণে, আলোর ঝরনা মিনার থেকে বিচ্ছুরিত, ঊর্ধ্বমুখী রাতের আকাশ ভেদ করে। অদুরে চলেছে নানা রংয়ের আলো জ্বলা নেভা স্বয়ংক্রীয় প্রক্রিয়ায়। রিককা সাহেব, কিছু করতে পেরেছেন এরকম লস এঞ্জেলসে? না বোধহয়। দশ হাজার খরচ করেছি এজন্য আমরা। রাইসনার গাড়ি চালিয়ে গেলোক্যাসিনো পেরিয়ে। উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় সজ্জিত অঞ্চল পার হয়ে। সেখানে অনেক মানুষের কলতান এতরাতেও। সৈকত থেকে কিছুদুরে আর একটা গেট পেরিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো সারি সারি অনেকগুলি কুটিরের একটার

সামনে। এসে গেছি। জানোই তো মিসেস ওয়ার্দাম সব ব্যবস্থা করা আছে তোমার জন্য, রাইসনার এই প্রথম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো ডেলার দিকে, কি ব্যবস্থা করবো রিককা সাহেবের?

ওকে দাও, পল ব্যবহার করে যেটা, ডেলা বললো অম্লানবদনে, গাড়ি থেকে নেমে। রাইসনার প্রশ্ন করলো একমুহূর্ত থেমে। পাঠিয়ে দেবো কি ডাক্তার? দরকার নেই কোনো, ঠিক আছি আমি–ঠিক হয়ে যাবো ঠেসে ঘুম দিলেই। যেমন বোঝেন, উপেক্ষা ধ্বনিত হলো রাইসনারের। গলায়।

নিক আর দরকার নেই অপেক্ষা করার। কাজের কথা হবে সকালেই। ধন্যবাদ সাহায্য করার জন্য আমাদের। ঠোঁটের ফাঁকে হেসে রাইসনার ডেলার মুখ থেকে আমার মুখে চোখ ঘোরালো, আবার তার চোখ ফিরে গেলো ডেলার দিকেই। তাহলে চলি, দেখা হবে কাল দুপুরে কাজে বসা যাবে খাওয়া দাওয়ার পর। আস্তে চলতে আরম্ভ করলো বিরাট গাড়িটা চলতে। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম গাড়ির পেছনের আলো দুটোর দিকে গাড়িটা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। লম্বা নিশ্বাস নিলো ডেলা। দেখলে তো রাইসনারকে কেমন মনে হলো?

চালাক লোক। হুঁ এলো ভেতরে। শুকিয়ে গেছে গলাটা, ভিজিয়ে নি একটু। ডেলা আলো জ্বালিয়ে দিলো কুটিরে ঢুকে! বেশ বড়ই ঘরটা ব্যবহার করা যায় দিনের বসার ঘর হিসাবে, আবার ব্যবস্থাও রয়েছে রাতে শোবার। একটা রান্নাঘরও আছে, লাগোয়া কলঘর। বিলাসিতার ছাপ সর্বত্র। বন্দোবস্ত সব কিছু বোতাম টিপে সবার। ডেলা ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে। কেমন, ভালোনা ব্যবস্থা? পলের

দারুণ শখ ছিলো এসব ব্যাপারে। এখানে এরকম কুটির আছে গোটা ত্রিশেক–তার নিজস্ব সজ্জা নিয়ে প্রত্যেকটিই–এটাই পছন্দ আমার কিন্তু।

ও দোলাতে লাগলো পা, একটু জলের ব্যবস্থা–হুম কি আছে ওই আলমারিতে? হুইস্কিতে সোডা ঢেলে ডেলার দিকে গ্লাস বাড়িয়ে দিলাম। ডেলা এগিয়ে এল আমার দিকে।

যাবো না, বললাম মিসমিসিয়ে, আমার হাত কাঁপছে। ভারী হয়ে আসছে নিঃশাস। একদিন আমরা মিলবো একসঙ্গে কাজ করলে, জনি–কিন্তু আজ না। যাও শুতে।

প্লিজ এখন না। ওর কাঁধে নামিয়ে দিলাম আমার হাত দুটো। ডেলা শিউরে উঠলো। ওকে আমার মুখোমুখি টেনে ঘুরিয়ে দিলাম, শুধু তোমার কথাই শুনে আসছি তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে, করছি যা বলছে। আমার কথায় চলতে হবে তোমাকে এখন থেকে। দুপাশ থেকে আমার গলায় নেমে এলো ডেলার হাত দুটো, ও কণ্ঠলগ্না হলো। আমার খুব ভালো লাগে যখন তুমি এভাবে কথা বলো জনি। ডেলা আমার ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে দিলো।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম রাজকীয় প্রাতঃরাশ চুকিয়ে। পাশের কুটিরে নজর গেলো সিগারেট ধরিয়ে পায়চারী করতে করতে। আমার দিকেই আসছে ডেলা বেরিয়ে। ডেলা আর একবার আমার হৃদয় দোলালো আকাশ নীল হাতকাটা স্কার্ট, মাথায় নায়িকা টুপি আর রোদ্দুর চশমায়। অ্যাই জনিডেলা ছুঁড়ে দিলো তার মনোহর হাসি।

দারুণ দেখাচ্ছে কিন্তু তোমাকে। আমার মুগ্ধ দৃষ্টি। খারাপ দেখাচ্ছে না তোমাকেও কিছু। হাসিটুকু লেগে আছে ওর মুখে। ও চোখ বোলালো আমার কলারওলা গেঞ্জী আর ঢোলা প্যান্টে মাপসই হয়েছে বেশ। হয়েছে তা তো, কিন্তু কোত্থেকে জোটালে এ গুলো?

জুটিয়েছি আমিই, জোটাচ্ছি তো সব কিছু সকাল থেকেই।

ডেলা হাসি থামালো, চলো যাওয়া যাক দর্জির কাছে, তোমার জন্য অর্ডার দেবো কিছু পোষাকের–বিশ্বাস হচ্ছে না আমার তো কিছুই, কোথায় মিয়ামি যাবার ধান্দা করছিলাম। ট্রাকে চড়ে, আর...।

ওর সাদা সাদা দাঁত মেলে দিলো ডেলা আবার, সব ঠিক আছে। আরে, এসো নিকের সঙ্গে বসতে হবে আবার এদিকটা সেরে। ওর সঙ্গে ঘুরলাম ঘণ্টা খানেক ক্যাসিনোর চত্বর, দর্জির কাজ সেরে। হীরের নেকলেস থেকে অ্যাসপিরিনের বড়ি–দোকানপাট লিলিফুলে ভরা দীঘি, মৎস্যাধার বাগান, সবই করেছে ওয়াদাম–সবই। কৃত্রিম জলাশয় ওক গাছের ছায়ায়, জলে স্পেনীয় শেওলার বিস্তার। বিদ্যুৎ চালিত নৌকা ভাড়া করুন বান্ধবীকে নিয়ে যদি হারিয়ে যেতে চান। একটা ছোটখাটো চিড়িয়াখানাও আছেক্যাসিনোর পেছনে। সেখানে সারাদিন কিচিরমিচির চলছেনানা দেশের পাখীর, দেখবে এসোসিংহের গুহাটা। পশুপ্রেমিক ছিল পল। তার পশুরাজদের প্রতি অসীম দুর্বলতা ছিলো তাজ্জব বনে যাবে তুমি শুনলে, কত মানুষ শুধু এই লিঙ্কন বীচে পায়ের ধুলো দেয় ওই জানোয়ারগুলোকে দেখবার জন্যেই।

আমরা পাশাপাশি দাঁড়ালাম গুহার ওপরে রেলিংয়ে, আমার কাঁধে ঠেকানো ডেলার কাঁধ। দৃষ্টি চালিয়ে দিলাম নীচে গোটা দুয়েক পশুর বিচরণ চলেছে অলস পায়ে।

বললাম দেখার জিনিষই বটে। এদের নিজের হাতে খাওয়ায় রাইসনার। এদের জন্য সবটুকু ওর অবসর সময়ের। ফিরে দাঁড়ালো ডেলা। ফেরা যাক চলো, দেখার আছে আরো অনেক কিছু পেরিয়ে চললাম মুক্ত অঙ্গন রেস্তোরাঁ। উঁকি দিলামনীচের ঘরে, কাঁচ বসানো মেঝেতে। আমাদের দেখে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলো মধ্য বয়স্ক এক মেদবহুল ইতালীয়।

লোকটার পরনে নিখুঁত প্রতিক পোষাক। জনি, লুই পরিচয় করিয়ে দি, তিনটে রেস্তোরাঁই এর এক্তিয়ারে আমাদের এখানকার। লুই ঝুঁকে অভিবাদন করলো ডেলা তার দিকে ফিরতে। লুই কেমন আছ? ডেলা ওর কুশল জানতে চাইলো মিষ্টি গলায়। ভালো ম্যাডাম।

জনি রিককা ইনি। সন্ধানী দৃষ্টি হানলো ইতালীয়টি আমার দিকে তাকিয়ে, হাত বাড়িয়ে দিলো ঝুঁকে, মিঃ রিককা আপনার কথা শুনেছি–সব খবর ভালো, আপনাদের লস এঞ্জেলসের? হ্যাঁ ভাই, কিন্তু কিছুইনা এখানকার তুলনায়। হাসলাম। কৃতজ্ঞতার ছোঁয়া নামলো লুইসের চোখে, আর ওয়াদাম সাহেব? ভালো আছেন তিনি? ডেলাকে এবারের প্রশ্ন। ভালোই প্যারিসের পথে তিনি তো এখন, ভাগ্যবান লোক তো।

ও, তা আমার এখানেই খাচ্ছেন তো আপনারা? হ্যাঁ। সম্মতি দিলো ডেলা। একটা বিশেষ পদ রাঁধবো আজ আপনাদের জন্য। গলা মেলালাম। বেশ। আচ্ছা লুই দেখা হবে পরে।

এগোলো ডেলা। আমাদের কি ওখানেই চার বেলা খাওয়ার বন্দোবস্ত? বললাম, লুই বাইরে বেরোতেই। হ্যাঁ, ওইখানেই অন্য দুটোর একটাতে না হয়। অবশ্য পলের সবগুলোই। এরা না জানা পর্যন্ত ওর মৃত্যুসংবাদ আমারও। আমি অতটা ভাবিনি। ডেলা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো আমার কথায়। আমরা হেঁটে চললাম নিঃশব্দে। মুখ তুলে তাকালাম একটা গাড়ির শব্দে। একটা কভার্টিবল বুইক এসে দাঁড়ালো ক্যাসিনোর সদরে। একখানা গাড়ি বটে–সেদিকে তাকিয়ে রইলাম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। গাড়ি মিশকালো রঙের। হতবাক হয়ে গেলাম গদি, চাকা আর গাড়ির আধুনিকতায়। গাড়ি কেমন? পলের ওটাও। ওটাই ব্যবহার করতে এইখানে থাকতে।

এখন ওটা জনি তোমার। আমি প্রশ্ন করলাম ভাঙা গলায়। তোমারই তো। ডেলার ঠোঁটে রহস্যের হাসি, পাথর চোখ দুটো, তোমারই, অন্ততঃ ছড়িয়ে না পড়ছে যতদিন পলের মৃত্যুর খবর। বাড়লো অস্বস্তি। উত্তেজনাও। একই কথা বলে চলেছে কেন মেয়েটা বারবার? একদম ভালো লাগছেনা আমার ওই সব শুনতে, ডেলা বলতে কি ব্যাপার। কি বলতে চাইছো? কিছুই না, এসো। ডেলা এগিয়ে গেলো গাড়ির দিকে। বসে পড়লো দরজা খুলে। আমি দাঁড়ালাম, দরজায় হেলান দিয়ে, তুমি কিছু বলতে চাইছো, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে। নিরুত্তর ডেলা। শুধু বললো অনেকক্ষণ পরে, জনি উঠে পড়, তাকিয়ে আছে সবাই। চোখ তুললাম ওর কথায়। বিলাসিনীরা আমাদের গিলছে অত্যুৎসাহী চোখে।

বসে গেলাম স্টিয়ারিংয়ে। বেড়াতে যাবো শহরের দিকে। চলো গেটের দিকে। পথ বাতলে দেব রাস্তায় পৌঁছে। হাত দিলাম স্টার্টারে। গেটের দিকে গাড়ি এগোলো, আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি আমি কিন্তু এখনও। ডেলা আমার দিকে তাকালো ভাবলেশহীন

মুখে, চোখ ঢাকা গো গো র মুখোসে, বলতে চাইছি না আমি কিছুই। আপাততঃ আমাদেরই এসব, বলতে চাই শুধু এইটুকুই।

না হয় হলো তা, কিন্তু আড়াই লাখের, করছে না তো কোনো সাড়া শব্দ সেটার সম্বন্ধে? কিছুই বলছে না টাকার অঙ্কটা? কেনা যায় বলছো ও টাকায় ক্যাসিনো আর এসব? ডেলা নকল করলো আমার গলা। তবে তা বলছি না, আর এই গাড়িটা–কেনা যায় অনেক কিছু?

একবারও ভেবেছো তোমার কতদিন চলবে আড়াই লাখের অর্ধেক টাকায়? খাটাবো টাকাটা। অন্ততঃ বাঁচা যাবে ভদ্রভাবে। কি মনে হয় তোমার? খাটাবার মত কিছু থাকবে তো গাড়ি, বাড়ি আর ওয়ার্ডরোব কেনার। পোকা আছে তোমার মাথায়, বুঝলাম কুবুদ্ধি খেলছে ডেলার মাথায়। তোমার ওই টাকাটা পেলেই চলে যাবে আমি তো ভেবেছিলাম। ডানদিকের রাস্তা ধরো গেট থেকে বেরিয়ে ডেলা সেলাম নিলো পাহারাদারদের। বলেছিলে কি? পোকা আছে আমার মাথায়?

ও হেসে উঠলো, তোমাকে শুধু একটা কথাই ভাবতে বলছি–কেমন লাগবে তোমার রাইসনার যখন এখানকার মালিক হয়ে বসবে কিছুদিনের জন্য? টাকাগুলো তো পেলাম আমরা, কিন্তু অনন্তকাল চলবেনা তাতে তো, বাড়বেও না দাঁড়াও–দাঁড়াও আড়াই লক্ষ নিচ্ছি আমরা দুজনে মিলে তো–কিছুই না কি সেটাও? আর সিন্দুকেই পড়ে টাকা তো এখনও...

এ-ই লিবার্টি ইন। জো এলসনার মালিক হচ্ছে। এক ডাকে চেনে সকলে মহিলাটিকে বে স্ট্রীটের। করিয়ে দিচ্ছি আলাপ। কিন্তু মনে রেখো জনি-তুমি একজন বিত্তশালীদের দলের। এখানকার সকলে নামে চেনে রিককাকে। দেখলাম এলসনারকে মধ্যবয়সী বিশালকায়া মহিলা, দুশো পাউন্ডের কম নয় ওজনে। এগিয়ে এলো হাউহাউ করে ডেলাকে দেখে। লজ্জা পেলাম কথা বলতে লাগলো এমন ভাবে আমার সঙ্গেও। পীড়াপীড়ি চলল শ্যাম্পেনে গলা ভেজানোর জন্য। বিশেষ মেনু লিবার্টি ইনের। সঙ্গে নাচ, স্ট্রপটিজ অবশ্যই। এলস্নার ন্যাকা হাসি দিলো, সংগ্রহ করা হয় ওদের হাতে হাতে। মুখবদলও হয় সীমান্তে। ওরা আসে দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত থেকে। আজ সন্ধ্যায় আসুননা, দেখার জিনিষ। আমরা জুয়ার আড্ডার দিকে এগোলাম ইন থেকে বেরিয়ে। এখানে জেরী ইট্টার সঙ্গে পরিচয় হলো।

পুরোদমে খেলা চলছে পোকার। ইট্টা জানালো দিন তিনেক আগে এ খেলা শুরু হয়েছে। ইট্টা বললো দাঁতের ফাঁকে সিগারেট নাচিয়ে, আমাদের টাকায় দশ পয়সা। কয়েক হাজার পেয়ে যেতে পারি এ ব্যাপারটায় মনে হচ্ছে। পরিষ্কার বুঝলাম একটা ব্যাপার, ডেলাকে ভয় পায় ইট্টা আর এলসনার দুজনেই।

একই চিত্র অন্যত্র। ডেলা বাইরের দিকে পা বাড়ালো ডজনখানেক লোকের সঙ্গে দেখাশুনার পর।

ফেরা যাক চলো, বসতে হবে নিকের সঙ্গে। উঠে বসলাম গাড়িতে, এ গলিতে মনে হচ্ছে টাকার ছিনিমিনি চলে। চোখ বুজে থাকে নাকি পুলিসের লোক? চোখ খোলে না ওদের সেবা করা হয় বলে; আমার দিকে ডেলা হেসে ফিরলো। সাপ্তাহিক দক্ষিণা পাঁচশো।

পুলিস সাহেব হেম। সে টাকাটা পায় রাইসারের কাছ থেকে। তোমারও দেখা হবে ওর সঙ্গে। হেম ভালো মানুষের পো যতক্ষণ না টাকা পাচ্ছে, দাঁড়াবে হাজতের দরজা খুলে।

নেই তো ওয়ার্দাম। চলবে কি করে এ গ্যাড়াকল। বুইক চালিয়ে দিলাম ভীড় কাটিয়ে। মনে হয়না নিকটা সামলাতে পারবে, তাকে খুজছে এলস্নার আর ইট্টা। বেঁকে বসতে পারে যে কোনো মুহর্তে। তাই পরিচয়টা করিয়ে রাখলাম তোমার সঙ্গে ওদের। ডেলা ঠোঁট ঘষতে শুরু করলো অধররঞ্জনীর কৌটো খুলে।

এর আবার কি সম্বন্ধ ওদের সঙ্গে? ডেলার ঠোঁটে খেলে গেলো বিচিত্র হাসি।

জনি অনেক অনেক-রাইসনার বসে একটা বড় টেবিলের পেছনে, সিগারেট পাতলা ঠোঁটে। ধূসর চুলের বেঁটে মানুষটাকেও দেখলাম ওর ডানদিকের একটা আরাম কেদারায়, হিংস্রতার প্রলেপ চওড়া মুখে। উঠে দাঁড়ালো ডেলাকে দেখামাত্র উদার হাসি মুখে আরে মিসেস ওয়ার্দাম যে-খুশি হয়েছি আপনার হঠাৎ আগমনে। অবাকও কম হয়নি। বিস্তৃত হলো হাসি, দেখা প্রায় বছর খানেক পরে, কি বলেন? তারপর আছেন কেমন?

আরো সুন্দর হয়েছে আপনার চেহারা। লোকটা বলে ফেললো অনেকগুলো কথা একসঙ্গে। ডেলা পেলব হাতটা বাড়িয়ে দিলো একটা চটুল হাসি হেনে। লোকটা হাতটা নিজের হাতে একটু বেশীক্ষণই রাখলো। আসুন হাত টেনে নিলো ডেলা আস্তে, পরিচয় করিয়ে দি জনি। রিককার সঙ্গে। মালিক লস এঞ্জেলস ক্যাসিনোর। ডেলা আবার আমার দিকে ফিরলো, জনি-আমাদের অকৃত্রিম হিতৈষী পুলিস ক্যাপ্টেন হেম।

হেম হাত বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে, মিলিয়ে গেছে তার মুখের হাসি। সে আমার হাতটা শক্ত করেই ধরলো, মিঃ রিককা আনন্দ হলো আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। পুলিস সাহেব ঠোঁট কাটার মতো বললো, অনেক শুনেছি আপনার কথা।

ওর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আমিও, জানালাম। রাইসনার ব্যস্ত হয়ে পড়লো এই ফাঁকে ককটেলের বন্দোবস্তে, জিম একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে তোমার জন্য, মিসেস ওয়ার্দাম। ডেলার হাতে মার্টিনির গ্লাসটা ধরিয়ে দিয়ে বললো সে। খবরটা বলে দাও জিম। হেম আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলো রাইসনারের হাত থেকে হাইবলের গ্লাসটা নিয়ে। পাওয়া গেছে আপনার গাড়িটা। পেয়েছেন? প্রতিফলন হলো বিস্ময় আর প্রশংসার যুগপৎ ডেলার চোখে। কাজের লোক আপনি, ক্যাপটেন। তুলে ধরলো ডেলার দিকে হেম তার শান্ত নীল চোখ দুটো, খুব শক্ত ছিলো না কাজটা। রিপোর্ট এসেছিলো কাল রাতেই, তারপর সব পরিষ্কার হয়ে গেলো নিক আজ সকালে ফোন করতেই। কি জানলেন?

একটা সংঘর্ষ হয় পেলোট্রার বাইরে গত রাতে দুটো গাড়িতে। ড্রাইভার মরেছে দুটোরই। আপনার গাড়ি চালাচ্ছিলো তাদের একজন–গাড়িটা ছাই হয়ে গেছে একেবারে। অনন্য মুখভার ডেলার অ্যাঁ। ক্ষেপে যাবে তো পল শুনলে।

হু। দারুণ ছিলো গাড়িটা! হেম হাত বোলালো তার ভারী চোয়ালে। আচ্ছা মিসেস ওয়ার্দাম লোকটাকে কেন বলুন তো গাড়িতে তুললেন? রাইসনার আমার দিকে এগিয়ে এলো ডেলা ওর কাহিনীর পুনরাবৃত্তি শুরু করতেই, কি খাবেন আপনি–স্কচ? বলে বসলাম বিনা দ্বিধায়, ওসব চুই না আমি। শুধু খেতে পারি একটু বিয়ার। আমার চোখে আটকে গেলো রাইসনারের কালো চোখ দুটো, স্কচই আপনার প্রাণ আমি তো শুনেছি।

যাঃ। রিককা তো স্কচে হাবুডুবো খায় ভুলে বসে আছি। থেমে গেলো বুঝি বা হৃৎস্পন্দন, আমি নজর দিচ্ছি কিছুদিন শরীরের ওপর, শুধু বিয়ার খাচ্ছি মাঝে মধ্যে। চোখ ফিরিয়ে বললাম রাইসার পড়তে পারলো কিনা জানি না আমার চোখের ভাষা। আমার দিকে একটা বিয়ারের বোতল খুলে বাড়িয়ে দিলো ভাবলেশহীন মুখে। বলে চলেছে হেম তখন, মিসেস ওয়ার্দাম লিফট দেওয়া ঠিক হয়নি উটকো লোককে–কেন যে করলেন এটা।

না, মানে মনে হয়নি কিছু জনি তো সঙ্গে ছিলো তাই। এ প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার আমার মনে হলো।

ধুর আমার কোনো মাথাব্যথা নেই লোকটা কে তা নিয়ে। গাড়িটার কথা আমি ভাবছি। ক্ষেপে উঠবে পলতো শুনলে, বিশেষ করে তৈরী যে গাড়ির অংশগুলো। আমি অবশ্য যোগাযোগ করেছি এ বিষয়ে বীমা কোম্পানির লোকদের সঙ্গে, ওরা রাজী হয়েছে টাকা দিতে। রাইসনার বললো মদের গ্লাসে লম্বা চুমুক মেরে।

ডেলা মিষ্টি করে বললো, ধন্যবাদ নিক। হেম ফিরলো আমার দিকে, ঠিক রাখতে হবেনথিপত্র, তা একটা বর্ণনা দিতে পারেন লোকটার চেহারার রিককা সাহেব? অবশ্য কিছু পেয়েছি ওদের কাছ থেকে পেলোট্রায়, দেখি মেলে কিনা আপনার সঙ্গে। এক বারও তো ভাবিনি এদিকটা সর্বনাশ। এরা কি সন্দেহ করছে আমাকে ফারার বলে? হতবাক রইলাম মুহূর্তের জন্য। নিঃসঙ্কোচে বলে উঠলো ডেলা–মুখ খুলতে যাবো, জানেন মজার ব্যাপার আমাদের জনির মতো লোকটা অনেকটা দেখতে–স্বাস্থ্য ওর মতোই, লম্বা, চেহারা ফর্সা গোছের।

টাই একটা সবুজ–তামাকে মিলিয়ে রং, সাদা লিনেনের স্যুট, আর একটা সাদা রেশমী জামা পরেছিলো যতদূর মনে পড়ছে। ওই ব্যাটাই হবে–হ্যাঁ হ্য, কি জানেন মিসেস, চক্কর খেয়ে পড়ে ছিলাম নিক আর আমি তো, এত মিল রিককার সঙ্গে ফারারের। গোলমেলে ঠেকছিলো ব্যাপারটা–শয়তানটাকে দেখতে অবিকল জনির মতো সাহস পেয়ে গেছে ডেলা।

কিন্তু তা মানছেনা তো জনি, ও কন্দর্পকান্তি ওর ধারণা–ডেলা খিলখিলিয়ে উঠলো। হেমও সঙ্গে। কিন্তু ভাজ থেকেই গেলো রাইসনারের কপালে। উঠে দাঁড়ালো হেম, তাহলে কাজ মিটলো আজকের মতে, চলিহাজিরা দিতে হবে না আপনাদের আর কোর্টে–একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবে করোনার সাহেবের কাছে। ফারার গাড়িটা পেঁড়িয়েছিলো গাড়ি রাখার জায়গা থেকে, আর কি বলেন ধরতে পারেন নি আপনি তাকে?

যা ভালো বোঝেন। ডেলা দেখালো ঝকঝকে দাঁতের বাহার। স্বস্তি পাচ্ছি ঝামেলা থেকে বাঁচাতে পেরে আপনাকে, মিসেস ওয়ার্দাম। ডেলার নরম হাতটা চটকালো হেম আর একবার। যদি যান কখনও আমাদের ওদিকে, দেবেন পায়ের ধুলো। দপ্তরের জেল্লা বাড়ে সুন্দরীদের পদার্পণে। হেম মাথা নোয়ালো আমার দিকে ফিরে।

রিককা সাহেব চলি–বেরিয়ে গেলো হেম। অন্যদের জন্য তবুভাবে পুলিসসাহেব, সিগারেট ধরালাম আমি। ওর পেছনেতো অনেক পয়সা যায়, ভাববেই তো

পল একসঙ্গে খাতা দেখতে বলেছে ওকে আর আমাকে। থামিয়ে দিলাম রাইসনারকে। আমার জানার দরকার নেই পল আপনাকে কি বলেছে না বলেছে। ব্যস, কিছু জানায়নি আমাকে।

মশাই দেখুন হাতের ইশারায় থামিয়ে দিলো ডেলা আমি উত্তেজিত ভাবে কিছু বলতে শুরু করতেই, জনি কথা বলোনা তুমি, আমি জানি কি করে করতে হয় এসব ব্যাপারের সমাধান। ডেলা উঠে দাঁড়ালো।

তুমি উদ্ধৃত্ত টাকায় হাত দিয়েছে পলের ধারণা। দেখতে এসেছি আমরা সেটা তুমি পার পাবে না এসব বুকনি দিয়ে। ভালোয় ভালোয় চাবিগুলো দিয়ে দাও। রাইসনার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো মাথাটা পেছন দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, যেন সে শুনছে খুব মজার কিছু। তা কে অন্ন মারছে, তুমি? মজার ব্যাপার সত্যি–হো—হো শোনো। রাইসনার বন্ধ করলো হাসি, এখান থেকে নড়ছি তবেই, পল যদি আমাকে তাড়ায়, তার আগে না। মস্ত ভুল করেছে যদি সেরকম কিছু ভেবে থাকো তুমি আর রিককা। এটা আমার এলাকা ভুলে যেয়োনা। অসুবিধেই হবে বাড়াবাড়ি করলে। বদলে গেছে রাইসনারের গলার স্বর।

মনে হলো রাইসনারকে মেরেই বসবে ডেলা বুঝি এবার। কিন্তু না, ও সরে গেলো দুপা, মুঠোকরা হাত দুটো, আগুন ঝরছে চোখে, আচ্ছা দেখা যাবে। ডেলা ফিরলো আমার দিকে, খেতে যাই, এসো জনি। ও আর তাকালোনা রাইসনারের দিকে। উঠেদাঁড়ালাম আস্তে আমিও রাইসনার সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিলোকাগজ কাটা ছুরিটা রেখে, বলে উঠলো ডেলা বেরোতেই, আজব চীজ মেয়েমানুষগুলো। সে আগুন দিলো সিগারেটে, তার ব্যতিক্রম নয় ম্যাডামটিও, যাক আপনি বলবেন খাতাপত্র কখন দেখতে চান, এখানেই

পাবেন আমাকে সব সময়ে। রাইসনার আপনি ভুল করলেন। পল হিসেব দেখতে বলেছে ওকে। শুনেছি আমি নিজে।

শুনিনি আমি। ঠোঁটের ফাঁকে হাসলো রাইসনার, একটা সিগারেট কেস বের করলো পকেটে হাত ঢুকিয়ে, হা রিককা সাহেব ভালো কথা, এটা পড়ে ছিলো আপনার ঘরে। রেখে গেছে যে লোকটা ঘর পরিষ্কার করে। রাইসনার আমার চোখে তার সন্ধানী চোখদুটো তুলে ধরলো টেবিলে কেসটা নামিয়ে দিয়ে। কেসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সম্পত্তি ওয়ার্দামের। ছিলো ওই প্যান্টের পকেটে। কেন গেলাম এটা পুষে রাখতে। গাফিলতি আমারই, ধন্যবাদ। রাইসনার সেটা হাত দিয়ে চাপা দিলো। কেসটার দিকে হাত বাড়াতে, আপনার কি কেসটা? মানে? এটা পলের কাছে দেখেছি আমার তো মন হয়, এতে খোদাই করা আছে তার নামও। কি হলো তাতে?

সরে পড়াই ভালো সময় থাকতে ডেলা লাইটারটা সযত্নে নামিয়ে রাখলো একটা সিগারেট ধরিয়ে ও আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট টেনে চললো জানলার পাশে একটা ডিভানে। টেনে দেওয়া জানলার পর্দা। নরম আলোর প্রলেপ ঘরে।

টুকরো কথা ভেসে আসছে সৈকতের দিক থেকে ভিড় উপছে পড়ছে বালিয়াড়িতে, কেউ জলে নেই আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি খাওয়ার পাট চুকিয়ে পোষাকের বাহুল্য নেই, ডেলারশরীরে রেশমী ওড়না জড়ানো। একটা চিন্তার ছাপ মুখে চোখে, কড়িকাঠের দিকে ধোয়ার বৃত্ত ছেড়ে ডেলা একমনে সিগারেট টেনে চললো।

আমি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে। নষ্ট হয়ে গেছে স্নায়বিক স্থৈর্য সম্পূর্ণ।

ডেলার দিকে চোখ। ডেলা চোখ নামিয়ে আনলো কড়িকাঠ থেকে ধীরে।

কি হলো, পাচ্ছো নাকি ভয়? প্রশ্ন করলো ভ্র তুলে। ব্যাপার ভয়ের নয়, এক ধরনের অস্বস্তি এটা। মানে, তোমাকে নিয়ে কেউ খেলছে তুমি বুঝতে পারছো অথচ। সৈকতে দৃষ্টি মেলে দিলাম জানলার দিকে এগিয়ে।

ডেলা দ্যাখো, আমাদের খেলা খেলেছি আমরা তো, কিন্তু রাইসনার তুরুপ মেরেছে। কাঁচকলা আমি তো কিছুই বুঝি না হিসেবপত্রের। পড়তে পারবে ব্যালান্স শীটটা বড় জোর। কিন্তু তাতে গ্যাড়াকল ধরতে পারবোনা উদ্বৃত্ত টাকার। আচ্ছা, লোকটা সুবোধ বালকের মতো চাইবামাত্র চাবির গোছ এগিয়ে দেবে তুমি কি করে ভাবলে?

ডেলা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার সিগারেটের দিকে, কিন্তু ছাই ঝেড়ে ফেললো পরে, মেঝেয়, তাহলে? চাইছ পালিয়ে যেতে? পথ তো দেখছি না এছাড়া কোন।

ও শালা একটা বর্ণনা চাইবে হোলেনহাইমারকে ট্রাঙ্কে ডেকে, তারপর চুপসে যাবে বেলুন। ছিলোই তো ও ঝুঁকি। আমার মাথায় ওটা খেলেনি তুমি ভাবছো ন্যাকামি করলাম–খেলেছে? জানতাম ও শরণাপন্ন হবে হেলেনহাইমারের–লোকটা তো গাড়ল নয়। এগিয়ে এলাম ডেলার সামনে কিংকর্তব্য তাহলে? আমাদের কি করার থাকছে জানাজানি হলে আমি রিককানই? এতক্ষণে হয়তো–জেনেছে। ডেলাই ধরিয়ে দিলো আমার কথার শেষাংশ। ভাবছিলো ও নিয়ে ভাবনার জরুরী ব্যাপার আছে অনেক বেশী। ভালো তোমার

ভাবনা, কিছু নেই আমার ভাবনার। কয়েদখানায় ভাবতে বসতে হবে হেমকে খবর দিলেই। বেচারী! জনি আমার দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্য। ডেলা উঠে সোজা হয়ে বসলো।

কেন বুঝতে পারছেনা একটা কথা, আমরা চাপবার চেষ্টা করছি পল মারা গেছে। রাজ্য তছনছ হয় রাজ্যের রাজা মরলে। নীরব দর্শকের ভূমিকা নেবে না আদি ও অকৃত্রিম রিককা আর হেম, ইট্টা জো।

রাইসনার চুপচাপ থাকবে ক্যাসিনোর মালিকানা না পাওয়া পর্যন্ত। হেমকে ভাঙবেনা কোনো কথাই। হেম কেন, কিছু বলবে না কাউকেই। বুঝতে পারছো এখন, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি আমি কেন?

বসলাম ডিভানের এক কোণে। কিন্তু সুবিধের নয় লোকটা। হয়তো ও মুখ খুলবে না, কিন্তু এখানে জামাই আদরে রাখবে না আমাদের নিশ্চয়ই? ডেলা নাচাতে লাগলো তার মাংসল পা।

না, তার বদলে বুলেট নিতে হতে পারে হয়তো মাথায়। সংগত কিছু আশা করা যায় না রাইসনারের মতন লোকের কাছ থেকে এর চেয়ে। কিন্তু রাইসনার অদ্বিতীয় অ্যাকসিডেন্ট ঘটাতে। কি ভয় পাচ্ছো বুঝি? পাচ্ছি কি? পাচ্ছি হয়তো, কিন্তু করলাম না মুখে প্রকাশ। হচ্ছে না ভয়ের কথা। জানো না তুমি হয়তো, কাজটা খুবই সহজ ওর কাছে। ও দেবে হেমকে কাজে লাগিয়ে। লোকটা সব কিছু করতে পারে টাকার জন্য। আমাকে বিশ্বাস করতে বোলোনা এটা অন্ততঃ। খুনের ব্যাপার চেপে যাবে। বলছি না তা। আমি বলছি অ্যাকসিডেন্টের কথা। পায়চারি শুরু করে দিলাম উঠে ঘরময়। অশান্ত

হয়ে উঠছে মনটা আমার। কি চাইছো তুমি বলত? ইঙ্গিত করে যাচ্ছে শুধু তখন থেকে। ব্যাপারটা খুলেবলোত, কিছুরইঙ্গিত করছিনা। পরিষ্কার করে দিচ্ছি একটা রাজত্বের উত্তরাধিকার লাভ করার পথ। এটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কি তোমার যে বে স্ট্রীটের আর ক্যাসিনোর পয়সা–তোমার আমারও। পারছি না, কি করে? ভয় হচ্ছে ওর চেহারায়। শোনো, তুমি এই ক্যাসিনো দিব্যি চালাতে পারবে আমি সঙ্গে থাকলে আমাদের পয়সা রোজগার হবে দু হাতে।

রাইসনারের মন পড়তে পারবো না তোমার কি ধারণা। এতো মোটা আমার মাথা? আবার অশুভ ছায়া পড়লো মনে, ও ব্যাপারটা এই তাহলে? আর এতদূর টেনে এনেছো আমাকে এর জন্য?

বলছি তাইতো– পা নামিয়ে ডেলা উঠে পড়লো কোমরের একটা ভঙ্গি করে, তোমাকে এখানে এনেছি দেখাবার জন্য পরিকল্পনা ব্যাপারটা। তুমি গিলেছে টোপ, চেয়েছিলে টাকা–তোমার চোখের সামনে টাকা।

কত নেবে নেওনা। একটু সাহস শুধু। ধরালাম সিগারেট, কাঁপছে আঙুল। জানি না উত্তেজনায় না ভয়ে, ওই সোয়া লক্ষের ব্যাপারটা তাহলে বলছে কিছুই না ওটা?

ওমা, তা কে বললো–ঠিকই আছে সেটাতো। কিন্তু এখুনি তো বেরোনো যাচ্ছেনা ওটা নিয়ে। দখল করে ক্যাসিনো, হাতে এসে যাবে উদ্ধৃত্ত টাকাও।

হাসি পেল মানসিক অস্বস্তির মধ্যেও, আর রাইসার? শিস মারবে সে কি হাত গুটিয়েনা। এগিয়ে দেবে চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে? মাথায় গুলি ঢুকবে একটু আগে তো বললে! আমি শুধু। বলতে চাইছি একটা কথাই, তা হচ্ছে সাহস থাকলে তোমার।

অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে রাইসনারের। এবার জানা গেলো সব। আমার আন্দাজ করা উচিৎ ছিলো আগেই এরকম কিছু একটা ঘটবে কারণ ডেলার সব কথার মর্ম তো একই সারা সকাল থেকেই।

পড়ে গেছে দাবার দান, যাবে না, ফেরানো আর। ঘষে দিলাম সিগারেটটা ছাইদানে। তাকাতে পারছি না ডেলার মুখের দিকে। সরিয়ে দিতে হবে রাইসনারকে। ডেলার আশ্চর্য শান্ত গলা। বে স্ট্রীট আর ক্যাসিনো আমাদের।

আর কিছুই করার থাকবে না যখন রিককা মঞ্চে উপস্থিত হবে। ওকে আমাদের সঙ্গে হাত। মেলাতেই হবে টাকাকড়ি আর খাতপত্রের দখল নিতে পারলে আমাদেরই থাকবে লিঙ্কন বীচ। রিককা থাকতে পারে লস এঞ্জেলস নিয়ে। লেভিনস্কী তার জায়গায় থাকবে প্যারিসে।

স্বার্থকতার প্রান্তরেখায় আমাদের জীবন–আমার কাছে সরে এলা ডেলা আর একটু, নাকে আসছে চুলের সুবাস। কালো হরিণ চোখে তাকালো আমার কাঁধে হাত রেখে। জনি বলল কি করবে?

কি করবো আমি জানি। ডেলা একটা ভুল করেছে নিজের অগোচরে। বেরোনো অসম্ভব এখানে থেকে ওর ধারণা, কিন্তু নয় তা।

যাইহোক আপাতত থাকতেই তো হচ্ছে আমাদের। আমার এক উদগ্র ইচ্ছে এসব দখল নেবার–কিন্তু নিশ্চয় ওই মূল্যে নয়, তুমি বলে ছিলে না অ্যাকসিডেন্টের কথা? ওটা হবে না। অ্যাকসিডেন্টে হবে খুন। যেন অজন্তার ভাস্কর্য ডেলার মুখ।

হয় রাইসনার না হয় তুমি তোমাদের মধ্যে সেই জিতবে যে অন্যকে বাগে পাবে।

রাইসনার তোমার কোমরে চেম্বার ঠেকাবে তুমি রিককা নও জানতে পারলে। খুন হবে না তখন আর সেটা আত্মরক্ষা হবে–কি বলল? ছেলে খেলার কিছুই নেই এনিয়ে, এটা খুনই হবে। ডেলা জানলার বাইরে চোখ মেলে দিলো আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে, বলা যাবে তাই হেমকে। ~

ডেলা বললো আমার দিকে পেছন ফিরেই। বলবোউদ্ধৃত টাকায় হাত দিয়েছে রাইসনার, আমরা দেখতে এসেছিলাম খাতাপত্র। রাইসার ধরাও পড়লো কাজেই করে আর কি? সম্মান বাঁচিয়েছে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। বিশ্বাস করবে হেম কি সেকথা! সুইসাইড পার্টি নয় নিক শালা। করবে, চাদির জুতো মারলেই করবে।

দখল নাও তুমি ক্যাসিনোর জনি। শুধু একটা ধাক্কা রাইসনারের গলায়, ব্যাপারটি কি খুব বেশী মনে হচ্ছে? বুঝি না অতসব, বলেছি খুন করবো করবো তাই। ভাবছি না সে জন্য বিনিময়ে কি পাচ্ছি। ডেলা আমার দিকে তার একটা হাত বাড়িয়ে দিলো ডিভানে বসে। জনি এসো, বোসো এখানে আমার দিকে তাকিও না ওরকম চোখে। তুমি–ভালোবাসো তুমি আমাকে, তাই না? ডেলা প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো শেষের কথাগুলো।

ভালবাসায় মারা গোলি–শোন–আমাকে মনে করতে পারো তৃতীয় শ্রেণীর মুষ্টিক, কিন্তু গিলছিএই পরিকল্পনা দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ওয়ার্দামের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে। ডুববেরাইসনারকে না সরাতে পারলে এখন দেখছে আমাকে বেছে নিলে ওকে খতম করার জন্য। দেখিয়ে দিয়ে জায়গাভাবছে কাজ উদ্ধার করবে নাকের ডগায় একটা গাড়ি ভিড়িয়ে।

থামালাম, ভুল করছে ডো তুমি–তুমি তো জানোনা খুনের মাশুল সারা জীবন তোমাকে বয়ে বেড়াতে হবে মৃতের অভিশাপ কুড়িয়ে। আমাদের বাকি জীবনটা এই লিঙ্কন বীচেই থাকতে হবে হেমের মুখ বন্ধ করতে পারলেও।

সুখ থাকবে না আমাদের মনে। নিয়ত মনে পড়বে শুধু একটা কথাই...হত্যাকারী আমরা রাইসনারের। আর, মুখ বুজে থাকবে না হেম চিরদিনের জন্য। সিগারেট বের করলাম পকেট হাতড়ে, সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ে রইলাম না নেভা পর্যন্ত জ্বলন্ত কাঠিটার দিকে, ও দিনের পর দিন টাকা চেয়েই চলবে, হয়তো একদিন চাইবে ক্যাসিনোর মালিক হতেও।

তারপর একদিন তোমার মনের মানুষ হয়ে বসবে আমার ঘাড়ে, খুনের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে...না...না আমি নেই ওসবে। এখনো খারাপ হয়নি আমার মাথা...আমি নেই খুনের ব্যাপারে। তোমার জন্যেও না, তাবৎ টাকার বিনিময়েও নয় ক্যাসিনো বা সারা লিঙ্কন বীচের। ভাবের কোনো, প্রতিফলন নেই ডেলার চোখেমুখে। পা নাচাচ্ছে বসে। ও উঠে দাঁড়ালো কিছু পরে। এগিয়ে এলো এক পা আমার দিকে। বিশ্বাস করো না তুমি ওসব,

সোনা। ও হাতে হাত জড়ালো আমার, সব দিয়েছি তো আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই। ফিরিয়ে দিতে পারিনি কালরাতে তো তোমাকে বিপদ আছে জেনেও।

ডেলা জড়িয়ে ধরলো আমার গলাটা–শোনো পাগল করেছো তুমি আমাকে। কখনো দেখা দেয় নি আমার জীবনে তোমার মতো মানুষ।

তোমায় বিশ্বাস রাখতে হবে আমার ওপর, তাই ঠিক তুমি যা বললে নিক সম্পর্কে, কিন্তু বলো কি করবো। ওর ঠোঁট চেপে ধরলো আমার ঠোঁট, কথাগুলো মৃদুস্বরে বলে।

সরাতেই হবে ওকে। নইলে ওই সরিয়ে দেবে আমাদের। কিছু পাবো না আমরা, বোধ হয় বেরোতেও পারবোনা প্রাণ নিয়ে। পারলামনাকথাবলতে। ভাসিয়ে দিলো আমার সবকথা ডেলার ঠোঁটের উষ্ণতা। ওই অবস্থায় রইলাম আমরা অনেকক্ষণ। উত্তাল আমার রক্ত। জনি–আমার বুকে আরো চেপে ধরলো ডেলা তার শরীরটা। চোখবুজে আছি আমি...অকিঞ্চিতকর মনে হচ্ছে আমার কাছে দুনিয়ার আর সব কিছুই..শুধু আমি আর ডেলা..হাত ডুবিয়ে দিলাম ওর নিতম্বের শক্ত মাংসের গভীরে। আর্তনাদ করে উঠলো একটা অস্কুট..খুলে গেলো ওর ঠোঁট। হয়েছে অনেক, শেষ হলে ভালো হয় এবার ব্যাপারটা। আমার কানে বিষ ঢেলে দিলো রাইনারের নরম গলা। স্থানকাল আছেসব কিছুরই। পাথর যেন ডেলা, তার রক্তশূন্য মড়ার মুখ। তাকালাম ঘুরে, দরজায় দাঁড়িয়ে রাইসনার। সেই হাসি ঠোঁটে, অনেক বড় দেখাচ্ছে হাতের ৪৫ অটোমেটিক পিস্তলটা।

নড়াচড়া চলবে না কোনোরকম। রাইসারের সংযত গলা, পিস্তলটা বাড়িয়ে দিলো একটা আরাম কেদারার দিকে।

বসো ফারার, মিসেস ওয়ার্দাম তুমিও ওই ডিভানটায়। ডেলা হাত ছেড়ে দিলো। মেয়েটা হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ভয় হলো।

আসলাম আমি। কেমন একটা অস্বস্তি গলায়, কেশকষ্টহচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে। রাইসনার দরজাটা বন্ধ করে দিলো পা দিয়ে ঠেলে, এগিয়ে এলো কয়েক পা ঘরের মধ্যে। বেশ জমেছে দেখছি লীলা–তোমরা জানো বটে মজা করতে!

বুঝলাম খালি দেখে কেবিনটা। রাইসনার ঘুরলো আমার দিকে, আগুন ভয় হিংস্র চোখে, কি। করেছে ওয়ার্দামকে? নিরুত্তর আমরা। রাইসনার একটা চেয়ার টেনে বসলো কনুই দিয়ে। মারা। গেছে কিও, না দিয়েছে শেষ করে? ডেলার অবস্থা হলো দাঁতকপাটি লাগার, মাথা খারাপ হয়েছে। কি তোমার? এখন প্যারিসের পথে ও তো। বলল, নরকের।

এবার শব্দ হলো হাসির, কাঁচা কাজ করে ফেললে এরকম একটা। সন্দেহ হয়েছিলো মহাপ্রভুর প্রথম দর্শনেই কারণ লস এঞ্জেলস থেকে লিফনবীচে এতটা রাস্তা আসতে দিতে না পল, পেছনে লোকনা লাগিয়ে–পল এটা আমার চেয়ে বেশী জানেতুমি যে মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ পালটাও নাকি জানতো–কি বলবো?

ক্ষেপে উঠলো ডেলা, তুমি কোত্থেকে পেলে এভাবে কথা বলার স্পর্ধা আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলো রাইসনার ওকে, তোমরা গাড়িতে তিনজন ছিলে, তোমাদের মধ্যে একজন মরেছে রাইসনার বসলো পা মুড়ে। রিককা নয় এ লোকটা, ফারার তাহলে! ওয়ার্দাম মরেছে। কি বলল, ভেস্তে গেলো সব তাহলে? মুঠো হয়ে গেলো হাঁটুর মধ্যে

ডেলার হাত দুটো, নিক একটা বুদ্ধি করি এসো আমরা এই তিনজন। আমরা ছাড়া কেউ জানে না পল যে মরেছে। অর্ধেক ভাগ দাও আমাদের দুজনকে। আমরা লেগে যাচ্ছি কাজে। আমার নখদর্পণে পলের অনেক ব্যাপারই তো। আশাকরি আমরা সাহায্য করতে পারবোফ্যাসিনোর কাজে। রাইসার একবার দেখেনিলো আমার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে! আসছে কি করে এ লোকটা এর মধ্যে? ভাবতে যাবো কেন এরজন্য!

স্থির হাসি ঠোঁটে, পল ছিটকে বাইরে পড়ে যায় আমাদের গাড়িটা সংঘর্ষে পড়ার পর, ভেঙে যায় তার ঘাড়–তোমাদের গল্প ওটা তো। হাসছে রাইসনারও। ধরো ওকে খুন করেছে তোমরা দুজনে আমি ভাবছি? যদি চালান দেবার ব্যবস্থা করি খুনের দায়ে দুজনকেই?

হেম শালা তো তোমাদের ঝুলিয়ে দেবে দুটো বড় পাত্তি পেলেই–ইদানীং টাকার দরকার হয়ে পড়েছে বেশী ওর আবার। বরফ মেরে গেলাম আমি। শুধু কানে এলো ডেলার কথা, কিন্তু তাতে তো চাপা থাকবে না ওর মরার খবরটা। তা বটে করা যাবে আর কি। আচ্ছা, শোনো আমি চিন্তা করছি কি ভাবে ব্যাপারটা। তোমাদের কথা শুনলাম আমি আড়ি পেতে। জানলাম মেরেছে পলকে তোমরা। ফারার বন্দুক তুললোআমি ঢুকতেই। আমি গুলি করে দিলাম তার আগেই। নিভে গেলো রাইসারের হাসি, হেম জানে আমি কত দ্রুত সারতে পারি এসব ব্যাপার। বন্দুক তুললে তুমিও, আর পড়লে একই অবস্থায় প্রস্তাব দিলাম হেমকে একটা মোটা ভাগ ক্যাসিনোর।

জো আর ইট্টাকে থানায় আটকে রাখবে একটা অজুহাতে সমস্ত ব্যাপারটা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত। তার পর কাম ফতে মালের সাগর সাঁতরে উঠে আমার আগেই রিককা সাহেব। কি রকম?

ঢোকাচ্ছো কেন হেমকে এর মধ্যে? হাঁড়ি চড়িয়ে বসে থাকবে ওতো, সব সময়–ঝুঁকে বসলো রাইসনার চিন্তার ছায়া চোখে।

তাই হয়তো, কিন্তু বেরোবার একটাই রাস্তা এই ছেঁড়াঝাট থেকে। রাস্তা আছে আর একটা, ছন্দোবদ্ধ ডেলার গলা। কি? ডেলা ফিরলো আমার দিকে রাইসনারের দিকে তারপর–আদিম প্রবৃত্তি তার চোখে।

মেরে ফেললাম আমরা তোমাকে, নিরাপদ পন্থা সেটাই সবচেয়ে। আমাদের সেই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিলো তুমি ঢোকার আগেই। রাইসনারের ঠোঁটে ম্লান হাসি ফুটলো। অতলাক্তশীতল চোখ দুটো। হুঁ, শুনছিলাম, সেই জন্যেই তো ভালো মনে হচ্ছে আমার পরিকল্পনাটা। কিন্তু নিশ্চয়ই সেফটি ক্যাচ লাগানো অবস্থায় নয় বন্দুকে। কাজ হলো ওর কথায় এমন কি আমিও রাইসনারের সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে আনলাম। ডেলা রাইসনারের মুখ লক্ষ্য করে নিপুণ হাতে দ্রুত ছুঁড়ে মারলো পাশ বালিশটা। আর নিজেই রাইসনারের বন্দুক শুদ্ধ হাত চেপে ধরলো লাফিয়ে উঠে। বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল না বেরোয় গুলি। রাইসনারের হাতটা নেমে আসার আগেই আমি সপাটে ঘুষি চালালাম রাইসনারের চোয়ালে। নেমে গেলো ওর হাত। রাইসনার সরে গেলো দু পা ছিটকে। শক্ত করে ধরে আছে ডেলার হাত। আর একটা জমালাম দেওয়ালে মুখ থুবড়ে পড়ার মুহূর্তে। পড়ে গেলো রাইসনার।

জগ হয়ে গেলো চুরমার। গেলো টেবিলটাও। মেঝের কাপেট ভরে গেলো ফুলে আর জলে। জলে ভরে গেলো ডেলার মুখ চোখ। ওর গলা থেকে উঠলো একটা মৃদু আর্তনাদ কিন্তু হাতছাড়া করেনি বন্দুক। থরথর করেকাঁপছে। পাশাপাশিদাঁড়িয়ে আমরা, পড়ে আছে রাইসনার। কড়িকাঠের দিকে তার চোখদুটো–ওর ডান চোখটার ভিতর ঢুকে গেছে জগ থেকে কাঁচের একটা টুকরো।

ফাঁক হয়ে গেছে ঠোঁট দুটো, খিঁচিয়ে আছেদাত। চোখেমুখে যুগপৎ স্বাক্ষর ভয় আর যন্ত্রণার। ঘুষির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ডান গালটা। রাইসনারের একটা ভয়ঙ্কর চেহারা। ডেলা কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো আমার, কানে আওয়াজ পাচ্ছি ওর দ্রুত নিঃশ্বাসের।

দুজনেই অনড় আমরা, দেখছি রাইসনারকে। প্রাণ নেই ওর দেহে। যেন চলচ্চিত্র–প্রক্ষেপক যন্ত্র চলছে মাথার ভেতর মনের পটে অতীতের প্রতিবিম্ব।

উঠে দাঁড়ালো ডেলা রক্তের ছোপহাতে। আমি হতভম্ব সেদিকে তাকিয়ে। জনি, আমার চোখে ডেলা তাকালো; আমি খুন করেছি ওকে।

থাকো ঠিক জনি। কানে এলো ডেলার তীক্ষ্ণকণ্ঠ, কেউ জানে না আমি আর তুমি ছাড়া এই ব্যাপারটা। চেয়েছিলাম এই তো। মনে পড়লো রাইসনারেরকথা, সেও একই কথা বলছিলোপলের মৃত্যুতে। যা হোক ভালো জুটি। কি সব প্রার্থনা। কিন্তু পালাতে হবে তার আগে। ডেলা এক পা এগিয়ে এলো আমার দিকে, কথা বোলোনা হাঁদার মতো। এই চেয়ে ছিলাম আমরা তো সার্থকতা ছুঁয়েছে আমার পরিকল্পনা। নেই রাইসনার, ক্যাসিনোর মালিক আমরাই। বাধা দেবার আর কেউ নেই। বিজয়ের এক আশ্চর্য প্রতিচ্ছবি ডেলার

কালো চোখে। আহ্বান কামোন্নত ঠোঁটে। শুধুই জয়ের আনন্দ, চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। একটা চাপা উত্তেজনা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিলাম ওর হাত ধরে, তুমি তো হাদা! মেরে ফেলেছি আমরা ওকে।

তাড়া করে ফিররে ওরা তো আমাদের। আমাদের রেহাই নেই এর থেকে। ওরা লাশ পাবে রাইসনারের। ডেলা হাত চাপা দিলো আমার মুখে জনি প্লিজবসো চেঁচিয়োনা তো। ঠিক হয়ে যাবে সব–রাখো একটু সাহস। আমি সব সামলে নেব...রাইসনারের লাশটা পেছন করে বসে পড়লাম। মানলাম, ঠিক আছে ঠিক হয়ে যাবে সব–কিন্তু মেরে ফেললাম লোকটাকে তো, কি করবে তার? তাকাও ওর মুখের দিকে, কি করতে হবে বুঝবে। আমি পারছি না তাকাতে, বললাম ডেলার দিকেই চোখ রেখে।

খুলে বলতে কি বলছে আর পারবো না তোমাকে নিয়ে। আচ্ছা, অনুভূতি নেই কি তোমার কোনোরকম, পারছে কি করে ওর দিকে তাকাতে? ডেলা আমার কাছে সরে এলো ডিভানের পাশ দিয়ে, হয়তো মনের জোর বেশী বলেই তোমার চেয়ে আমার। কেন?

তোমার কাছে কাজটা কি অন্যায় মনে হচ্ছে? দ্যাখো ভেবে, মারতে যাচ্ছিলোও তো আমাদের। তুমি শুধু ওকে মেরেছে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে তাও নিশ্চয় খুনের উদ্দেশ্যে নয়। থাকে কি সহানুভূতি ওর জন্য? নির্ভেজাল খুন এটা। অহর্নিশি তাড়িয়ে ফিরবে আমার মন, বিষময় করে তুলবে আমার হতভাগ্য জীবনটাকে। যেতে দাও সাতটা দিন ঠিক হয়ে যাবে সব। ভুলে যাবে সব। কিন্তু যদি সামলাতে না পারে নিজেকে, আর সাহায্য না করো যদি আমাকে। তাহলে ঝুলতে হবে ফাঁসিকাঠে দুজনকেই।

ভীতুর ডিম কোথাকার, ভাবছো না কেন একবারও এটা। ফিরে তাকালাম রাইসনারের মুখের দিকে। বীভৎস! ডেলা কাঁচের টুকরোটা বের করে নিলো রাইসনারের মুখের ওপর ঝুঁকে। হতবাক আমি আমার ঘটনাবহুল জীবনে দেখিনি এরকম ভয়ানক দৃশ্য। ঘাম ঝরলো আমার শরীর বেয়ে, বরফ যেন। ডেলা বসে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে টুকরোটা হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ফাঁকে। ডেলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সেটার দিকে কুঁচকে।

তারপর রাইসনারের ক্ষতবিক্ষত মুখের দিকে তাকালো। এরকম চেহারা হওয়া সম্ভব জন্তু জানোয়ারের টানা হেঁচড়ায়। আর সকলকে বোঝাতে হবে তাই। আমার দিকে তাকালো ডেলা চোখ তুলে। খুঁজছিলেন পালাবার রাস্তা পেয়ে গেলে এই তো–ফেলে দিয়ে এসো এক সিংহের মুখে, হিসেব সোজা।

খাওয়ার তদ্বির করতে জানোয়ারগুলোর রাইসনার যেতো খাঁচারকাছে। হতেই পারে দুর্ঘটনা। সবাই জানে এটা। জানে হেমও। এটা ধোপে টিকে যাবেআমরা ভুলের বোঝানা বাড়ালে। থামলো ডেলা। আমি কিন্তু একদৃষ্টে তাকিয়ে ওর দিকে। পরে বললাম অনেক, তোমার মাথা থেকে বেরোলো এটাও কি এখন? হ্যাঁ, তাকাও ওর মুখের দিকে, মনে হবে তোমারও তাই। মাকড়সার পায়ের অনুভূতি হলো আমার শিরা বেয়ে আবার। সৃষ্টি করতে পারব ডেলা। ওর মাথা খোলে যে কোনো অবস্থায়। ঠাণ্ডা মেরে যাওয়ার আগেই ওয়ার্দামের শরীর, ওর মাথায় খেলেছেক্যাসিনো দখলের ভাবনা, আর এখনো শুকোয়নি রাইসনারের মুখের রক্ত, বের করে ফেলেছে ও তার অপঘাত মৃত্যুর ব্যাখ্যা নির্ভুল চালই

হবে সবার অলক্ষ্যে গুহায় ফেলে আসতে পারলে ওর লাশটা। জনি আছে তো সব ঠিক? ও তুলে ধরলো কালোচোখ রক্তের দাগ ওর আঙুলে। ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দরী পিশাচিনি।

ঠিক আছে কেউ না দেখে ফেললে–এতক্ষণে নিতে পারছি স্বস্তির নিঃশ্বাস। থেমে গেছে বুকে হাতুড়ির ঘা। কিন্তু কিছুই করা যাবে না অন্ধকার না নামলে। না, আচ্ছা, একবার দাঁড়াও তো উঠে। দাঁড়ালাম দেখি হাত দুটোখুটিয়ে দেখলো ডেলা। কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই আমার শরীরে।

ঠিক আছে শোনো–বেরিয়ে পড় বাইরে ঘোরাফেরা করো সকলের সামনে। খেলে নিতে পারো একটু গলফ–ও, আরো ভালো হয় কাউকে খেলার সঙ্গী করতে পারলে। ফিরবে না মাঝরাতের আগে। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে রাইসনারের কথা সে আছে আমার সঙ্গে তা বোলো। বসেছে কাজে চলবেনা তাকে বিরক্ত করা, বেরিয়ে পড়। গল কেউ খেলতে পারে এরকম মনের অবস্থায়?

বলো তো তোমার কি হয়েছে? কিছুই ভাবতে পারছে না স্বাভাবিক ভাবে?

তোমারই হয়েছে কিছু, যদি হয়ে থাকে তো সাঁতার কাটো, গলফ যদি খেলতে না পারো তো, বেড়াও ঘুরেফিরে। যেতে পারো বারেও করো যা খুশি। এখান থেকে বেরোও মোদ্দা কথা। দর্শন দাও ওদের। একটু ভাবলো ডেলা, ঘেঁষতে দেবেনা এখানে কাউকে। জেনো এটা তোমারই কাজ। তো এতক্ষণ কি করবে তুমি? বললাম লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে। ডেলার ঠোঁটে সেই ভয়াবহ হাসি খেলে গেলো, কোথায় যাবো আমি আর–ওর কাছে এখানেই থাকবো। বসে পাহারা দেবো।

এই ন ঘন্টা ধরে! মরে যাবো না তাতে তো আর। আর ভাবতে হবে তো ভবিষ্যতের ভাবনা। আমার ভয় করবেনা ওর সঙ্গে একা থাকতে, গেছে তো মরেই। আমি তো বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি এই ভুতুড়ে পরিবেশ থেকে, ডেলার কাছ থেকেও। আমি এই লাশ আগলাতে পারবো না পৃথিবীর সমস্ত টাকার বিনিময়েও। এগোলাম দরজার দিকে। জনি–কি? ফিরলাম। রাইসনারের জুতো মোজা দেখতে পাচ্ছি চোখের কোণ দিয়ে। চোখ ফিরিয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি।

বিশ্বাস থাকা দরকার আমাদের পরস্পরের মধ্যে, জনি। মনে হচ্ছে ডেলাকে মর্মরমূর্তি। পালিয়ে যেয়ো না যেন ভয় পেয়ে। একা সামলাতে পারবো না আমি তুমি পালিয়ে গেলে। আমার দরকার তোমাকে। না, যাবো না। কোনো রকমে বললাম বিকৃত গলায়। বিশ্বাস করতে পারলোনা কথাটা ডেলা বোধহয়, অনেক সময় ন ঘন্টা, কাজেই সামলানো কঠিন পালানোর প্রলোভন। শোনো, সেক্ষেত্রে হেমকে খবর পাঠোবো সঙ্গে সঙ্গে আমি কিন্তু জানিয়ে দেবো রাইসনারকে তুমি খুন করেছে। হেম বিশ্বাস করবে আমার কথা। পালাবো না বললাম তো। ডেলা উঠে আমার দিকে এগিয়ে এল।

আমাকে আদর করলো তার পুরনো কায়দায়। আজ আর আমার রোমাঞ্চ হচ্ছেনা ওর স্পর্শে। ভয় হচ্ছে কেমন।

আমাকে ভালোবাসতো তুমি এখনোনা, জনি? বাকি জীবনটা এই কাজটা মিটে গেলেই আমাদের জীবন নিশ্চিন্ত নিরবচ্ছিন্ন। আমার শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছে সব কিছু ছাপিয়ে আমার গলায় একটা রক্ত রাঙা হাতের স্পর্শ। পারলাম না, ওর হাতটা চাইলাম সরিয়ে দিতে। ডেলা বিপদজনক সাপের মত। দিলাম ঠোঁটে ঠোঁট–আজ অস্বস্তিকর মনে

হচ্ছে ওর উষ্ণ ঠোঁটের আত্মসমর্পণ। অস্বস্তিটুকু বাড়ালো একটা মৃতদেহের উপস্থিতি। থাকবো তোমার অপেক্ষায় আমি, আমার ঠোঁটে চেপে আছে ডেলার ভারী ঠোঁট।

শিহরণ তুলেছে আমার গালে ওর তপ্ত নিঃশ্বাস। জনি সাহস রাখো মনে ঠিক হয়ে যাবে সব। বেরিয়ে এলাম বাইরে। ক্ষিপ্ত লিঙ্ক বীচ; প্রচণ্ড গ্রীষ্ম–অপরাহ্নে। একক নরক যন্ত্রণা সামনে ঝাড়া নটি ঘণ্টা উন্মত্ত আগ্রহ মনে একটাযতদুর দু চোখ যায় ছুটে চলে যাই...ছুটে চলবো শুধু। ডেলা যে কুটির আগলে বসে আছে রাইসনারের লাশ। অনেক সেখান থেকে অনেক দূরে...দুস্তর ব্যবধান থোক কিন্তু জানি আমি...পারবনা পালাতে পাতা আছে ফাঁদ...আমার মুক্তি নেই এ থেকে।

ঘরে ঢুকে গলা পেলাম বেয়ারার না, মিস বারে নেই উনি–ওকে দেখিনি লাঞ্চের পর। হ্যাঁ, একটার সময়, না, দেখিনি–তারপর...। সিগারেট পিষে দিলাম ছাইদানে। দপদপ করছে কানের পাশে শিরাগুলো।

হ্যাঁ, নিশ্চয়–বলবো দেখা হলে। বেয়ারা ছেড়ে দিলো টেলিফোন। শুরু হয়ে গেছে রাইসনারের খোঁজ। এখুনি করা দরকার একটা কিছু–ডেলার নির্দেশ লোকজন তফাতে রাখতে হবে কুটির থেকে। শুরু হলো খোঁজাখুজি..অ্যাই শোনোহাঁক দিলাম বেয়ারাটাকে। স্যার, টেকো দাঁড়ালো পর্দা ঠেলে। ফোন করেছিলো কে?

রাইসনার সাহেবের সেক্রেটারি মিস ডোয়েরিং। ওকে ডাকছিলেন জরুরী ব্যাপারে। লোকটা হাতদিলেটাকে। স্যার, জানেননাকি উনি কোথায়? জানি আমার মানসপটে ভাসছে একটা ছবিই। ওর নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা মানুষ চিৎ হয়ে পড়ে থাকা,

মুখ ক্ষতবিক্ষত ঢুকে গেছে একটা কাঁচের টুকরো ডানচোখে। থেমে গেলাম গ্লাসে পানীয় ঢালতে গিয়ে। ঢালতে সাহস হচ্ছে না এ ব্যাটার সামনে। কেঁপে উঠতে পারে হাত। যান্ত্রিক গলায় বললাম ওর দিকে না তাকিয়ে, রাইসনার একটা কাজে বসেছেমিসেস ওয়ার্দামের সঙ্গে না করাই ভাল এখন বিরক্ত। আমার কথা বলার ভঙ্গিতে লোকটা পাথর হয়ে গেলো। কথাটা ওঁকে ডেকে বলে দাও।

মিসেস ডোয়েরিং না কে, স্যার বলছি। দাওয়াই বেশী পড়ে গেছে ওর গলার স্বরে বুঝলাম। সে অদৃশ্য হয়ে গেলো মুহূর্তে আবার বোতল ওল্টালো গ্লাস ভরতে গিয়ে মিঃ রিককা বারে আছেন ওর কথা কানে আসছে। বলছেন উনি রাইসনার সাহেব নাকি কি একটা জরুরী ব্যাপারে কথা বলছেন মিসেস ওয়ার্দামের সঙ্গে। এখন চলবে না বিরক্ত করা। হ্যাঁ ম্যাডাম অ্যাঁ? বললেন কতটা জরুরী জানার দরকার নেই।

আজ্ঞে, ঘাম মুছলাম রুমাল বের করে–থাক হলো তো কিছু কাজ। বাড়াবাড়ি–হলো একটু, তাহলেও এদিকে তো শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে স্কচের কাজ। পেকে এসেছে নেশাও। বোতলে ছিপি এটে দিলাম অনিচ্ছায়। ডেলার নির্দেশ দাঁড়াতে হবে জনতার মাঝে গিয়ে। বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম বাইরের খোলা জায়গায়। কমেছে রোদ। রয়েছে গাড়িটাও, গাড়ি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম শুধু দরজা খুলে স্টিয়ারিংয়ে বসে।

নেমে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে, অজানা গন্তব্য...কিন্তু চলবে না পালানো। থমকে দাঁড়ালাম একটা বিরাট আওয়াজে। মাটি কাঁপানো, গভীর কণ্ঠনিসৃত নিনাদ, গর্জন সিংহের–পাতলাম কান...চিড়িয়াখানার পথে পা বাড়িয়েছি কখন যে জানিনা–আমাকে পেয়ে বসলো একটা বিদঘুঁটে ভাবনা ভেসে উঠলো একটা ছবি বয়ে নিয়ে চলেছি সিংহের গুহায়

রাইসনারের ক্ষতবিক্ষত দেহটা। শুরু হল কাপুনি–তাকালাম পেছন ফিরে গাড়ির খোলতাই বেড়েছে সূর্যের আলোয়। তাহলে কেন আর দেরি, দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেরিয়ে পড়তে হবে এখান থেকে...সাত ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট সময় এখনও আমার হাতে পাড়ি দিতে পারি চারশো মাইল পথ এই সময় আমি অনায়াসে...আমাকে ওরা খুঁজুক–আমার স্নায়ুগুলোকে নিস্পৃহকরে দিয়েছেসিংহের গর্জন...গভীর রাতে আঁতকে উঠলাম একটা ভয়াবহ দৃশ্যের কথা স্মরণ করে।

ফিরে চললাম গাড়ির দিকে। স্টার্টারে হাত দিলাম দরজা খুলে স্টিয়ারিংয়ে বসে। তাকালাম বাইরে না নেই কোনো প্রতিক্রিয়া। কেউ দাঁড়ালো না পথরোধ করে। বুইক এগিয়ে চললো মসৃণ গতিতে...বাড়ছে গতি–সদর রাস্তায় পৌঁছে যাবো মিনিটখানেকের মধ্যেই মুক্তি তারপর...দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেলাম গেটটার দিকে। যথারীতি মোতায়েন কোমরে হাত রেখে পাহারাদার দুজন। হর্ন–এ হাত দিলাম গাড়ির গতি কমিয়ে। নির্বিকার পাহারাদার দুটো।

বন্ধই রইলো গেটের পাল্লা। থামিয়ে দিলাম গাড়ি, কি ব্যাপার? গাড়ি চালিয়ে বেরোতে হবে নাকি বন্ধ গেটের ভেতর দিয়ে? মনেই হলো না নিজের গলা বলে, কর্কশ, কটুকণ্ঠ আমার। ধীর পায়ে এগিয়ে এলো ওদের একজন, চোখদুটো সামান্য কুঁচকে বললো, মিঃ রিককা দুঃখিত, একটা নির্দেশ আছে আপনার সম্পর্কে।

কি নির্দেশ?

হাত ঘামছে স্টিয়ারিং ধরে থাকলেও শক্ত হাতে। আপনাকে ফিরে যেতে বলার নির্দেশ পাঠিয়েছেন মিসেস ওয়াম। ওরা আপনার সঙ্গে কি কথা বলবেন মানে উনি আর মিঃ রাইসনার নাকি–ওর গায়ে একটা ঘুষি জমালে কাজ হয় লোকটা যেভাবে মুখ বাড়িয়ে বুকনি দিচ্ছে...কিন্তু জুটিটা ওর..সে শালা তোহাত রেখে দাঁড়িয়ে কোমরের বস্তুটিতে...রেডি ফর অ্যাকসন! শ শালী। বাগে পেলে তোকে একবার ঠিক আছে, চেষ্টা করলাম ঠোঁটে হাসি ফোঁটাবার, আমাদের কথা হয়ে গেছে তাড়া আছে খুলে দাও গেটটা। তীক্ষ্ণ হলো সবুজ চোখদুটো লোকটার, বোধহয় আরো কথা আছে, কারণ ফোনটা এলো এইমাত্র।

হু, দেখছি–আচ্ছা–গাড়ি ঘোড়ালাম পেছিয়ে নিয়ে মনে মনে একটা গাল দিয়ে। লোকদুটো আমাকে দেখতে লাগলো পলকহীন চোখে গাড়ি যোরানো পর্যন্ত। বেরিয়ে এলাম গাড়ি লাগিয়ে গাড়ি বারান্দায়। চলছে কাঁপুনি। ডেলা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। পারছি না আর ভাবতে।

ঘুরতে হবে উদ্দেশ্যহীন–হাঁটতে শুরু করলাম সৈকতের দিকে। একটা গাড়ি এসে থামলো পাশে খানিকটা এগোতে। কে যেন বলে উঠলো বামাকণ্ঠে।

উঠে–আসুন–চলেছি আপনার রাস্তায়, তাকালাম ফিরে। মেয়েটা সোনালী চুলের, চোখে চটুল চাহনি। স্বল্পবাস অঙ্গে, শরীরের রেখাগুলি আরও তীক্ষ্ণ সাঁতার পোষাকে। বিরাটাকার টুপি মাথায়, গোলাপের পাপড়ি গোঁজা কানে। এ নারীর সঙ্গ অবশ্য বর্জনীয় প্রকৃতিস্থ অবস্থায়–কিন্তু পাশে বসে পড়লাম এখন দরজা খুলে। গাড়ি এগিয়ে চললো সৈকতের কোণ ঘেঁষে। স্টিয়ারিংয়ে চলেছে তবলার বোল। গাড়ির রেডিওর সঙ্গে তাল

রেখে। লাস্যময়ীতাকালো আড়চোখে। নিয়েছি তোমাকে দেখেই, জানো তোমাদের, মানে আমার খুব পছন্দ পয়সাওলা মানুষদের। আর দারুণ তুমি তো। অচেনা বান্ধবী খিলখিলিয়ে উঠলো।

হুঁ, দেখছি আমারই দলের লোক। যাচ্ছে কোথায়? সাঁতারে? টোল পড়লো ওর গালে। হ্যাঁ, আপনি সাঁতার কাটো তুমি কি এই পোষাকেই? চোখ বুলিয়ে নিলাম ওর নিম্নাঙ্গে। কেন পছন্দ নয় তোমার? মেয়েটা বুকে আঙুল ঘষে নিলো স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে।

হলেই হলো তোমার–পকেট থেকে সিগারেট বের করলাম। মোহিনীউঠলো হি–হি করে। এমন কোথাও যাই চলে না, দরকারই হবে না সেখানে এগুলো–যাবে?

তোমার গাড়ি তো, আর তুমিই চালাচ্ছো। বেড়ে গেলো গাড়ির গতি। একটা জায়গা জানি আমি, যাবে সেখানে মেয়েটা বললো গলা নামিয়ে। দৃষ্টি মেলে দিলাম কাঁচের ভেতর দিয়ে।

চেয়ে ছিলাম কি আমি এই? কি জানিবোধহয় না। কিন্তু গেলাম তো ফেঁসে। জনি রিককা তুমিই তো, তাই না? ও গাড়ি ঢোকালো একটা সরু রাস্তায়। তালগাছের সারি দুপাশে। চেনো তুমি আমাকে?

হুম। তোমার কথা যে সবাই বলছে...তুমি নাকি লস এঞ্জেলসের জুয়োর রাজা। তুমি মস্তান কে যেন বললো–আমি, জানো পছন্দ করি খুব মস্তানদের। ও হেসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো স্টিয়ারিংয়ে। আচ্ছা, বলতে হয় তাহলে সুখবরই। তা, পেতে পারি কি তোমার পরিচয়টা?

জর্জিয়া হ্যারিস ব্রাউন আমি। আমাকে জানে সবাই। চেনে সকলে আমার বাবাকেও ইস্পাত সম্রাট গলওয়ে হ্যারিস ব্রাউন। মস্তানদের ভক্ত উনিও কি?

ওরদিকে তাকালাম আড়চোখে। আবার উঠলো হি হি করে। গাড়ি নেমে গেলো রাস্তা থেকে পাশের ঘাস জমিতে। পরিবেশ নির্জন ঝোঁপের, এখানেও তালের সারি। বেশ সুন্দর, না? জর্জিয়া পেছনের আসনে ছুঁড়ে দিলো টুপিটা খুলে। পা বাড়ালো বালিয়াড়ির দিকে, যাবো সাঁতারে, সঙ্গে আসবে নাকি?

আমার খেয়াল হোল গাড়ি থেকে নেমে–গড়াতে দেওয়া যায় না এটা আর বেশিদূর। থাকার কথা নয় তো এখানে আমার। থাকার কথা আমার জনারণ্যে।

এখানে মরতে এলাম কেন ওর সঙ্গে! না হয় পালাবার রাস্তা বন্ধ ক্যাসিনো থেকে। আবার শুরু করলাম গলা ছেড়ে দিয়ে, মনে হচ্ছে রাস্তা গুলিয়ে ফেলেছি, দরকার ছিলো ক্যাসিনোতে ফেরার।

রাস্তায় একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হলে।

ও, সোজা রাস্তা ওটা তো। গরান ঝোঁপের মধ্যে দিয়ে এসেছেন আপনি। বোধহয়?

হ্যাঁ, এগিয়ে গেলাম একটু। এবার চোখের ওপর স্পষ্ট ওর ছবির ফ্রেমটা–নির্মেঘ আকাশ ফুটে উঠেছে তুলির টানে...তালের সারি...বালুকা রাশি। বাঃ দারুন বাস্তব। ছবিটা বেশ হয়েছে তো–সৈকত–সুন্দরীর কাছে কৌতুকের মনে হলো কেন আমার কথাগুলো। ও

হাসলো মিষ্টি করে, হওয়ার কথা তাই তো–হা, কিন্তু তা ফোঁটাতে পারেনা তো সবাই। সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম পকেটে হাত দিয়ে। ওর দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে দিলাম। ধন্যবাদ, ধূমপান আমি করি না। জ্বালালাম আমারটা, বলতে পারেন আমি কতটা দূরে চলে এসেছি ক্যাসিনো থেকে?

মাইল তিনেক। আর আপনি তো চলে ছিলেন উল্টোদিকে মেয়েটা বুরুশটা ঘষে নিলো একটুকরা কাপড়ে। বলছেন ছেড়ে এসেছি ক্যাসিনোর সৈকত?

হ্যাঁ, এসে পড়েছেন আমার এলাকায়। ওর মিষ্টি হাসি মুখে নেই। ক্ষমা করবেন, ইচ্ছাকৃত নয় অনধিকার প্রবেশের ব্যাপারটা। বলিনি আমি তা। মেয়েটা হাসলো আবার, আপনি আছেন বুঝি ক্যাসিনোতে? জোগালো না মুখে তাৎক্ষণিক উত্তর, ওকে জানাতে চাই না আমি জুয়াড়ী জনি রিককা। ক্ষতি নেই জর্জিয়া জেনেছে, কারণ এর তুলনা হয় না ওর সঙ্গে। আর কি দিন কয়েক আছি। কেশ জায়গাটা না? পাল্টালাম প্রসঙ্গ।

এদিকেই থাকেন আপনি কি?

হ্যাঁ, আমার ডেরা কাছেই, মালমসলা জোগার করছি প্রদর্শনীর জন্য আর কি। কি সেটা? বসে পড়লাম বালির ওপর, দূরত্ব রেখে ওর থেকে। ওর দিকে তাকালাম–পছন্দ হয়েছে কিনা যাচাইয়ের জন্য আমার ব্যাপারটা। অপরিবর্তিত ওর মুখভাব। একটা কোম্পানী মিয়ামির–ফেসটান। বড় কোম্পানী। শুনেছেন হয়তো নাম। স্কেচ এঁকে দেওয়া হোল আমার কাজ, সাহায্য করাও কিছু রংয়ের পরিকল্পনায় শোভা বর্ধনের জন্য শো–কেসের। বলছেন মনের মতো কাজটা? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই–মুখটাওর উজ্জ্বল হলো। গত বছর

গিয়েছিলাম পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। ছবি আঁকার ব্যাপার ছিলো কয়েকটা। পশ্চিম ভারতীয় গ্রামে রূপান্তরিত করা হলো আমাদের দোকানের একটা বিভাগকেই প্রদর্শনীটা দারুন হয়েছিলো। মনে হচ্ছে ভালোই তো কাজটা–আচ্ছা, আজ থাক–আপনাকে বিরক্ত করলাম।

না, না, মাথা নাড়লো ও। কাজ তত শেষ আমার। ও তুলে ফেলতে লাগলো বুরুশগুলো বসেছি সেই সকাল দশটায়, পেয়েছে খিদে।

বলুন দেরিই হলো একটু। সুন্দরী হাসলো। আবার সময় অসময় একা মানুষের। ও দেখতে লাগলো ছবিটা খুঁটিয়ে, ওকে দেখছি আমি কিন্তু। ওর বড় ভালো লাগছে। এই থাক আপাততঃ মেয়েটা আমার দিকে ফিরলো ছবি থেকে চোখ সরিয়ে, মিঃ রিককা সৈকত ধরে হাঁটা আপনার ফিরে যাবার সহজতম রাস্তা। উঠে দাঁড়ালাম জনি ফারার। পৌঁছে দিয়ে যাই না আপনার জিনিষগুলো।

জিনিষ তো অনেকগুলো। মনে হচ্ছে নিজে থেকেই নিচ্ছেন দ্বিপ্রহরিক নিমন্ত্রণটা, আবার গালে টোল পড়লো ভার্জিনিয়া ল্যাভেরিক, আমার নাম, যদি কিছু কাজ না থাকে আপনার হাতে –না, কাজ নেই আমার কোনো বোধ করছি বড় নিঃসঙ্গ, আর ভালও লাগছে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হাতে তুলে নিলাম বুরুশের বাক্স হাঁটতে লাগলাম ভার্জিনিয়ার সঙ্গে।

ও হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো খানিক দূরে এগিয়ে, কিন্তু আপনাকে তোবসতে হবেকুটিরের বাইরে। আমি জানেন তো, একা। ও ঠিক আছে, এই আমার আনন্দ ওর পাশে হাঁটছি।

নিষ্কলুষ নয় আমার চরিত্র, তবে আমি ভীতিজনক মানুষ নই– হেসে হালকা করতে চাইলাম ব্যাপারটা। ভার্জিনিয়া হাসলো ঝকঝকে দাঁতে, বিত্তবানরা ও দোষে দুষ্ট প্রায় সবাই। দাঁড়ালাম বাংলোর সামনে। ফুলের সমারোহ চারপাশে, হালকা সবুজ রং করা ছাদটা কয়েকটা চেয়ার পাতা বাইরেইতস্তত, বেতারযন্ত্রও রয়েছে এক কোণে। ছড়িয়ে বসুন হাত পাব্যবস্থা করি পানীয়ের, খাবেন কি–স্কচ? ফাইন। আমার ইচ্ছে করলো হাতছানি দিতে।

এক মিনিট–ভার্জিনিয়া অদৃশ্য হয়ে গেলো পর্দার আড়ালে। অনেকক্ষণই নিলো সময় অবশ্য। আমি পায়চারি করে চললাম বারান্দায়, আবার শুরু হয়েছে কাপুনিটা। এলো ভার্জিনিয়া, দেরি হওয়ার কারণ বুঝলাম ওর দিকে তাকিয়ে বদল করেছে পোক। সাদা লিনেনের স্কার্ট এখন ওর গায়ে। টেবিলে নামিয়ে দিলো হাতের ট্রে।

স্যান্ডউইচের থালাও রয়েছে পানীয়ের সঙ্গে, নিন করে দিন শুরু–নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে আপনারও– গ্লাসে ঢেলে দিলাম অনেকখানি স্কচ, ফেলে দিলাম কটা বরফের টুকরোও। ভার্জিনিয়া নরম আঙুলে একটা স্যান্টউইচ তুলে নিয়ে আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিলো। মারামারি করেছেন নাকি আপনি? চমকে উঠলাম। বললাম, সামলে নিয়ে, ইয়ে আর কি তর্কাতর্কি করার ফল একজনের সঙ্গে হাত বোলালাম নাকে।

ঠিক তত কিছুনা যতটা খারাপ মনে হচ্ছে, না কি বলেন? ভার্জিনিয়া চুমুক দিলো লেবুর রসে, অস্বস্তিকর ছায়া ওর চোখে, বলে বসলাম কি বলবো ঠিক করতে না পেরে, কৃতজ্ঞ থেকে গেলাম আপনার সহানুভূতির জন্য। একা লাগছিলো বড়

শুনেছি, অনেক আকর্ষণ ক্যাসিনোতে–

হয়তো, কিন্তু আমার পছন্দ নয় ওদের তেমন।

টোল পড়লে গালে, শুনি পছন্দটা আপনার আমার কোনোকালেই নেই মজা করার অভ্যাস। আমি সোজা কথার মানুষ, এই কেউ আপনার মত। দেখবেন পাড়া মাৎকরবেন না যেন আবার চেঁচিয়ে। জানতে চাইলেন আপনি, দিলাম জানিয়ে। সেইদলেরনই আমি কিন্তু স্থির চোখে তাকালো ভার্জিনিয়া, আপনাকে নিশ্চয়ই নিয়ে আসতাম না এখানে সেই দলের ভাবলে– পরিবেশ মেঘমুক্ত হলো। ভার্জিনিয়া দিয়ে চললো তার কাজের ফিরিস্তি, কাজটাতে টাকা আছে ওর কথাতেও মনে হলো স্বাধীনতাও কিছু। ওর কাহিনী শুনতে ভালোই লাগছিলো। এখন স্বস্তি পাচ্ছি অনেকটা। কাজ হয়েছে স্কচে পানীয় পরিচর্যা করে চলেছে স্নায়ুর। ও বললো বেশ কিছু পরে, তখন থেকেই বলে চলেছিতো আমার কথাই। এবার শুনি আপনার কথা–আপনি কি করেন?

আশংকা করছিলাম এরকম কিছু একটার তাই মাথায় ছিলো উত্তরও। জীবন বীমা–আমি এক ক্ষুদে কর্মচারী পিটসবার্গ জেনারেল ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর। কাজটা ভালো লাগে?

মন্দ কি–এই আপনার মতোই কতকটা বেড়ানো যায়–তা, নিশ্চয়ই ভালোই পান টাকা, পয়সা–শুনেছি তো অনেক টাকার দরকার ক্যাসিনোতে থাকতে–অচিরাৎ পরিষ্কার করা উচিৎ রহস্য, প্রতিজ্ঞা ছিল আমার একটা, দিনদুয়েকের জন্য হলেও অন্ততঃ আজবো কোটিপতি। এইজন্য টাকা জমিয়েছি বছরের পর বছরযাক হলো তাও। পালাবো ভাবছি মঙ্গলবার নাগাদ। আপনার তাহলে ভালোই লাগে কোটিপতি হতে? ভাজিনিয়া শুধোলো

গালে হাত দিয়ে। হাসলাম, ভাবাই যায় না আর কিছু। ই, তাই মনে হয় আমারও। কিন্তু স্বপ্ন থাকলে কি হবে কোটিপতি হবার, চোখেই দেখিনি কোনদিন অতটাকা, দূরঅস্ত পাওয়া তো। আমার জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্য অনেক টাকা খরচ করতে পারবো। একটা পোষাক, মহড়া তারই, বলতে পারেন ক্যাসিনো বাস।

অনেক টাকা? ও তাকালো আগ্রহের দৃষ্টি মেলে। অনেক টাকা হা, ম্যাডাম

কিন্তু কোথায় পাচ্ছেন? থেমে গেলাম। মনে হলো বলে ফেলেছি অনেক কথা।

না-না। মাথায় নেই এখন কোনো পরিকল্পনাই, বলতে পারেন সবই দিবাস্বপ্ন।

বললাম হাল্কা গলায় একটু থেমে, হয়তো কেউ অনেক টাকা রেখে যাবে আমার জন্যে মরবার সময়।

ভার্জিনিয়ার কৌতূহল জমলে উজ্জ্বল চোখদুটোয়। মওকা খুঁজছিপ্রসঙ্গ পাল্টাবার ভার্জিনিয়ার মনে পড়লো এমন সময় বিঠোফেনের ফিফথ সিম্ফনির অনুষ্ঠান আছে রেডিওতে। ও চালিয়ে দিল রেডিওটা। শুনবেন পরিচালনা করছেন টসকানিনি, অনুষ্ঠান?

চলুক–কোনোদিন শুনিনি বিঠোফেনের সিম্ফনি, বিঠোফেন কেন, সিম্ফনি শুনিনিকারোর। বলতে গেলে এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু আমাকে এক অন্য জগতে নিয়ে গেলো রৌদ্রস্নাত অপরাহ্নিক নিস্তব্ধতায় সঙ্গীতের মূর্ছনা। কাজ নয় শেষ হলো। ভার্জিনিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো ঝুঁকে। লাগলো কেমন? অপূর্ব! সব উন্নাসিকদের জন্যেই সৃষ্ট আমার ধারণা ছিল– তার মানে ভালো লেগেছে বলুন আপনার?

কি জানি, একথা বলতে পারি আমার অন্তরে একটা সাড়া উঠেছে–জাদু জানে লোকটা। শুনবেন আরো? আছে নাকি আরো? আছে, আরো ভালো নাইনথটা আপনার মাথার চুল খাড়া হয়ে যাবে।

শুনতেই হয় তাহলে তো। বসলাম জমিয়ে।

তাহলে আমাকে একটু সাহায্য করুন। ভেতরে আসুন। ওর পেছনে ঢুকলাম একটা বড় লাউঞ্জে। ঠাসা ঘর বই আর জলরং ছবিতে। রেডিওগ্রাম একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালের গায়ে, রেকর্ড পাশের তাকে। বললাম, চারপাশে তাকিয়ে, আচ্ছা, আপনারই তো এ বাড়িটা?

হা। তবে এখানে থাকি না সব সময়। সেই সময়টা আমার এক লেখিকা বান্ধবী থাকে। সে নিউইয়র্কে এখন, এসে পড়বে কিছুদিনের মধ্যেই।

কোথায় যাবেন আপনি তখন?

কোথায় চীনে হয়তো। আমার অস্বস্তি হলো, কিন্তু আছেন তো এখন কিছুদিন?

হ্যাঁ, বড়জোর সপ্তাহ তিনেক। নিজেকে ছেড়ে দিলাম একটা আরাম কেদারায় সৈকতের দিকে মুখ করে। ভার্জিনিয়া দখল করলো একটা সেটি। মিললো ওর কথা। আমার চুলে শিহরণ উঠলো বাজনার আমেজে। ভার্জিনিয়া মেন্ডেলসন আর শুবার্ট শোনালো প্রয়োগ কৌশলের ফারাক বোঝাতে। চমকে উঠলাম দেয়াল ঘড়ির শব্দে। পড়লো সাতটা ঘন্টা।

পরে হিসেব করে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার পাঁচটা ঘণ্টা এখনো হাতে। ডিনারে কোথাও যাবেন নাকি?

দরকার নেই দামী কোথাও যাবার, আর ক্যাসিনোতে ফিরতে চাইনা পোষাক পাল্টানোনার জন্য। আবার বললাম, একটু ইতস্তত করে, নাকি দেওয়া আছে কাউকে তারিখ? তৈরী ছিলাম রূঢ় কিছু শোনার জন্য, কিন্তু হলো না সেরকম কিছু। জিজ্ঞেস করলো ভার্জিনিয়া, কখনো গেছেন রল–এ?

নাতো, সেটা কোথায়? আপনার অজানা থেকে গেছে অনেক কিছুই। রল—এ না গিয়ে থাকলে। হোটেলটা সৈকতেই, চলুন বেশ মজা হবে। রল–এ পৌঁছলাম ভার্জিনিয়ার লিঙ্কন কনভার্টিবলে চড়ে। ছোট রেস্তোরাঁ গ্রীক পরিচালিত, মাছের আধার দেয়ালে। বাহুল্য চারিদিকে গদি আঁটা চেয়ার আর আয়নার। আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে রল স্বয়ং উঠে এলো।

নিজেই আমাদের বানিয়ে দিলো মেনুবিনের স্যুপ পয়লা এলো, ক্রমে কাছিমের স্টিক, অ্যাসপ্যারাগাস সুপ, সবশেষে পেয়ারার মিষ্টান্ন। কথা বলে চলেছি খেতে খেতে।

ঘড়িতে সরব ঘোষণা হল আমার কথার মাঝেই, মনে মনে গুনে চললাম...যেন হাতুড়ি পিটিয়ে চললো বুকে একটা একটা ঘণ্টা...দশটা...এগারোটা...বারোটা।

৪. জরুরী কাজের কথা

জনি কি হলো? জিনি আমার দিকে তাকালো উৎকণ্ঠার চোখে। কিছু না। ফিরতে হবে আমাকে মনে পড়ে গেলো একটা জরুরী কাজের কথা। বলতে পারলাম না এর বেশী কিছু। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন আটটা ঘন্টা কেটে গেলো।

পৌঁছে দিই চলল তোমাকে লাগবেনা দশ মিনিটও। গাড়িতে চড়ে বসলাম স্বপ্নেখিতের মত। শুকিয়ে গেছে গলা, বুকে ঘা চলছে হাতুড়ির...বুঝলো জিনি–একটা গোলমাল হয়েছে কোথাও কোনো, কিন্তু প্রশ্ন করলো না কোন।

গাড়ি চালিয়ে গেল দ্রুত হাতে ক্যাসিনোর গেটে পৌঁছে দিলো সাত মিনিটেই–হ্যাঁ, সাত মিনিট পাকা, কারণ আমার চোখ এঁটে বসেছিলো, ঘড়িতে। বেরোলাম গাড়ি থেকে কাঁপছেহাঁটু। আবার বাস্তব রূপ নিলো রাইসনার ডেলা আর সিংহের গর্জন। রুমাল বোলালাম, ঘাম ভেজা মুখে।

জিনি ধন্যবাদ, কথাগুলো বললাম ভাঙাগলায় কোনোরকমে। বলতে চেয়েছি আরো কিছু। ঠিক করতে চেয়েছি একটা তারিখও, জানাতে চেয়েছি ও কতো সুন্দর, কিন্তু আমার গলা দিয়ে বেরোলো কোনো কথাই–জনি কি হয়েছে? বিপদ কিছু নয়তো কোনো? জিনি প্রশ্ন করল। উদ্বিগ্ন।

না, ঠিক আছে–দেখা হবে আবার। ফিরলাম, জিনি গাড়িতে বসে তেমনি ভয়াতুর দৃষ্টি মেলে।

পাহারাদার কাঁচ বসানো চোখে গেট খুলে দিলো গাড়িটা আর তার আরোহিনীকে ঠাণ্ডা চোখে মেপে নিয়ে। ক্যাসিনোর দিকে হেঁটে চললাম আলো ঝলমল রাস্তায়। নিঃশব্দ পায়ে ঢুকলাম কুটিরের দরজা ঠেলে। রেডিও চলছে পুরোদমে আলো জ্বলছে ঘরের সব কটাই। ডেলা শুয়ে ডিভানে।

সিগারেট টেনে চলেছে মাথার পেছনে হাত রেখে। ঘোরালাম চোখ। আরে কোথায় সে? নেই রাইসনারের দেহটাবুকে শুরু হলো হাতুড়ির পিটুনি। কোথায় ও? ওইখানে–ডেলা আঙুল বাড়ালোকলঘরের দিকে। তা এতক্ষণ ছিলে কোথায় তুমি? কাটাচ্ছিলাম সময়। এসেছিলো কেউ?

একটা কাজ দিয়েছিলাম তোমাকে তাই না? ডেলার চাপারাগের গলা। করেছি তো চেষ্টা ফোন এসেছেতিনবার। দরজা ধাক্কাতেও শুরু করেছিলোলুই হতভাগা তো বলা যায় কি এটাকে চেষ্টা? বারণ করেছিলাম তো ওদের বিরক্ত করতে।

রাস্তায় কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যদি–এখানেই থাকছি আমি, এখনো পর্যন্ত প্রমাণ দিতে পারোনি তুমি যে কাজের লোক। এগিয়ে পড় চাঁদবদন, ওকে খুন করেছে তুমিই তো? ঘরের সমস্ত আলোগুলো যেন নিভে গেলো চোখের ওপর থেকে।

আরে শোনো–এই ব্যাপারে তুমিও তো আছে। হাতিয়েছে ওর বন্দুকটা। ওকে যদি খুঁজতে থাকে ওরা– গেলাম থেমে। টোকা পড়লো দরজায়। বেশ জোরেই। মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম আমরা দুজনে। শব্দ হলো আবার, আছে নাকি মিসেস ওয়াদাম।

হেমের গলা অধৈর্য। আবার ভয় বাড়লো মনের গভীরে, গেছি পাথর হয়ে। ডিভান থেকে উঠে পড়লো ডেলা, বললো গলা তুলে, হেম সাহেব এক মিনিট কিন্তু ভয়ের ছায়া ওর চোখে, ফিসফিসিয়ে বললো কলঘরের দিকে হাত বাড়িয়ে, ঢুকে পড়, যেন সাড়া না পায় কোনো! অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম কলঘরের দরজা খুলে। হেমের গলা পেলাম কয়েক সেকেন্ড নীরবতার পর, মিসেস ওয়ার্দাম দুঃখিত বিরক্ত করার জন্য আপনাকে। বোধহয় শুনেছেন, পাওয়া যাচ্ছে না। রাইসনারকে।

ফেরেনি নাকি এখনোবসুন মিঃ হেমনা। ভারী বুটের আওয়াজ পেলাম কার্পেটে। খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন মিস ডোয়েরিং, ফোন করে ছিলেন আমাকে–একবার ঘুরেই যাই তাই ভাবলাম–কিন্তু আপনি কি মনেকরছেন কোনোকারণ আছে? মজা মারার আমেজ ডেলার গলায়। বসে আছে বে স্ট্রীটে গিয়ে দেখুন হয়তো। জানতে পারলাম বেরোয়নি ক্যাসিনোর এলাকা থেকে। মনে হলো না ডেলা কানে নিলো বলে ওর কথা। খাবেন একটু কিছু? বুকে ঝড় আমি দাঁড়িয়ে আছি দরজায় কান লাগিয়ে।

না, ধন্যবাদ ডিউটিতে আছি এখন তো, কাজেই–অফিসারোচিত হেমের গলা। ও খুব কৃতজ্ঞবোধ করবে আপনি সঙ্গদান করেছেন শুনলে রাইসনারের নিঃসঙ্গ সেক্রেটারীকে–ডেলার গলা রিনরিনিয়ে উঠলো। কিন্তু মিসেস ওয়ার্দাম ব্যাপারটা গোলমেলে–শুনেছি রাইসনার সারা দুপুর ছিলো আপনার এখানে। হ্যাঁ, ছিলোই তো। নিক বেরিয়েছে সন্ধ্যে নাগাদ, বললো যাচ্ছে সাঁতার কাটতে তাকে কেউ দেখেনি তো ওদিকেও। হেম বললো একটু থেমে।

আলোচনা করছিলেন কি ব্যবসার কথা আপনারা? ঘরে নীরবতানামলো আবার। হেমের দিকে তাকিয়ে ডেলা, অনুমান করলাম, ক্যাপটেন বিশ্বাস করা যায় আপনাকে আমার মনে হয় কথা আছে, বসুন–লড়াই শুরু দুজনের ইচ্ছাশক্তির, এবার বোধহয়, নীরব তাই দুজনেই। আওয়াজ হলো ক্যাচ করে কিছুক্ষণ পরে, জয় হলো ডেলার বুঝলাম, ক্যাপটেন একটু খান, আমার পছন্দ নয় একা খাওয়া। হেম চোখ ফেরালো স্কচের খালি গ্লাসটার দিকে।

শুরু করেছেন আমি আসার আগেই মনে হচ্ছে। আপনার যে সুনাম আছে বুদ্ধিমান পুলিস সাহেব বলে সেটা মিথ্যে নয়। ডেলা ফোয়ারা ছোটালো হাসির। ই, এড়ায় না বড় কোনো কিছু আমার চোখে। শান্ত মনে হলো হেম কিঞ্চিৎ। উঠলো গ্লাসের আওয়াজ, ডেলা বোধহয় সোড়া ঢাললো। মনে হচ্ছে এক নম্বরী জিনিষ আপনার বোতল দেখে।

যাক কি বলছিলেন যেন বিশ্বাসের ব্যাপারটা? আপনার জানার আগ্রহ হতে পারে এখানে হঠাৎ হাজির হয়েছি কেন আমি আর রিককা। শুনুন খাতাপত্র পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছে পল আমাদের। পল রিককাকে পাঠিয়েছে ক্যাসিনোর উদ্বৃত্ত টাকা নিক জুয়োর পেছনে লাগাচ্ছে জেনেই, তাড়াবার জন্য ওকে। তা, মানে মানে সরে পড়েছে নিক তো দেখছি নিজেই। ডেলা সাবাস! অভিনয় করছে বেড়ে! অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভাবলাম। কত টাকা গেছে? বলেন কি! বলা শক্ত সেটা এখুনি; হতে পারে হাজার দশেক। দেখা শেষ হয়নি তো কাগজ পত্র, তবে–সব স্বীকার করেছে ও নিজে। চাবিগুলোও দিয়ে দিয়েছে ঝামেলা না বাড়িয়ে। আমি ওকে সরে যাবার বারো ঘণ্টা সময় দিয়েছি। ভাবিনি এর মধ্যে আপনাকে টেনে আনবে ওই বোকা মেয়েটা

হু! এই তাহলে ব্যাপারটা? ধুত্তোর! হেম অনিচ্ছার গলায় প্রশ্ন করলো একটুক্ষণ পরে, তা, এখন কি করার আছে কিছু আমার? বোধহয় না!

আপনার কি মনে হয় ও কোথায় গেছে? পারছি না বলতে। গিয়ে থাকবে সমুদ্রের দিকেই। ওকে তো দেখেনি পাহারাদারগুলো, বলছেন, ব্যাপার মজার। সঙ্গে নেয়নি দেখছি আর কিছুই তো–আমি দেখে এসেছি ওর ঘরটাও রইলাম রুদ্ধশ্বাস হয়ে–ডেলা কি করবে এবার?

ওর কিছু জিনিষপত্র থাকে জোয়ের ওখানে। আর, একদিন এটা হবে নিক তো জানতোই কিন্তু চালু ছিলো লোকটা, অসুবিধা হতে পারে ব্যবসায় ও না থাকায় হেম বললো চিন্তাকুল গলায়। অসুবিধা হবে না কোনো আপনার–আছি তো আমি আর রিককা

ওয়ার্দামের মতও কি তাই? হ্যাঁ, ক্যাপটেন অনেক করেছেন, এখনো করছেন আপনি আমাদের জন্য, পলের ধারণা। কথাও হয়েছে এনিয়ে তার নিকের সঙ্গে–কিন্তু ঝগড়া বাধিয়েছে নিকই। ডেলা হেসে উঠলো আবার উচ্চকণ্ঠে। যাক, আপদ বিদায় হয়েছে। আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি সপ্তাহে আড়াই শোকরে আপনার দক্ষিণা। ছমাস আগে থেকে টাকার হিসেব হবে। আপনি টাকাটা পাবেন কালকেই।

হঠাৎ যেন হেম খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, ই বেশ বেশ। সকলেরই তো দরকার টাকার। মিসেস ওয়ার্দাম কি বলেন? মনে হচ্ছে ভালোই চালাতে পারবো আপনাদের সঙ্গে। তা, কোথায় রিককা সাহেব? আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হলে আবার।

হাজির হয়েছে বে স্ট্রীটে গিয়ে সেই হয়তো। পারছি না বলতে ঠিক। কথা হবে, আসুন না কাল। আসবো–আওয়াজ উঠলো ক্যাচ–হেম বোধহয় উঠে পড়লো, কথা বলতে হবে মিস ডায়েরিংয়ের সঙ্গে। খুঁজে মরছে ওরা তো। বলতে পারেন, তবে না ভাঙাই ভালো আসলে কি হয়েছে।

ঠিক তা চাইছি না আমি এখুনি। বলবেন–গেছে যেন বাইরে কোথায়। আসছেন তো কাল? চেয়ার ঠেলে ডেলা উঠলো। নিশ্চয়ই গুড নাইট। কালই আপনাদের সঙ্গে শুরু করা যাবে কাজ–কার্পেটে আওয়াজ পেলাম জুতোর, ব্যাঙ্কে খোঁজ করবো কাল তাহলে, কি বলেন? হ্যাঁ, আগেই চলে যাবো আমরা অবশ্য। কল্পনা করলাম ডেলার হাসিটা। ক্যাপটেন গুড নাইট। শব্দ পেলাম দরজা বন্ধ করার।

অপেক্ষা করছি আমরা দুজনে দরজায় ডেলা, আর এই আঁধারে আমি রাইসনারের লাশ পড়ে আমার পেছনে কোথাও। আওয়াজ এলো গাড়ির স্টার্টারের, মিলিয়েও গেলো ক্রমে। ডেলা ঠেলে দিলো কলঘরের দরজাটা, সামলানো গেছে এখনকার মতো। বেরিয়ে এসো–বেরিয়ে এলাম আস্তে। চোখ ঘোরালাম ভেলার দিকে, লক্ষ্য করলাম সেই বিজয়িনীর দৃষ্টি ওর চোখে আলোটা সরে আসতে।

দেখেছি যা আগেও রাস্তা পরিষ্কারজনি বেরিয়ে পড়। রাইসনার শেষ বিদায় নিতে গিয়েছিলো তার প্রাণাধিক বন্ধুদের কাছে ওরা জানবে। কাছে গিয়েছিলো একটু বেশী। নাও চলো–চোখ ফেরালাম কলঘরের অন্ধকারে ঘাড়ের পাশ দিয়ে। কেমন অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে রাতের এই প্রহরে বয়ে নিয়ে যাওয়া এই লোকটাকে কাঁধে করে। কিন্তু উপায় নেই।

বাইরেই আছে আমার গাড়িটা। ডেলা বলে উঠলো নরম গলায়, ওকে নিয়ে যাও গাড়িতে ফেলে। ক্যাসিনোর পেছনের রাস্তা দিয়ে। দেখে এসেছো তো গুহা। বেশী লাগবেনা পাঁচ মিনিটের, নাও বেরোও। ভালো হতো গাড়িটা তুমি চালালে, চেষ্টা করলাম মৃদুস্বরে বলার। এক পাও নড়ছি না আমি এখান থেকে, তোমাকে কাজটা একাই সারতে হবেযদি টাকার ভাগ পেতে চাও। তোমারই সম্পূর্ণ দায়িত্ব যদি তুমি ভুল করো তো তার–ওকে মেরেছো তুমি, তোমার শেষ কাজও। কলঘরে ঢুকলাম ধীর পায়ে। ওকে দেখলাম আলোটা জ্বলতেই রাইসনার সেই চিৎ হয়ে পড়ে তোয়ালে মাথার নীচে।

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম ওর শরীরে হাত দেবার আগে। লোকটা ভারী শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়ালাম লাশ কাঁধে ফেলে, মুখ বেয়ে ঘাম ঝরছে দর দর করে, কষ্ট হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে। কলঘরের বাইরে পা দিতেই রাইসনারকে নিয়ে, ডেলা সদর দরজাটা খুলে দিলো ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে।

রাইসনার-এর দেহটা দিলাম সিংহদের।

.

চলছে গাড়িচাপা পড়ে রইলো সিংহগর্জনে ইঞ্জিনের শব্দ। বাড়িয়ে দিলাম গতি আস্তে..নজরে পড়লো ডেলার কুটির কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। আলো জ্বলছে। হেঁটে এগোলাম গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে কুটিরের দরজায় ডেলা। গর্জন শুনতে পাচ্ছি এখান থেকেও। হুইস্কির বোতল তুলে নিলাম ওর পাশ দিয়ে ঢুকে।

ডেলা ফিরে দাঁড়ালো দরজা বন্ধ করে। কোটরে ঢুকে গেছে ওর চোখদুটো। দেখতে পায়নি তো ওরা তোমাকে? নাড়লাম মাথা। হয়ে নাও চাঙ্গা, হেম হাজির হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে আরে ধুর, থামাও তো কপচানি।

খেঁকিয়ে উঠলাম, করতে তো হয়নি তোমাকে কাজটা। ন ঘণ্টা থাকতে হয়েছিলো আগলে বসে। ডেলা এগিয়ে এলো স্কচটা একচুমুকে নামিয়ে দিয়ে আবার ঢালতেই। জল দিয়ে এসো তো মুখে-চোখে কলঘরে গিয়ে। কেলেঙ্কারি হবে হেম দেখলে। কলঘরে ঢুকে গেলাম ওর দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে। সমস্ত পরিষ্কার করেছে ডেলা। দাঁড়ালাম আয়নার সামনে। নিজেকে মনে হচ্ছে শ্মশান ফেরত মানুষ। ঘামে জব জব করছে সারা মুখ, চুল এসে পড়েছে চোখের ওপর, বীভৎস। বেসিনে মুখ নামিয়ে দিলাম ঠাণ্ডা জল ছেড়ে দিয়ে। চুলে চিরুনি চালিয়ে দিলাম তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে। এখনো কাঁপছে হাতটা। দেখি ডেলা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে দরজার দিকে ফিরতেই। প্রশ্ন করলো চোখে চোখ পড়তেই। ওকে জনি? বিশ্বাস করতে পারছি না নিজের কানকে।

কি বললে? কে ওই মেয়েটা? কাজচলেছে চিরুনির কিন্তু জমে গেছে ভেতরটা। বলছো কার কথা? গলা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম যতটা সম্ভব। তোমাকে নাকি একটা মেয়ে পৌঁছে দিয়ে গেলো পাহারার লোক বললো। কে মেয়েটা এবার সোজা তাকালাম ওর চোখে।

জানবো কি করে! হারিয়ে ফেলেছিলাম রাস্তা বলেইছি ত। যাচ্ছিলো দেরি হয়ে, তাড়া ছিলো ফেরার। লিফট নিলাম ওকে থামিয়ে। নেওয়া হয়নি ওর পরিচয়টাও, হয়েছেটা কি

তাতে? না, ভাবছিলাম স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে ডেলা তাকিয়ে আছে, –লিফট নিতে ওস্তাদ তুমি তো আবার, তাই না? ও ফিরে চললো বসার ঘরে।

কলঘর থেকে আমিও বেরোলাম। একসঙ্গে গাঁথা হয়ে গেলো কিন্তু আমাদের জগৎ এখন থেকে ভালো নাও বাসি আমরা যদি পরস্পরকে, মুশকিল ছাড়াছাড়ি হওয়া। বুঝতে পারছো? ডেলা বলে চললো উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে। একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার আমাদের মধ্যে। অনুপ্রবেশ চলবে না কোনো নারীর আমাদের জীবনে। একই কথা বলেছিলাম পলকেও পারবো না ঠকতে। এখান থেকে সরে যেতে হবে তোমার মাথায়ও যদি ওই ভূত চেপে থাকে তাহলে। খোলাই রাস্তা তো, তুলে দেওয়া হেমের হাতে–ফোন বেজে উঠলো আমি কিছু বলার আগেই। ডেলা রিসিভার তুলে নিলো লীলায়িত ভঙ্গিতে এগিয়ে।

হ্যালো? দেখতে লাগলাম ওকে। অন্যদিক থেকে কানে এলো একটা উত্তেজিত গলার কচকচি অনেকক্ষণ ধরে। পরেবললো ডেলা, শুনতে পাচ্ছি আমি গর্জন! বলুন তোকি ক্লেলেঙ্কারি। খাঁচার কাছে যেতে লোকটা সবসময় বারণ করেছে পল কতবার, অ্যাঁ? হ্যাঁ আছে, ফিরলো এই তো না–না–এ ঝামেলায় যাচ্ছি না আমরা যা করার করুন আপনি। না, আর এদিকে আসতে দেবেন না কাগজের লোকগুলোকে–ঠিক আছে, দেখা হবে কালই ক্যাপটেন ধন্যবাদ। ডেলা হাসলো মোহিনী হাসি তাহলে ছাড়ছি গুড নাইট, ও নামিয়ে দিল রিসিভার। মুচকি হাসলো আমার দিকে ফিরে, ঠিক আছে সব, তাই হলো যা চেয়েছিলাম, হেম লোকটা কাজের।

কি বলল এর মধ্যে নেই আমরা বাবা! ডেলা সরে এলো আমার দিকে, ঢালোনা সখা আর একটু সেলিব্রেট করি। বাড়িয়ে ধরলাম হুইস্কি ঢেলে। ডেলা বললো গ্লাসটা নিতে নিতে, এইতো এখন নিশ্চিন্ত আমরা। হয়ে গেলাম বড়লোক শুরু সবে জীবনের। জনি, বুঝতে পারছো? বলতে পারলাম না, বললাম না কিছুই।

ডেলা চুমুক দিলো হুইস্কিতে ওর দৃষ্টি আমার দিকেই। খিল তুলে দিলো গ্লাস নামিয়ে হাসিমুখে দরজার দিকে এগিয়ে। আমাদের বিরক্ত করবে না আর কেউ আমি আর তুমি শুধু। ওদিকে ব্যস্ত ওরা সবাই এই আনন্দক্ষণটা ধরে রাখি এসো আমরা দেখিয়ে দাও তুমি কত ভালবাসো আমাকে। ডেলা দাঁড়ালো আমার গা ঘেঁষে। আমার ঘৃণ্য মনেহলো ওকে। আমার জীবনে আর কখনো হয়নি এমন ঘৃণাবোধ। যেভাবে পেতে চেয়েছিলো পেয়েছে ও আমাকে। একটা কথাই যথেষ্ট ওর মুখ থেকে। আমি গাড্ডায়। আমাকে চলতে হবে ওর কথামতই, নইলে–থাকবে না কোনো নারী। মনে পড়লো জিনির কথা। টাকা আছে আমাদের, বলে চললো ডেলা, এটা পরম লগ্ন আমার জীবনের তোমারও নিশ্চয়তাই না? কি, জনি বিশ্বাস হচ্ছে না? বললাম নির্লিপ্ত গলায়, হচ্ছে। ডেলা তার নরম হাতে জড়িয়ে ধরলো আমার গলা।

আমি তাকিয়ে রইলাম ওর অতলান্ত কালো হরিণ চোখের দিকে। ও মৃদুস্বরে বললো, কেমন লাগছে লক্ষপতি হতে? ভালোই লাগছে বললাম। নামিয়ে দিলাম ওর ঠোঁটে ঠোঁট। জড়িয়ে ধরলাম। তারপর ডিভানের দিকে চললাম আস্তে তুলে নিয়ে। আমার ওপর কর্তৃত্বকরেছেও এতক্ষণ পর্যন্ত, কিন্তু চালু হতে হবে আমাকেও, অন্তত বাঁচাতে হবে পৈতৃকপ্রাণটা, ধরতে হবে ধৈর্য। ওর চোখে চোখ রেখে হাসলাম, ওকে ডিভানে শুইয়ে দিয়ে।

এখুনি শেষ করে দেওয়া যায় ওর পাখীর মত নরম গলাটা টিপে–কিন্তু না, ওকে সরাতে হবে অন্য উপায়ে।

এ কথা বিশ্বাস করে নি ডেলা আমাকে গাড়িতে চাপিয়েছে অপরিচিত একটা মেয়ে। ফলে হতে পারলাম না ক্যাসিনোর সহ পরিচালক। আমাকে কাজ করে যেতে হলো ওর সহকারী হয়ে। আমি মেনে নিয়েছি এ অবস্থা, ভুলিনি এটা বুঝিয়ে দিতেও ওকে প্রকাশ্যে।

আমি বিশ্বাস করি নি ডেলাকেও। ও সিন্দুকের চাবিগুলো হাতিয়েছে রাইসারের লাশ আগলাবার ছুতো করে। আমাকে বলেনি সংযোগের সংখ্যাগুলোও। অলিখিত চুক্তি আমাদের মধ্যে : আধা–আধি বখরা উদ্ধৃত্ত টাকার। সোয়া লাখ করে।

এখনো পাইনি টাকাটা। টাকাটা চাইতে ডেলার কাছে ও বলেছিলো, জনি, ব্যবসায় নেমেছি আমরা এখন ও টাকায় চলবে না হাত দেওয়া।

গোটা ক্যাসিনোর মালিকানা অনেক বেশি লাভজনক, নয় কি? থোক টাকা পাওয়ার চেয়ে। অন্য খাতে বইছে কিন্তু আমার ভাবনা। এখান থেকে সরে যাবো জিনিকে নিয়ে ওই টাকাটা পেলে। আমার কোনো স্বপ্নই বাস্তবে রূপ নেবে না ডেলার দেওয়া সপ্তাহাভিক একশো ডলারে। এখন তো বেশি টাকার দরকার নেই তোমার। ডেলা হাই তুলছিলো ডিভানে প্রায় বিবস্ত্রাবস্থায় শুয়ে।

তুমি তোমার ভাগ পাবে, এখুনিনয় তবে। ব্যবসায় খাটছে ধরেনাও টাকাটা। অবস্থা বুঝি আমি বাজারের, অজানা সেটা তোমার। অপেক্ষা করো আরকটা দিন। আমি বিশ্বাস করিনি একথা অবশ্য, ডেলা নিজেওকরেনি সম্ভবত। চাইলেই পাবে তোমার যখন যা দরকার। ঠোঁটে ডেলার কুহক হাসি। লক্ষ্মীটি তোমাকে দেখতে চাই আমি সুখী–সুখী তো না কি তুমি? হাসি ফোঁটালাম বহুকষ্টে মুখে। সুখী আমি বললাম।

ঘৃণা জমেছে মনে প্রচণ্ড প্রবোধ দিলাম নিজেকে, একদিন সময় আসবে...শুধু অপেক্ষা সুযোগের। কিন্তু তা হলো না ডেলা যেমনটা চেয়েছিলো। কেউ মেনে নিতে পারলো না মেয়ে মানুষের খবরদারি। বেঁকে বসলো আবাসিকরাও, কর্মচারীরা তোনয়ই। ডেলা জাকিয়ে অফিসঘরে বসতে লাগলো রোজ সকালে। চালালো হাঁক–ডাকও কিন্তু পেলো না তেমন পাত্তা। একদিন উপস্থিত হলো ধূমকেতুর মত ইস্পাত সম্রাট গলয়ে হ্যারিস ব্রাউন। তখন দপ্তরে ছিলাম আমিও। ডেলা স্বাগত জানালো মিষ্টি হেসে ব্রাউন ঢুকতেই, কিন্তু মনে হলো না ওর দিকে তাকালেন ভদ্রলোক। প্রশ্নবান ছুঁড়লেন সোজা তাকিয়ে আমার দিকে। অ্যাই রিককা তো আপনিই তাই না? হা, দাঁড়ালাম উঠে, গরম জল নেই আজ সকাল থেকেই আমার ওখানে, আপনারা কি শুরু করেছেন? আগুনের টুকরো ওর চোখদুটো, ডেলা এগোলো হাসিমুখে। সাহায্য করতে পারি আমি হয়তো আপনাকে।

ওর দিকে ঘুরে তাকালেন ব্রাউন, নাকচ করে দিলেন ডেলার বক্তব্য হাতের আন্দোলনে, দেখুন আমি মেয়েদের কাজের ব্যাপারে কোনো কথা বলি না বিশেষ করে তরুণীদের সঙ্গে। রিককা তো ইনিই? সরে যান আপনি একেই বলছি যা বলার। ডেলার আর পথ রইলোনা দুপা পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া। আমি করে দিলাম জলের ব্যবস্থা–আশ্বাস দিলাম উনি সপরিবারে আমার কুটির দখল করতে পারেন এ ধরনের ঘটনা আর ঘটলে। ব্রাউন

বেরোলেন দিকবিদিক কাঁপিয়ে ঘোঁৎ ঘোৎ শব্দে। ছড়িয়ে পড়লো খবরটা অন্যেরাও তাদের অসুবিধার ফিরিস্তি নিয়ে আমার কাছেই আসতে লাগলো। বুদ্ধিমতী ডেলা। আমার ওপর ছেড়ে দিলো দপ্তরের কাজগুলো, জনি তুমিই চালাও–তুমিই এখন ক্যাসিনোর মালিক। অবশ্য আমার কাছেই রাখছিচাবিগুলো। জানিও টাকার দরকার হলে। ওর হাতেই রইলো বে স্ট্রীটের কর্তৃত্বও। ভয় করতে শুরু করলো ওরাও ডেলাকে। ডেলা হাজিরা দিতে লাগলো সেখানে সপ্তাহে তিনদিন করে সন্ধ্যেয়। সুবিধেই হলো আমার এতে। আমি জিনির মধুর সঙ্গ পেতে লাগলাম ওই দিন গুলোতে।

ভালো লেগেছে জিনিকে। হৃদয় দিয়ে ফেলেছি ওকে। যদিও জানি ওকে পাওয়ার ঝুঁকি অনেক। ওকে পেতে হবে। মনে ছিলো ডেলার সাবধান বাণী–কিন্তু আমি বদ্ধপরিকর আমার প্রেমপর্ব চালিয়ে যেতে। জিনিকে একটা চিঠি দিয়ে ছিলাম ওর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর, তাতে দুঃখপ্রকাশ করেছিলাম আচমকা বিদায় নেবার জন্য ওর কাছ থেকে ওই রকম? সেদিন মনটা অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিলো বোধহয় অনেকটা সময় রোদে বসে থাকার দরুণই। পড়েছিলাম অসুস্থ হয়ে সামলে উঠেছি এখন মোটামুটি। কবে আসবো, ক্ষমা চাইতে যাবো তোমার কাছে। ভাড়া করে ফেললাম একটা তিন কামরার ফ্ল্যাট ফ্রাঙ্কলিন বুলেভার্ডে চিঠি ছেড়ে দিয়েই। ঠিকানাটাও ওকে দিয়ে দিলাম। সপ্তাহে একশো ডলার আর খাওয়া–দাওয়া, আমার মন্দ চলবে না। অবশ্য থাকছেও না হাতে কিছু। মাঝে মধ্যে বসছিজুয়োর টেবিলেও। পাচ্ছিও কিছু কিছু। পিটসবার্গ অফিস থেকে লিঙ্কনীচে বদলি হয়েছি আমি জিনি জানালোদায়িত্ব নিয়ে এখানেনতুন অফিস খোলার। চালিয়ে গেলাম কাজের ভান, বিশ্বাস করলো জিনি সবই।

খারাপ লাগছিলো ওর কাছে মিথ্যের বেসাতি করতে কিন্তু ছিলো না কোনো উপায়, কারণ ভালবেসে ফেলেছি জিনিকে। জীবন-সঙ্গিনী করতে চাই আমার ওকে। কিন্তু টাকা চাই তার আগে, আর মুক্তি।

আরও ব্যাপারটা সহজ হতো যদি যেমন তেমন কিছু একটা হতো জিনির চাকরিটা। কিন্তু ওকে নিয়ে সরে যেতে পারছি না আমার হাতে পর্যাপ্ত টাকা না থাকাতে। ফেলেছি ভুল করে-বোধহয় জিনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে এখন বুঝেছি আমি ফকির হলেও কিন্তু ধরা পড়ে এ সব তো দেরিতে। ডেলা বে স্ট্রীটে পাড়ি জমাতে যে সব দিনে, আমি বেরিয়ে পড়তাম বুইকে চেপে জিনির সঙ্গসুখের সন্ধানে। কথা হতো ফোনে-ফ্ল্যাটে সোজা চলে আসতে জিনি, কখনো ওকে তুলে নিতাম আমি। দুটিতে ডুবে যেতাম গানে বাজনায়।

দুজনে খেলতাম দাবা। খেলা শিখেছিলাম জিনির কাছেই। মাঝে মধ্যে চলে যেতাম রণের ওখানেও। ওখানে সময় কাটতে নিরাপদে, কারণ হাজির হবে না সেখানে ডেলা কখনোই। কেউ ক্যাসিনোরও। ভালবাসে আমাকে জিনিও-কিন্তু এগিয়ে আসছে বেরিয়ে পড়ার সময় ওর তো-

দুশ্চিন্তা বাড়লো দুজনেরই জনি বলল তো কি করবো। জিনি বললো ফ্ল্যাটের এক নিভৃত সন্ধ্যায়। কবে হবে আমাদের বিয়েটা এই পর্যায়ে পৌঁছেছি আমরা এগারো দিনে। আমিও মাথা খুঁড়ে মরছি এই সমস্যা সমাধানের জন্য। আমাকে দুটো কাজ করতে হবে জিনিকে আমার জীবনে জড়াবার আগে। হাতে রাখা দরকার অনেক টাকা, প্রথম কাজ, থাকার জায়গা ঠিক করা দ্বিতীয় কাজ। আমাদের পাত্তা পাবে না যেখানে ডেলা এমন জায়গা

এখানে যখন টেনে আনে ডেলা আমাকে আশ্বাস দিলো সোয়া লাখের। পালন করেছি নিষ্ঠার সঙ্গে আমার কাজ–কিন্তু প্রতিশ্রুতি রাখেনি ডেলা তার। আমার অর্জিত অর্থ ওই টাকাটা–আমার বিবেচনায় সুপ্রতিষ্ঠিত তাতে আমার অধিকার। পেতে হবে আমাকে টাকাটা। কিন্তু আমাকে জানতে হবে তার আগে সিন্দুকের সংযোগের সংখ্যাগুলো। রাস্তা নেই প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া। মোটামুটি ঠিক হয়েছে একটা জায়গা বিবাহোত্তর অজ্ঞাতবাসের। কিউবা। হ্যাঁ আমরা যাবো কিউবায়।

বিমানের টিকিট কাটবো টাকাটা হাতে আসা মাত্র। কখনো আসবেনা ডেলার মাথায় কিউবার কথা। করার কিছু থাকবেনা। আর এলেও। তাই, কবে বিয়েটা হতে পারে জিনি যখন প্রশ্ন রাখলো; আমার তৈরীই ছিলো আংশিক উত্তর।

জানালাম আমাদের মিলন সম্ভব হবে মাস দেড়েকের মধ্যেই। বললাম, আমাকে হাভানাতে ম্যানেজারের পদটি দেওয়া হবে যদি এখানকার কাজ মোটামুটি সন্তোষজনক হয় তাহলে। অফিসের কর্তা জানিয়েছে আমাদের। জিনি বেশ হবে, পেয়ে যাবো আমাদের যা চাহিদা কাজ করতে হবে না তোমাকেও আর। জিনি তোমার কেমন লাগবে কিউবায় থাকতে? জিনির উত্তর নীড় বাঁধতে পারে দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে সে, আমি সঙ্গে থাকলে। দুশ্চিন্তাও বেড়েছিলো মিথ্যাভাষণে কোনোদিন যদি জানতে পারে জিনি প্রকৃত অর্থ..কিন্তু আমার টাকা নিয়ে বেশি মানসিক অস্থিরতা তার চেয়েও...কবে সরে যেতে পারবো আমার ভাগের টাকা বের করে সিন্দুক খুলে প্রতিদিন বসতাম কর্মচারীদের সঙ্গে ক্যাসিনোর দপ্তরে, শোনা হোত তাদের অভাব অভিযোগ, বিবেচনাও করা হতো প্রস্তাব থাকলে। এদের কখনো ডাকেনি পল বা রাইসনার এরা খুশীহতো তাই ডাকলে।

একটা ক্ষেত্রও হলো হেলিকপটার অবতরণের লিঙ্কন বীচে। উড়ো-ট্যাকসি চলাচল শুরু হলো মিয়ামি আর লিঙ্কন বীচের মধ্যে। মিয়ামি চলে যাচ্ছে একঘেয়েমি কাটাতে বীচের মানুষ, আবার বীচে আসছে মিয়ামির মানুষও-বেড়ে চললো ক্যাসিনোর আয় টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনও চালু হলো ক্যাসিনোর কার্যকলাপের। অনুষ্ঠানও শুরু হলো ক্যাবারে নৃত্য আর বাদ্যবৃন্দের। বুদ্ধির তারিফ করলো ডেলা আমার। জনি, দারুণ তোমার এই আইডিয়াটা, জবাব নেই-হু, করে ফ্যালো পুরস্কারের ব্যবস্থাটাও যখন স্বীকার করছে। হাসলাম, আচ্ছা দিয়ে দাও না ওই টাকাটা, বলেছে যেটা দেবে। কাজে লাগাবো ওটা-মুক্তোঝরা হাসি ফোঁটালো ডেলা ঠোঁটে, জনি ধৈর্য ধরো একটু তুমি পাবে টাকা। বুঝলাম মাঠে মারা গেলো এবারের আবেদনও, কবে? ডেলা একটা বেলেল্লা ভঙ্গি করলো, বলছি কাছে এসো, এই পর্যায় সবচেয়ে দৃষ্টিকটু ওর অভিনয়ের... প্রেমের পালা শুরু করা অঙ্গুলি হেলনে...কিন্তু যেতে হবে করে-দূরে সরিয়ে রাখতে হবে এই মেয়ে মানুষটাকে জিনির কাছ থেকে। ডেলা জানবে আমি ওর প্রেমে পাগল যতদিন আমি বাঁচবো ততদিনই। শুয়ে শুয়ে ভেবেছিকুটিরের বিছানায় অন্ধকারে আমার মনের পটে বার বার ভেসে উঠেছে একটা মানুষের মুখ...রাইসনার।

লক্ষ্মীসোনা, দিচ্ছি বিবেকের তাড়নায়-ক্যাসিনোর জন্য তুমি অনেক করেছে। পাকা অভিনেত্রী মেয়ে-মানুষ! জিনি মিয়ামি যাবার জন্য প্রস্তুত হলো তার সৈকতবাস ছেড়ে দিন পনেরো পর। কি ওয়েস্ট চলে যাবে সেখানকার কাজে মিয়ামির কাজ সেরে। অবশ্য ঠিক হয়নি যাত্রার দিন। পাঁচ সপ্তাহ কেটে গেছে রাইসনারের মৃত্যুর পর সব দিব্যি চলছে। রেহাই মিলেছে খুনের, লুকোচুরিও চলেছে ডেলার সঙ্গে। ভালবেসেছি জিনিকে-পাখানা মেলে দিয়েছে সেও তার হৃদয়ের।

লস এঞ্জেলস থেকে হাজির হলো এসে আসল রিককা এমনি এক দিনে।

জানতাম আমরা রিককা আসবে–তাই প্রস্তুতিও ছিলো মানসিক ভাবে। তারবার্তা এসেছে লেভিনস্কীর কাছ থেকে কিছুদিন আগে, সেখানে পল পৌঁছায়নি। নিশ্চয় খবর গেছে রিককার কাছেও। ফেরত ডাকে পলের শরীর ভালো নয় লেভিনস্কীকে জানানো হলো, সে বিশ্রাম নিচ্ছে লন্ডনে। রাইসনারের নামেই তার গেলো। সময় নেবার জন্য এসবই। রিককার ট্রাঙ্ক আশা করছিলাম লস্ এঞ্জেলস থেকে, কিন্তু হয়তো উঁকি দিয়ে থাকবে কোনো সন্দেহ লোকটার মনে তাই, সে হাজির হলো সশরীরেই, বিনা নোটিসেই, একরকম।

আঁকিবুকি কাটছিলাম সাঁতার দীঘির একটা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে। ভাবছিলাম কেমন দাঁড়াবে আলোগুলোকে দীঘির চারপাশে মেঝেয় বসাবার ব্যবস্থা করলে ওপরের আলোগুলোকে তুলে দিয়ে। সময়টা বারোটার কিছু পরই হবে–ভিড় বাড়ছে লাঞ্চের – লোকও বাড়ছে বারের। টের পাইনি ওর ঢোকা। নিঃশব্দে চলাফেরাই নাকি তার বৈশিষ্ট্য পরে জেনেছি। লোকটাকে নজরে পড়লো চোখ তুলতেই দাঁড়িয়ে সামান্য দূরে।

চমকে উঠলাম। ওকে চিনলাম কোনো মিল না পেলেও আমার কল্পনার সঙ্গে ওর চেহারার। ওর চেহারাটা বেশ ভারীই হবে আমার ধারণায় ছিলো, কিন্তু বিশাল ভুঁড়ি, বেঁটে, মোটা একটালোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে। মাথায় টাক পড়ার পূর্বাবস্থা পাতলা চুল কয়েক গাছা ছড়িয়ে। এক মুহূর্তে বলে দেওয়া যায় লোকটা মদ্যপ মাংসল মুখটা দেখে।

একজোড়া প্রাণহীন চোখ সাপের মত, তৈরী যেন কাঁচের। অর্থহীন হাসি মুখে একটা, যে হাসি ঠোঁট থেকে কখনোই মিলোয় না।

বিস্তৃত হলো হাসিটা, জ্যাক রিককা আমি, কোথায় নিক? আমার পা চলে গেলো টেবিলের তলায় একটা বোতামে, সঙ্কেত বেজে উঠলো ডেলার ঘরে। শুধু এটা ব্যবহার করার কথা রিককার আগমনের সাবধানবানী হিসেবেই। ছেড়ে দিলাম চেয়ারে পিঠ, এক নিভৃত কোণে বসলাম অম্লান রইলো মুখের হাসি, অপরিবর্তিত মুখভাবেও–রিককা টেনে নিয়ে বসলো চেয়ারের পেছনে মোটা আঙুল ছুঁইয়ে। মানে, বলছেন মায়া কাটিয়েছে ইহলোকের? গন্ধ পাচ্ছি ওর নিশ্বাসের ওর অনুমান ঠিকই মাথা হেলিয়ে জানালাম। হু, ব্যাপার গোলমেলে তা, জানতে পারি আপনি কে? সিগারেটের প্যাকেট বের করলাম ড্রয়ার খুলে। ৪৫ কোলট অটোমেটিকটা রয়েছে আধখোলা ড্রয়ারের এক কোণে...শুধু ঘোড়া টিপে দেওয়া হাতের মুঠোয় নিয়ে বিপদ দেখা দিলে–পাকা করা আছে সব ব্যবস্থাই রিককার অভ্যর্থনার। আমি? কোম্পানী চালাচ্ছি আমি। হু, –আচ্ছা।

তো, কে দিলো এ গুরুভারের দায়িত্ব আপনাকে? ড্রয়ারে স্থির রিককার সর্পচক্ষু। কিন্তু সেখান থেকে অটোমেটিক চোখ চলে না সে যেখানে বসে আছে। তবে সে যে আন্দাজ করেনি কিছু তার মানে এই নয়। ফিরলাম ডেলার কণ্ঠস্বরে। আমি দিয়েছি, ও দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। তাই বুঝি? রিককা বলল মাথা না ঘুরিয়েই–তার চোখ নিবদ্ধ আমার ওপরই, তা, কোথায় পল? ডেলা তার মুখোমুখি এগিয়ে এলো ধীর পায়ে জ্যাক কেমন আছো? দেখা নেই অনেকদিন, খবরাখবর কি। লস এঞ্জেলসের? রিককা চাপিয়ে দিলো পায়ের ওপর পা, বুকে জড় করলো হাত দুটো। মনে হচ্ছে লোকটা বিপদজনক। তার

জানার কথা নয় ডেলা এখানে রয়েছে, অজানা রাইসনারের মৃত্যুসংবাদও, কিন্তু বুঝলাম তার মুখোভাবের পরিবর্তন আসার পক্ষে যথেষ্ট নয় এ খবরগুলোর কোনোটাই।

সে উত্তর দিয়ে গেলো নির্বিকার ডেলার প্রশ্নের, আছি ভালোই। হ্যাঁ, দেখা অনেকদিন পরে, খবর ভালোই লস এঞ্জেলসের। কিন্তু দেখছিনা যে পলকে। মারা গেছে। ডেলাও কথাগুলো ছেড়ে দিলো নির্বিকার গলায়। সেই হাসি মুখে, ভাবান্তর নেই কোন। স্বাস্থ্যের জায়গা তো লিঙ্কন বীচ তা এখানে–যাকগে একদিন তো মরতে হতোই। কি হয়েছিলো? ঠাণ্ডা লেগেছিলোনাকি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে দুনিয়া থেকে? মারা গেছে গাড়ির দুর্ঘটনায়। আর তারপর ক্যাসিনোর : মালকানী সেজে বসেছো একটা ছোকরা জোগাড় করে?

পা নাচাতে লাগলো রিককা। হ্যাঁ, ঠিক তাই–ডেলার বরফঠাণ্ডা গলা, আর তাতে করার কিছুই নেই তোমার। রিককার হাসি সুস্পষ্ট হলো, ডেলা স্মার্ট মেয়ে তুমি বরাবরই। তা, ব্যাপারটা আর কেউ কি জানে তোমরা দুজন ছাড়া? না, জানবে জানার সময় হলেরিককা ফুটবল মাথা নাড়লো ভালো। তা কে ইনি? সে মোটা আঙুল বাড়িয়ে দিলো আমার দিকে। ও জনি, ওকে এখানে জনি রিককা বলে জানে সকলে–বেশ, বেশ–একেই আমি বলে ধরেই নিয়েছিলো নিক তাহলে–কথা বললাম না আমরা কোনো। তা, ভায়া গেড়ে বসেছে ভালো জায়গাতেই। হ্যাঁ, আর সেদিকেও লক্ষ্য আছে আমার যাতে অন্য কেউ গিয়ে বসতে না পারে তাকালাম রিককার চোখে। তার ঠোঁট থেকে হাসি মেলালো না। ডেলা কোমর ঠেকিয়ে বসলো টেবিলে।

সিগারেট ধরাল। দ্যাখো জ্যাক কথা বলি খোলাখুলি মারা গেছে পল। রাইসনারওরইলাম জনি, লেভিনস্কী, তুমি আর আমি। লেভিনস্কী যেমন আছে থাক প্যারিসের ব্যাপারটা

নিয়ে। লস এঞ্জেসল আছে তোমার। আমরা থাকবো লিঙ্কন বীচ নিয়ে–পা দেব না কেউ কারো ল্যাজে।

হু, ব্যাপারটা সাজানো হয়েছে দেখছি বেশ নিখুঁত ভাবে। তা, মনে করছে কাজ করতে পারবে বলে এ ছোকরা, ঠিকমত? হাতটা এগিয়ে নিলাম একটু ড্রয়ারের দিকে, মনে হচ্ছে গোলমালের সূত্রপাতকারী সংলাপ। জ্যাক আমি নিশ্চিন্ত সে বিষয়, ওর এলেম আছে এ সব ব্যাপারে বলতে পারো পলের মতোই–চমকে উঠলাম। মনে হলো সত্যি কথাই বলছে যেন ওর বলার ধরনে। রিককা মাথা নাড়লো আমার দিকে চেয়ে, ঠিক আছে। আমার পছন্দ চালু লোকই–আর ভালোই চালাচ্ছো তো তোমরা দুজনে ডেলা যেন অভয় পেলো একটু কিন্তু সতর্ক আমি। তোমার আপত্তি আছে এখানে যদি দিন দুয়েক থাকি? দেখতাম ঘুরে ফিরে একটু হ্যাঁ–হ্যাঁ থাকো না–আমাদের ভালোই লাগবে, ডেলা লুফে নিলো প্রস্তাবটা। খাওয়া যাক চলো একটু, শুকিয়ে গেছে গলাটা। ডেলা তাকালো আমার দিকে, আসছোনাকি জনি? ব্যস্ত আছি একটু, আসছি দেড়টা নাগাদ—

ঠিক আছে। উঠে দাঁড়ালো রিককা। উঁকি দিলো ড্রয়ার বন্ধ করার মুহূর্তে, বাঃ, আমার তো পছন্দ এরকম লোকই–যে বাঁচাতে জানে নিজেকে। পরে মোলকাত হবে, আচ্ছা দোস্ত। ডেলা বেরোলো রিককা দরজা খুলে ধরতে।

দেখে যাচ্ছি আমি। সশব্দে ড্রয়ার ঠেলে দিলাম আমি দরজা বন্ধ হতেই। চপ চপ করছে ঘামে মুখ, গতি বাড়ছে হৃৎস্পন্দনের বাঘের মুখে যাওয়া এ লোকটাকে বিশ্বাস করা মানেই। বলতে পারে বেশ গুছিয়েই কথাবার্তা–খালি হাতে ফেরার মানুষনা এধরনের চিজগুলো–মাথায় বসে রইলো চিন্তার কুণ্ডলী পাকিয়ে। পরে উঠে দাঁড়ালাম জানলার

কাছে–চোখে পড়ছে একটা অংশ বাইরে গাড়িবারান্দার। হেঁটে চলেছে ওরা পাশাপাশি। সেই হাসি রিককার ঠোঁটে। বলছে কথাও।

ঠিক। রিককা ফিরলো ডেলার দিকে, নিক কি হাত দিয়েছিলো সত্যিই উদ্ধৃত্ত টাকায়–না কি শুধু সন্দেহ করেছিলো পল? দিয়েছিলো তবে, সরাতে পেরেছে খুব সামান্য–জবাব দিলো ডেলা। অংশটা বিরাট। উদ্ধৃত্ত টাকার ডবল টাকা আমার ওখানকার। রিককা বললো। ডেলা, কঠিন গলায় বললোকয়েক সেকেন্ডনীরবতার পর, হ্যাঁ। তবে আমাদের দরকার এর প্রতি পাই পয়সাই। রিককা আমার দিকে ফিরলো। ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয় পাঠিয়ে দেওয়া যায় লস এঞ্জেলসে এই টাকার একটা অংশ মানে, আর কি কথার কথা। এটা করতো পল থাকলে সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে জানতো এক জায়গার টাকা অন্যখানে খাটিয়ে। টেবিলে নামিয়ে দিলাম ছুরি–কাঁটা আমার। চলে গেছে ক্ষিদে। কিন্তু কোনো বিকার নেই ডেলার সে খেয়ে চলেছে যেন কানে যায়নি কিছুই।

একমুহূর্তের জন্য থমকে গেলো রিককার হাসিটা রবারের মুখোশ যেন মুখটা! আমার আদৌ ভালো লাগলো না ওর ওই মুখভাব। তোমাদের ব্যাপার অবশ্য এটা–রিককার ঠোঁটে ফিরে এলো হাসি। জ্যাক বললাম তো তোমাকে, এখানে লাগছে এর প্রতিটি পয়সা।

ডেলা কথাগুলো বলে গেলো মুখ না তুলেই। লাগছে হয়তো–শেষ করলো রিককা খাওয়া। বেয়ারা সরিয়ে নিয়ে গেলো বাসন। রিককা বলে যেতে লাগলো লস এঞ্জেলসের ক্যাসিনো সম্বন্ধে। মনে হলো ফঁড়া কাটলো এখনকার মত, কিন্তু তাহলে রিককা আবার এ প্রসঙ্গ তুলবে যদি আমি ভুল না করে থাকি, টাকা হাতাবার চেষ্টা চালাবে। জানি না

কতদূর যেতে পারবে। কিন্তু শেষ না দেখে ছাড়বে না। সাঁতার দীঘির আলোক ব্যবস্থা সম্পর্কে রিককাকে বোঝাচ্ছি ব্র্যান্ডির গ্লাস হাতে নিয়ে। বারান্দায় বসে কফি শেষ করে আমার পেছনে কিছু দেখে চোখ তুললো রিককা আর ডেলা, ফিরলাম আমি। দাঁড়িয়েছে এসে একটা মেয়ে। ওকে চিনতে পারিনি প্রথমটায়, মনে পড়লো পরে–জর্জিয়া হ্যারিস ব্রাউন মেয়েটা।

মাতাল, টলছে। আর আমাদের দেখা হয়নি সৈকতে সেই দিনটির পর। আমার অস্বস্তি হলো, আজ ওকে দেখে। জর্জিয়া শুধোলো আমার কাঁধে একটা হাত রেখে, চিনতে পারো কিগো পিয়ারী? ও আমার দিকে তাকালো রক্তবর্ণ চোখে, পরনে স্ল্যাস। দাঁড়ালাম উঠে, রিককাও উঠলো। আমার দিকে ডেলার চোখ।

ইঁদুরের দিকে তাকায় বেড়াল যেমন করে। বিপদের সঙ্কেত, বললাম আড়ষ্ট গলায় কিছু বলবে? হ্যাগো, এসেছি তো সেজন্যেই। জর্জিয়া পড়ে যেতে যেতে সামলালো আমার কোটের কোণ ধরে। তুমি চেনোই মিসেস ওয়ার্দামকে। জ্যাক রিককা ইনিই। পরিচয় করিয়ে দিই রিককা–মিস জর্জিয়া হ্যারিস ব্রাউন। অভিবাদনকরলো রিককা একটু ঝুঁকে। ওর দিকে তাকালো না ফিরেও জর্জিয়া। তুমিই রিককা, আমি তো জানতাম...। হ্যাঁ, ভাই হয় ও আমার সম্পর্কের বাবার দিকের। ভাবতে অবাক লাগে আবার বাপ আছে তোমার মত পোকা জাতীয় জীবের। কিছুক্ষণ হাওয়ায় ভাসলোকথাগুলো–কেউই কিছু বললাম না আমি আর রিককা। সিগারেট ধরালো ডেলা একটা। কথা বলছেন যে, কিগো বেজন্মা! বুঝলাম, রিককা আমাকে দেখছে গভীর মনোযোগর দৃষ্টিতে। ফ্যাকাসে মেরে গেছে ডেলার মুখ। সে বসে আছে নিশ্চল। আমার দাস। আমাকেই সামলাতে হবে। তুমি কি

চাও বললাম। এখন শুধু দর্শক নয় রিকা আর ডেলা, মজা দেখার জন্য অনেকেই জুটে গেছে।

আমার দিকে টান করে দাঁড়ালো জর্জিয়া তার ভরা বুকদুটো নিয়ে লাম্পট্যের হাসি ফোঁটালো রঞ্জনী মাখা ঠোঁটে, ওর চোখে পাপের ছায়া, জানতে চাইছি সে কে, যে মাগীটাকে নিয়ে ঘুরছে। কে বল তো লালচুলো সুন্দরীটা? যাকে নিয়ে শোও ফ্র্যাঙ্কলিন বুলে ভার্ডের ডেরায়, কথা বলল যার কানে কানে বলের কামরায়, ও কে? দপদপ করে উঠলো মাথার শিরা। দমে গেলাম পরক্ষণেইমামলো সেই শীতল অনুভব। আমার বোলোনা কোন কথা মুখ দিয়ে। এবার কানে এলো রিককার রসিকতা, জনির ও, মায়ের দিকের ছুটকি কেটে পড় তো এখন ভরে গেছে চোখ জলে। নাক লাল বিকট গন্ধ মুখে। পারছে না কিছুই। বুঝতে না? কাটো। কে হেসে উঠলো দর্শকদের মধ্যে। জর্জিয়া হঠাৎ চুপসে গেলো ফোঁটা বেলুনের মত, দৌড়ে চলে গেলো নিজের ঘরের দিকে এলোমেলো পায়ে। দরকার ছিলো ওকে তাড়ানোর, দুঃখিত জনি কথা বলার জন্য কথার মধ্যে–রিককা বললে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে।

ধন্যবাদ। তাছাড়া ও ছিলো না প্রকৃতিস্থও। বললো চোখাচোখি হতেই ডেলার সঙ্গে, ব্যাপারটা কি রলের, জনি, নাকি ঠিক হবে না জিজ্ঞাসা করা; হাসি ওর ঠোঁটে, বরফশীতল চোখ দুটো। কি বললাম শুনলেই তো, প্রকৃতিস্থা নয় মেয়েটা রিককা বলে উঠলো সান্ত্বনার গলায়, আরে আরে এরকম অনেক আছে। আমাদের লস এঞ্জেলসেও পাত্তাই দিতে নেই ওদের। মাথা পাগলের দল উঠে পড়লো ডেলা, বে স্ট্রীটে যাচ্ছি আমি আর জ্যাককথা হবে পরে–ডেলা গাড়ির দিকে নেমে গেলো আমার দিকে না তাকিয়েই। রিককা হাত রাখলো আমার কাঁধে। সবই আজব চীজ মেয়েগুলো ব্যতিক্রম নয় এও

তার, চলি–এ যেন কথা বলছে রাইসনার! নেমে গেলো রিককাও–তার ঠোঁটে আকণ্ঠ হাসি। বসে আছি টেবিলে ব্যস্ত মনে। হাতে জ্বলছে সিগারেট। দেখতে পাচ্ছি দেওয়ালের লিখন। আর নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না ডেলাকে ফাঁকি দিতে পারবো বলে।

চালু মেয়েটা বড্ড–ও জিনির সমস্ত খবরই বের করে ফেলবেআজ রাতের মধ্যেই। আবিষ্কৃত হবে অভিসার কক্ষও ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্ডের। দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে উঠবে রলের নিভৃত কামরাও। তবে হেমের হাতে তুলে দেবে না ডেলা আমাকে বরং আমাকে টাইট দেবার চেষ্টা করবে রিককার সঙ্গে এক জোট হয়ে।

খেলা ফুরিয়েছে আমার এবার সরে পড়তে হবে মানে মানে সিকটার দিকে তাকালাম চেয়ার ঘুরিয়ে। তাড়া তাড়া নোট সাজানো আছে ওই ভারী ইস্পাত দরজার পেছনে, আমার প্রাপ্য যার একটা বড় অংশই। কিন্তু সম্ভবনয়। কোই পরোয়া নেই যদি টাকাটা পেয়ে যাই তো। কিন্তু সিন্দুকের দরজা তো চিচিং ফাঁক হচ্ছে না সংযোগের কায়দা ছাড়া। আশার স্বপ্ন বুনে চলেছি এতদিন ধরে শুধু। স্বপ্নে দেখা দেবে সংযোগের নম্বরগুলো। আর, মাত্র তিনটে ঘণ্টা সময় আজ আমার হাতে–চার ঘণ্টা হতে পারে হয়তো করতে হবে এর মধ্যেই। কার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে নম্বরগুলো ডেলার কাছ থেকে যখন পাচ্ছি না? লুই? জানে কি ও লোকটা? হয়তো তুলে নিলাম ফোনের রিসিভার।

লুই, বলছি রিককা, হয়েছে এক ফ্যাসাদ। অফিসে এসেছেন মিঃ ভ্যান এটিং–এখুনি ভাঙাতে চাইছেন একটা চেক; বেরিয়েছেন তো মিসেস, ওয়াদাম–জানেন কি সিন্দুকের সংযোগ নম্বরগুলো? মনে হলো, ভালোই বললাম–ব্যবসায়িক সুর রয়েছে গলায়। গলায়

রয়েছে ব্যক্ততার আভাস। জানি না তো মিঃ রিককা আমি দুঃখিত। লোকটা জানা থাকলে নিশ্চয় বলতো, গলার সুরে মনে হলো। ও। এখন কি করি তাহলে? ক্ষেপে উঠেছেন তো ভদ্রলোক! যোগাযোগ করুন না মিসেস ওয়ার্দামের সঙ্গে, পেয়ে যাবেন বে স্ট্রীটে। করেছি চেষ্টা। ওখানে নেই উনি। আচ্ছা, হাজার তিনেক ডলার হবে না আপনার ওখানে, না? না, স্যার নেই অত টাকা। লুই, ঠিক আছে। দুঃখিত বিরক্ত করার জন্য–দেখি কিভাবে সাহায্য করা যায় মিঃ এটিংকে–লুইয়ের গলা পেলাম রিসিভার নামিয়ে রাখার মুহূর্তে হয়তো বলতে পারতেন, মিস ডোয়েরিং থাকলে মিস ডোয়েরিং, আমার দৃষ্টি চলে গেলো সামনে দেওয়ালের দিকে।

ডোয়েরিং রাইসনারের সেক্রেটারী? চাকরি থেকে বরখাস্ত করে ওকে ডেলা, হেমকে ডাকার জন্য। হাত টনটন করছে এখন রিসিভারটা এতো জোরে চেপে ধরেছি যে, জানেন কি সিন্দুকের ব্যাপারটা উনি? , শুনেছি তো জানেন বলেই উনিই তো টাকা বের করতেন রাইসনার সাহেব না থাকলে। কিন্তু এখন তো নেই তিনি, লুই, ও ঠিক আছে ছাড়ছি। লাইন ছেড়ে দিলাম প্রমাণ করার জন্য আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই এ ব্যাপারে। কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম লাইন ছেড়ে, তারপর সুপারভাইজারকে ডাকলাম ফোন তুলে, রিককা বলছি–ঠিকানা জানা আছেমিস ডোয়েরিংয়ের? মহিলাটি বললো লাইন ধরে রাখতে, অনন্ত সময় মনে হচ্ছে এক একটা মিনিট যেন। ২৪৭–সি কোরাল বুলেভার্ড গলা এলো সুপারভাইজারের। আছে ফোন? আছে স্যার। লিঙ্কন বীচ, ১৮৫৭৭। ধন্যবাদ, ছেড়ে দিলাম লাইন।

শুকোবার সময় নিলাম মুখের ঘাম। এবার নম্বর চাইলাম ডোয়েরিংয়ের, আমার পরিচিত হবার সুযোগ হয়নি এই মহিলাটির সঙ্গে, শুধু দুএকবার চোখাচোখি হয়েছে। রিং হলো,

লাইনে ভেসে এলো নারীকণ্ঠ, হ্যালো? মিস ডায়েরিং? হুঁ, কে বলছেন? রিককা, একটু দরকার আছে আপনার সঙ্গে। আসতে পারি মিনিট পনেরোর মধ্যে, আপত্তি আছে? ডোয়েরিং জিজ্ঞেস করলো একটু চুপ করে থেকেবলুন তো কি ব্যাপার? আপনাকে বিরক্ত করতে যাবো কেন আর ফোনে বলতে পারলে। আসবো? দরকার দেখা করা। মনে করেন যদি তাই। ছাড়ছি ধন্যবাদ। লিফটে হাজির হলাম দপ্তর থেকে বেরিয়ে।

লবি ছেড়ে গাড়ি বারান্দায় একতলায় নেমে। কথা বললো কে যেন–দেখালামই না লোকটাকে, সোজা চলেছি। বসলাম বুইকে চেপে সোজা গেটে। গেট খুলে গেলো আজ সঙ্গে সঙ্গেই। কাঁটা সত্তরের ঘরে তুলে দিলাম। সদর রাস্তায় পড়ে। নামলাম গাড়ি থামিয়ে ২৪৭-এর সামনে বাড়িটা অনেকগুলো ফ্ল্যাট নিয়ে। উঠে গেলাম সোজা পাঁচতলায় লিফটে করে। বারান্দা দিয়ে হেঁটে বেল টিপে দিলাম নম্বর আঁটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। খুলে গেলো দরজা মুহূর্তে–দরজা খুললো ডোয়েরিং, আসুন মিঃ রিককা। আসুন ভিতরে। একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকলাম ওর পেছন পেছন। একটা টেবিল আর রেডিও সেট দুটো আরাম কেদারা একটি সেটি। ওর পাশে সেটিতে বসলাম। দেখলাম দুজন দুজনকে, ভাবছি শুরু করবো কিভাবে। কথা বের করা শক্ত হবে না ওর কাছ থেকে। আমার মনে হলো, কিছু পেলেন কাজকর্ম? না, একটা দেবেন নাকি? ডোয়েরিং পা চাপালে পায়ের ওপর।

চোখে পড়লো হাঁটুর যে অনাবৃত অংশটুকু তাতে আকর্ষণের বস্তু হতে পারতো জিনির সঙ্গে পরিচয় না হলে।

কিন্তু তাকালাম না আজ। একটা সিন্দুক আছে রাইসনারের দপ্তরে, আমার দরকার সেটার সংযোগনম্বরগুলো। আপনি নাকি জানেন লুই বলেছিলো–কথাগুলোবলে দিলাম বিনা ভূমিকায় এক নিশ্বাসে। মিঃ রিককা সময় নষ্ট করতে আসেন নি আপনি নিশ্চয়? ভাবলেন কি করে সেটা বলে দেবো চাইবা মাত্র? আমি এসেছি আশা করে–আর জিজ্ঞেস করলেন না তো আপনি, কেন চাইছি–ভোয়েরিং একটা খোঁচা দিলো আমার বুকে সরু আঙুলে, আপনি এতো দেরি করলেন কেন আমি তো ভাবছিলাম। কারণ জানতাম যে আপনি আসবেন। আপনি মাথা চাপড়াবার লোক নন সিন্দুক সামনে রেখে, আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম। তো, করতে চান কিসিন্দুক ফাঁক করতে ডেলার মাথায় বাড়ি দিয়ে? তাহলে শুনুন ডেলা আমাকে কিছু টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো একটা কাজের বিনিময়ে, কিন্তু এখন শুরু করেছে অন্য কাহানী। ফুটে যাবো ভাবছি আমার প্রাপ্য টাকাগুলো নিয়ে। কিন্তু, ভাবলেন কি করে আমি আপনাকে সাহায্য করবো? ডোয়েরিং ভ্রূ নাচালো। বললামই তো ভেবে আসিনি করবেনই আমার দিকে একটু সরে এলো ডোয়েরিং, আহা কেন গো বলছো এত গাছাড়া কথা? সব বলবো। আমি বলবো। আমার শক্ত সমর্থ মানুষই পছন্দ বুঝলে?

ওর ঠোঁটে ঠোঁট নামিয়ে দিলাম আমিও তাল বুঝে। ও সরিয়ে দিলো আমাকে আলতো হাতে ঠেলে খানিক পরে। উম–মনে হচ্ছে ভালোই খেলতে পারবে একটু ধৈর্য ধরলে হাত চালিয়ে দিলাম চুলে। তাকালাম তাকের ঘড়িটার দিকে ঠোঁট থেকে রঞ্জনীর দাগ মুছে নিয়ে, পাঁচটা বেজে পাঁচ। কিছু নেই তাড়াহুড়োর, ওকে আশ্বাস দিলাম তবে পেতেই হবে টাকাটা আমাকে। ডোয়েরিং মুখে প্রলেপ দিলো পাউডারের, পালাতে পারবে টাকাটা নিয়ে? চেষ্টা করবো কি করে? হাঁটা দেবে বান্ডিলগুলো বগলের তলায় ফেলে। গাড়িতে করে বেরোবো স্যুটকেসে ফেলে। বাড়িয়ে দিলো বুড়ো আঙুল জানলার দিকে, তার চেয়ে

অনেক নিরাপদ ওই পাঁচতলার জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়াও–আঃ, ছাড়ো তো মজা, তুমি কত চাও? মনে হচ্ছে কি সেরকম ক্ষ্যাপা আমাকে? না। আমি ছোঁবো না ও টাকা–ডোয়েরিং হাসলো শব্দ করে।

মোট পঁচিশ মিনিট সময় গেলো ক্যাসিনোয় ফিরতে। ডেলা ফিরেছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম গেটের সবুজ চোখো পাহারাদারটাকে। বুঝলাম তাতে ফেরেনি লোকটা বিড়বিড়িয়ে যা বললো। ক্যাসিনোর পেছন দিকে চলে গেলাম দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে। মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে আমার দপ্তরটা। দেয়াল ঘেরা বাগান পেছনে শুধু। তাকালাম আশেপাশে নেই কেউ কোথাও। নীচে স্যুটকেসটা রাখলাম জানলা বরাবর। ক্যাসিনোর গাড়িবারান্দায় নিয়ে এলাম গাড়িতে ফিরে সেটা চালিয়ে। ওপরে উঠতে লাগলাম একসঙ্গে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে। কথা বলার চেষ্টা করলো পথে পরিচিত অনেকে, সবাইকে এড়িয়ে গেলাম মুখে হাসির ভাব রেখে। ডেলা ক্রমে সবই জানবে স্যুটকেসের কথা ছাড়া। শুধু জানবে আমার সঙ্গে ছিলো একটা ব্রাউন পেপারের মোড়ক। খিল তুলে দিলাম ঘরে ঢুকে। আংটা নামিয়ে দিলাম জানলার কাছে গিয়ে বাঁধা শক্ত দড়িতে। আংটা গাঁথলে প্রথমবারেই স্যুটকেসে। সেটাকে টেনে তুললাম হড় হড় করে। নষ্ট করা চলবে না একটা মুহূর্তও। সিন্দুকের কাজ শুরু করে দিলাম সংযোগের সংখ্যাগুলো নিয়ে।

ঘড়িতে ছটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। ঘোরানো হলো শেষ সংখ্যাটাও–অপেক্ষা করলাম নিশ্বাস বন্ধ করে। তারপর সিন্দুকের দরজা খুলে গেলো হাতল ধরে টানতেই। তাকালাম একটু পিছিয়ে গিয়ে। শুধু ব্যান্ডিলের সারি দুটো তাক ভরে...বাণ্ডিল! এক শো ডলারের বাণ্ডিলগুলো ভরতে শুরু করে দিলাম স্যুটকেস খুলে সন্তর্পণে। স্যুটকেস ভরে গেলো

আড়াইশো টা বান্ডিলে...সব আমারই। আরো অনেক টাকা সিন্দুকে...কিন্তু আমার তো না ও টাকা।

বন্ধ করে দিলাম সিন্দুক। তিনখানা নোট বের করে রাখলাম স্যুটকেসে তালা মারার আগে। জুতোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম নোটগুলো ভাজ করে। সেটা পকেটে ফেলে দিলাম স্যুটকেসে চাবি মেরে। ভালো করে টেনে দিলাম সিন্দুকের দরজাটা, ঠিক আছে। একবার ঘষে দিলাম সিন্দুকের হাতলটা রুমাল দিয়ে। উঠে দাঁড়ালাম–ঘামে ভিজে গেছে, সারা পিঠ, ভিজে ন্যাকড়া শার্টের কলার। স্যুটকেসটা ফেলে দিলাম জানলার কাছে গিয়ে বাইরে একবার তাকিয়ে। নীচে দড়ি ধরে নেমে গেলাম জানলার খাঁজে কাঁটা আটকে দিয়ে। মাটিতে পা দিয়ে কাটা শুদ্ধ খুলে গেলো দড়িটা বার কয়েক ঝাঁকাতে। সেটা ফেলে দিলাম দড়ি পেঁচিয়ে ঝোঁপের মধ্যে। দ্রুতপায়ে মাঠ পেরিয়ে গেলাম স্যুটকেস হাতে নিয়ে। ট্রাক চালক তার হাত ঝেড়ে মাল তোলার কাজ শেষ করে যাত্রার প্রস্তুতি নেবার মুহূর্তে হাজির হলাম। ওর সামনে নামিয়ে দিলাম স্যুটকেস পৌঁছে গেলাম ঠিক সময়ই।

ভায়া! বললাম হাঁফাতে হাঁফাতে। আমাকে একবার মাপলো লোকটা আপাদমস্তক। সে উদাসীন হাসি ফোঁটালো মুখে একটা, পাঠাচ্ছেন কোথায়? বলছি ভাই দিতে পারো একটা লেবেল। লেবেল পেলাম। সব লিখে দিলাম পরিষ্কার করে : জন ফারার মিবোর্ড এয়ারলাইন রেলওয়ে। গ্রেটার মিয়ামি। চালক স্যুটকেসে সেঁটে দিলো চিরকুটে চোখ বুলিয়ে। চালকের আসনে উঠে গেলো আমাকে একটা রসিদ ধরিয়ে দিয়ে। এটা রাখো, দুঃখিত তোমাকে আটকাবার জন্য। ব্যাটা প্রায় ভিরমি খায় আর কি দশ ডলারের নোটখানা হাতে নিয়ে, স্যার আমি পৌঁছে দেবো ঠিকঠিক আপনার জন্য অপেক্ষা করবো– হেলিয়ে দিলাম মাথাটা মৃদু হেসে। দেখলাম দাঁড়িয়ে অপসৃয়মান গাড়িটা। চলে গেলো

এতগুলো টাকা, আমি নেই তার ধারে কাছেও। মাথা আছে ডোয়েরিং মেয়েটার। দেখবার লোভ সামলাতে পারতো না সুটকেসটা দেখা মাত্র তার ভিতর কি আছে পাহারাদার দুটো–ওই সবুজে চোখোটা বিশেষ করে। টুপির লাইনিংয়ে ঢুকিয়ে দিলাম রসিদটা একটা সরু ফিতেয় মুড়ে। আড়াই লক্ষ ডলার এই ছোট্ট কাগজটার দাম।

কাজ এগিয়ে চলেছে আশাতীত ভাবে বেরিয়ে গেলো টাকা। এবার বেরোতে হবে আমাকেও। ৪৫ কোল্ট অটোমেটিকের কথা মনে পড়লো, টেবিলের ড্রয়ারে রাখা, নিতে হবে ওটা সঙ্গে। ক্যাসিনোর দপ্তরে পৌঁছলাম মিনিট দুয়েকের মধ্যে, ঘরে ঢুকতেই থমকে গেলাম দরজা ঠেলে। আমার টেবিলের পাশে বসে ডেলা আর রিককা আমার বন্দুকটা রিককার হাতে তাক করা আমার দিকেই...জনি এসো কানে এলো ডেলার কিশোরী কণ্ঠস্বর। দামী কার্পেটের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে গেলাম দরজা ভেজিয়ে দিয়ে। ফিরে আসার জন্য অভিশাপ দিলাম মনে মনে নিজেকে। ডেলা বলে উঠলো টেবিলের দিকে এগোতেই, তোমার আর বসা চলবেনা ওখানে;পরিচয় করিয়ে দিই আমার নতুন অংশীদারের সঙ্গে। সে রিককাকে দেখিয়ে দিলো পেলব হাতবাড়িয়ে।

হু, জমেছে, দেখছি নাটক বেশ–তা, এটা খেললো কার বুদ্ধিতে? তোমার না রিককা সাহেবের? আর আমার দিকেই বা উচিয়ে রেখেছে কেন বন্দুকের নলটা? কারুরই নয় বুদ্ধিটা আমাদের বলতে পারো জর্জিয়ার! ব্যবস্থা করে দিয়েছে সেই তোমারধীরে আস্তে সিগারেট ধরালাম প্যাকেট বের করে, উঠে এলো হাতে স্যুটকেসের চাবিটাও।

আমার হাঁড়ির খবর নিতে বেরিয়েছিলো ডেলা। তবু বললাম, এ সব মজা না মারলেই কি নয় রিককার সামনে? মনে হয় না এটা ভালো লাগছে ওর কাছে–হাসির জোয়ার বইলো

রিককার ভোতা মুখে হা-হা, ডেলা তো গুলি করতে বলেছিলো তোমাকে দেখামাত্র, অনেক কষ্টে বুঝিয়ে আমি-তাহলে দোস্ত এখানে তুমিই থাকো-নির্বিকার ভাব দেখাবার চেষ্টা করলাম সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে। চোখ দুটোকে বিস্ফারিত করলো ডেলা সামনে ঝুঁকে, তুমি একথা অস্বীকার করতে পার ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্ডে ফ্ল্যাট নিয়েছো? আর লদকালদকি করছো ওই মাগীটার সঙ্গে, সেটা? না। করি না। তো, এ ব্যাপারে কি করতে চাও? বললাম শান্তকণ্ঠে। ডেলা গুম হয়ে গেলো চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে। চুপচাপ আমরাও।

শেষে বলে উঠলো রিককা, তাহলে চলে যাওয়া যাক নাটকের শেষ দৃশ্যে-দরকার কি বৃথা সময় নষ্ট করার একে নিয়ে-ফেটে পড়বে ডেলা এবার ভেবেছিলাম। কিন্তু ওর আশ্চর্য নিয়ন্ত্রিত গলা পেলাম। হ্যাঁ, তাই যাবো। জনি সাবধান করেছি তো বারবার তোমাকে-চলবেনা মেয়েবাজি। পরিষ্কার মনে আছে আমার কি বলেছিলে-আশ্চর্য শান্ত আমার গলাও। তাহলে তোমাকে ভোগ করতে হবে তার ফলও-তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি এখান থেকে। তোমাকে ফিরে যেতে হবে নামহীন তৃতীয় শ্রেণীর মুস্টিকের জীবনে কেমন বুঝছো? বাঁচলাম। ভেবেছিলাম গালে স্পর্শ পড়বে ডেলার হাতের। তাকিয়ে নিলাম আড়চোখে সিন্দুকটার দিকে। এরা এখনো পায় নি মাল গ্যাড়ানোর। খবর। দাঁড়াও, সমাধান করে ফেললে তো হবেনা এত সহজে ব্যাপারটার কিছু টাকা পাবো আমি কথা ছিলো-সেটা চাই- ডেলা আমার দিকে তাকালো চোখে একরাশ ঘৃণা নিয়ে। একটা চুক্তি হয়েছিলো অলিখিত আমাদের মধ্যে মনে আছে, তোমার জীবনে অন্য কোনো নারী থাকবে না? বেইমানী করেছ তুমি-তোমার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। দ্যাখো এখন ওই টাকার উপযুক্ত কি না তোমার প্রেয়সী।

উঠে দাঁড়ালাম সারামুখে ক্ষিপ্ততার মুখোশ নিয়ে। রিককা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোসো! বসলাম, দিতে চাও, দাও আমাকে তাড়িয়ে–কিন্তু আমার চাই টাকাটা! তোমাকে বেরোতে হবে এক কাপড়ে কপর্দকহীন অবস্থায় বলা আছে গেটে ওদের–কেড়ে রাখবে সঙ্গে ঝুলি থাকলেও। হেঁটে যাবে। রাস্তা সোজা। তোমার তো আছেই হাঁটার অভ্যেস। পদযাত্রা শুরু করো–তুমি পার পাবেনা শেষ করলামনাকথা। আমার সর্বশরীর কাঁপছেরাগে। অভিনয় করছি মারাত্মক। রিককাও উঠে দাঁড়ালো আশঙ্কা করে ডেলার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি–আরো কাছে সরে এলো বন্দুকের নলটা। সব টেবিলে রাখো পকেটে যা আছে! ফতোয়া জারী করলো ডেলা। দ্যাখো চেষ্টা করেই–দেখি হিম্মত কেমন তোমাদের যেতে হবে না অতদূর–পায়ে গুলি করবো ও যা বলছেতাই করনাহলে। শেষে বেরোতে হবে হামাগুড়ি দিয়ে–মনে পড়লো একশো ডলারের নোট তিনটের কথা জুতোর মধ্যে, পকেট দুটো উল্টে দিলাম মুখটা অবিকৃত রাখার চেষ্টা করে, দেখে নেবো তোমাকেও–বললাম রিককার উদ্দেশ্যে। ঠোঁটের ফাঁকে রিককা হাসলো। শেষ হলো তল্লাশী। নিশ্চিন্ত হলাম চাবিগুলো চেয়ারে পড়ে থাকায় নইলে হারামজাদীটার ওগুলো দেখলেই মনে পড়ে যেতো সিন্দুকের কথা। অস্বস্তি বাড়াচ্ছে টুপির মধ্যে রসিদটাও। ঠিক আছে, এবার যেতে পারো তুমি। ডেলা কুৎসিত হাসি ফোঁটালো মুখে একটা। সরে পড় তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়েছি বেনো আর পেপিকে, এসে পড়লো বলে ওরা। গাড্ডায় পড়লে আবার, মুণ্ডু চিবোবে ওরা তোমার প্রিয়তম

লুই দরজা ঠেলে ঢুকলো আমি কিছু বলার আগেই। রিককা ওকে দেখে পেছনে লুকিয়ে ফেললো বন্দুকটা। কি চাই? ঢোকা যায় না দরজায় সাড়া দিয়ে? কৈফিয়ৎ তলব করলো ডেলা। ভয় ফুটে উঠলো লুইয়ের চোখেমুখে মিঃ রিককা একা আছেন আমি ভেবেছিলাম–উনি একা নেই দেখছেই তো, কি চাই কি? মেরে গেলাম ঠাণ্ডা। জানি কেন এসেছে লুই।

জানতে এসেছে আমি খুলতে পেরেছি কিনা সিন্দুক। লুই কথা বলো তুমি চলে যাচ্ছি আমি। তোমার নতুন মনিব ওই মোটা লোটা ডেলা চেঁচিয়ে উঠলো দরজা খোলার মুহূর্তে ওর পাশ কাটিয়ে, দাঁড়াও। আর দাঁড়িয়েছে! এখুনি তত বেড়াল বেরিয়ে পড়বে ঝোলা থেকে। সরে যেতে হবে। নষ্ট করা যাবে না মুহূর্ত। বুইকে চড়ে বসলাম দ্রুতপায়ে বেরিয়ে। গাড়ি ছিটকে এগোলো। নামিয়ে দিলাম গাড়ির কাঁচ। যখন আমি গেটের কাছাকাছি–ষাটের ঘর ছুঁয়েছে কাঁটা। সেই পাহারাদার দুটোই গেটে, বন্দুক সবুজ চোখোর হাতে। ওরা নিশ্চয় নির্দেশ পেয়ে গেছে আমাকে থামাবার কিন্তু থামা তো চলবে না আমার। মজবুদ, বড় গেট দুটো, আছে অসুবিধেও–সেটা একটা তালাতেই বন্ধ হয় আর বাইরের দিকে খোলে।

জানি ওরা আমাকে রুখবার চেষ্টা করবে না গাড়ির এই গতিতে, করলোও না। ক্ষিপ্র পায়ে সরে দাঁড়ালো ওদের ওপর পড়ার মুহূর্তেনীচের দিকে মাথাটা নামিয়ে দিলাম শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে। গাড়ি সামনের লোহার পাত গেটে আছড়ে পড়লো। গাড়ি টলে উঠলো, গাড়ি সোজা করলাম অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিয়ে। আওয়াজ হলো বন্দুকের–কিন্তু বেপরোয়া আমি গাড়ি রাস্তায় পড়লো। আশীর ঘরে এক লাফে উঠলো স্পিডোমিটারেরকাটা। এবার ওরা নড়াচড়া করুক। মিয়ামি হাইওয়ের বাঁক পেলাম মাইল দুয়েক চালিয়ে। কমাতে হলো গতি, তা হোক। কমিনিট সময় লাগবে ওদের বেরোতেও। আর, এ রাস্তায় ওরা জোরে গাড়ি চালাতে পারবে না আমার চেয়ে। হারাতে পেরেছি ডেলাকে–গান গাইতে ইচ্ছে করছেআমার চেঁচিয়ে। বেরোতেও পেরেছি। টাকা পেয়েছি। ও চালু, আমি আরো চালু...আমি কিউবা পৌঁছে যাবো ও কাজ শুরু করার আগে। আমার মনটা ঘুড়ির মতো উড়ছে। রাস্তা পাল্টালাম মাইল পঞ্চাশেক টেনে গাড়ি চালাবার পর। গাড়িটা বুইক কাজেই নজরে পড়বে দূর থেকে। সে ভয় কম এ রাস্তায়। ভরতে হবে

গাড়িতে তেলও। মনে পড়লো জিনির কথা–সে রয়েছে মিয়ামিতে এক বান্ধবীর সঙ্গে। টেলিফোন নম্বরটাও আছে। ওকে ডাকবো পরের পাম্পে গাড়ি থামিয়ে।

নিয়ে নেবো তেলটা করে ফেলতে হবে প্লেনের ব্যবস্থাটা আজ রাতেই। জিনিকে রাজি করাতে হবে আমার সঙ্গে কিউবা যেতে পেট্রোল পাম্পে হাজির হলাম আরও মাইল দুয়েক চালাবার পর। বেরিয়ে এলো এক ছাগল দাড়ি বৃদ্ধ গাড়ি থামাতে। ভরে দাও–আর, তোমাদের টেলিফোন আছে? আছে স্যার, ভেতরে। বৃদ্ধ বাড়িয়ে দিলো আঙুল। মনে পড়ে গেলো জুতোর মধ্যে লুকানো টাকাগুলোর কথা। সেগুলো বের করে নিলাম, আমার কাছে নোট নেই–ভাঙানো যাবে এটা? যাবে স্যার। ফোন করুন আপনি, ভাঙিয়ে দিচ্ছি আমি–নিভে এসেছে দিনের আলো। ডায়াল করলাম জিনির নম্বর। প্রায়নটা ঘড়িতে। বাইরে তেল ভরছে ছাগল দাড়ি। টেবিলে পড়ে ক্যামেল সিগারেটের প্যাকেট। ধরালাম একটা তুলে নিয়ে। হ্যালো? ভেসে এলো চাপা কণ্ঠ। জিনির গলা নয়। আছে মিস ল্যাভেরিক না, বেরিয়েছে ফিরবে এখুনি–মনে মনে খিস্তি দিলাম, ঠিক আছে, ফোন করছি আমি পরে।

ছেড়ে দিলাম। তাকালাম বাইরে প্রায় শেষ বৃদ্ধের তেল ভরার কাজ। হাত তুলে জানালো চোখে চোখ পড়তেই, স্যার হয়ে গেছে। ফোন করতে হবে আবার চেঞ্জটা দেখি। ভাঙানো হলো নোট। সিগারেটও কিনলাম এক প্যাকেট। জিনিকে পেলাম মিনিট এগারো পরে, জনি? সোনা, কি খবর? জিনি শোনো, সুখবর আছে–আমি পেয়ে গেছি কাজটা হা–খবরটা এলো এইমাত্র...কাজ শুরু হবে কাল থেকে হাভানাতে। হাভানার প্লেন ভাড়া করে ফেলল এয়ারপোর্টে যোগাযোগ করে–হ্যাঁ, বেরিয়ে পড়তে হবে ঘন্টাচারেকের মধ্যেই...সঙ্গে তুমিও নিশ্চয়ই যাচ্ছো? ভাড়া করবো প্লেন? জিনি হাসলো, আরে, মেলা টাকা লাগে তাতে

যেলটারীর টিকিট ফিকিট কিছু..আহা, ভাবতে হবে না টাকার কথা...এখন অনেক টাকা আমার কাছে...জিনি যাবে তো আমার সঙ্গে তুমি? আজ রাতেই? কিন্তু অনেক কিছু তো আছে গোছগাছ করার–হা, করা শক্ত, কিন্তু আমাকে একাই যেতে হবে তোমাকে সঙ্গে না পেলে জনি বোলো না ওরকম করে, –গুছিয়ে নিচ্ছি আমি। লক্ষ্মীমেয়ে, আমরা বিয়ে করছি পৌঁছেই। কেমন, আমি আসছি? নামিয়ে দিলাম রিসিভার।

সেখানে আর এক নাটক বাইরে বেরোতেই–বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে কাঁপছে মাথার ওপর হাত তুলে...আমার থেমে গেলো হৃৎস্পন্দন–আলো আঁধারিতে নজরে পড়লো ডেলার ছায়া শরীর, ওর হাতে বন্দুক–সেই বীভৎসহাসি ঠোঁটে, জনি কি খবর? বুঝলাম এক নজর তাকিয়েই ওর চোখের দিকে।

আমার লাশ পড়বে এক পা নড়লেই। ওঠো গাড়িতে বেড়াতে বেরোবো দুজনে একটু। করলাম না দ্বিধা, করলে অবধারিত মৃত্যু। চড়ে বসলাম বুইকের স্টিয়ারিংয়ে পেছনে বসলো ডেলা, জলদি মিয়ামি চলল! গাড়ি চালিয়ে দিলাম গিয়ার পাল্টে স্টার্টারে পা দিয়ে। গৌরাঙ্গ স্ট্যাচু বৃদ্ধ তখনো। ডেলা মুখ খুললো মাইল খানিক রানীরবতায় কাটিয়ে। কোথায় টাকাটা? ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি গাড়ির আলোয় মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চাঁদের আলোর মত। সেই দৃষ্টি চোখে–জীবনে খুঁজে পাবে না তুমি সে জায়গা–পাবো মিয়ামিতে অপেক্ষা করছে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পেপিআর বেনো। তোমাকে কথা বলাবেওরাইখুন করবে–তারপর। তোমার ভালোই লাগবে মরতে। গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি নিঃশব্দে–কিছুই বলার নেই, ভাবনা আছে, শুধু ভাবনা। ভেবেছিলে বিয়ে করতে পারবে ওই মেয়েমানুষটাকে। তাই না? ডেলা বিষোদগার করলো, ওকেও তুলবো পেপি আর বেনোকে তোলার পর...তোমার মুখও খুলবে চাঙড়া দুটো ওর ওপর কাজ শুরু করলেই।

মজা টের পাওয়াবো হাড়ে হাড়ে। সরল হয়ে গেলো ব্যাপারটা–তাহলে বিমান বন্দরের কথা শুনেছে ডেলা আমার শুরু হয়ে গেলো অন্য ভাবনাগরান গাছের ঝোঁপ রাস্তার দুপাশে...জিনি বিদায়–উচ্চারণ করলাম কথাগুলো মনে মনে।

একমাত্র একটাই রাস্তা...কল্পনায় ভেসে উঠলো জিনির মুখটা, চোখ দুটো বড় টলটলে, ওর চুলের গোছা তামাটে... স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিলাম প্রচণ্ড বেগে...চাপ দিলাম অ্যাকসিলারেটারে সর্বশক্তি দিয়ে গাড়ি লাফিয়ে উঠলো...জানি না কোনদিকে চলেছি আয়নায় চোখ...মুখ দেখছি ডেলার আবার আওড়ালাম মনে মনে, নাও, এবার গুলি করো–এইযদি শেষ পর্ব হয় আমার জীবনে। তাহলে আমার সঙ্গে তুমিও আছে। চলবে না তোমার নোংরা থাবার স্পর্শ জিনির শরীরে–মৃত্যু ভয়ের ছায়া ডেলার চোখে আর্তনাদ উঠলো একটা বিলাপের তীক্ষ্ণগলায়। দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললো বন্দুকটা কোলে ফেলে দিয়ে। গাড়িটা ধাক্কা লাগলো একটা গাছে, আর একটা গাছে সেখান থেকে পিছলে। আঁকড়ে আছি আমি স্টিয়ারিং আর দেখতে পাচ্ছি না ডেলার মুখটা...উল্টে গেলো আস্তে গাড়িটা। হবার যা হলো...ভয় নেই আর–ভাবলাম শুধু ভাবছি জিনির কথা এমন সময় কি যেন পড়লো প্রচণ্ড শব্দে মাথার ওপর...শুধু কানে আসছে শব্দগুলোকথা বব শালা টেনেদাঁড় করিয়ে দিলো আমার কোটের কোণ ধরে একটা শক্ত হাত। চোখ খুলতে পারলাম কষ্ট করে সামনে ভেসে উঠলো বেনোর মাংসল মুখটা। ঘুষি মারতে গেলাম হাত উঠিয়ে। উঠলোনা হাত। আমার মুখে মারলো হাতের উল্টো পিঠে বেনো একটা খিস্তি দিয়ে। পড়ে গেলাম বিছানার ওপর। হারিয়ে ফেলেছি চৈতন্য। একটা গম্ভীর গলা পেলাম তার মধ্যেই। উল্লুক কোথাকার, মেরো না ওভাবে! কথা বের করতে হবে ওর কাছ থেকে–কথা ঢুকলো কিনা কে জানে বেনোর কানে, আবার পেলাম ওর বিষটালা গলা

কথা বল আই শালা ছিঁড়ে ফেলবো কান নাহলে–চারদিকে তাকালাম চোখ খুলে, পড়ে আছি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নিজের ফ্ল্যাটে ফ্র্যাঙ্কনিল বুলেভার্ডে।

বিছানায় বসে বেনো। রিককা দাঁড়িয়ে পায়ের কাছে। পড়ে রইলাম অনেকক্ষণ হতবুদ্ধি...সব। হয়ে যাচ্ছে এলোমেলো ক্রমে মনে পড়ছে জিনির কথা–সে এই ফ্ল্যাটেই আছে কি? ওর চোখে ভয়ের প্রতিফলন দেখেছিলাম দরজা খোলার সময়।

কোথায় ও? প্রশ্ন করলাম ক্ষীণকণ্ঠে। দাঁত বের করে রিককা হাসলো, আছে, আছে পাশের ঘরেই। জনি খেলতে পারলে না খেলাটা জমিয়ে–আমার দরকার ছিলো মেয়েটাকেও। আর, আমাকে সোজা এনে ফেললে সেখানে। চেষ্টা করলাম হাত মুক্ত করতে, কিন্তু কবজিতে আরো এঁটে বসলো দড়িটা। বেনোর দিকে ফিরলো রিককা, নিয়ে এসো এখানে মেয়েটাকে। শুরু করতে হবেকাজ, বেরিয়ে গেলো বেনো। রিককাআমার দিকে তাকিয়ে রইলো তার সাপের চোখে। জিনিকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে একটু পরেই বেনো ঢুকলো বাঁধা ওরমুখ। পেছনে বাঁধা হাত দুটো। বিস্ফারিত চোখে তাকালো জিনি আমার দিকে। আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম হাতের বাঁধন ছাড়াবার, কি করেছে ওরা তোমার? রিককার কাছ থেকে উত্তর এলো, এখনো করা হয়নি তেমন কিছু।

কিন্তু করতে হবে তুমি মুখ না খুললে–চেঁচিয়ে উঠলাম ক্ষিপ্তের মত। ছেড়ে দাও ওকে বলছি সব। ছেড়ে দাও ওকে-এরমধ্যেও নেই। আমাকে পাগল করেছেজিনিরঅবস্থা। মেদবহুল শরীরটা ছেড়ে দিলো রিককা একটা চেয়ারে। ব্যাপারটা সেই সময় আমার হাতে ছিলো, যখন প্রথম তোমাকে সুযোগ দিই আমি। এখন, সব চলে গেছে আমার হাতের বাইরে। দাবি করেছে পেটেল্লি তোমাকে।

টাকাটা চাই আমি শুধু তার হাতে তুলে দেবো তোমাকে মাল পেয়েই। রিককা তার মোটা ঠোঁটটা টানলো হাত দিয়ে, ভেবে দুঃখ পাচ্ছি ওর হাতে তুলে দিতে হবে। তোমার সঙ্গে ওই মহিলাটিকেও। সুবিধে হবে না তাতে বিশেষ। ছেড়ে দাও ওকে, নইলে সেখানেই থাকবে টাকাটা যেখানে আছে–তোমার বাপও খুঁজে পাবে না তা আর তা এমন জায়গায় আছে তোমাকে কথা বলাবার অস্ত্র আছে আমার হাতে। কি বললাম শুনলেই তো ছেড়ে দাও ওকে, নয়তে ছাড়তে হবে টাকার আশা–রিককা একটা ভঙ্গি করলো তার থলথলে কাঁধের উপায় নেই–সব কিছু চলে গেছে আমার আওতার বাইরে। জেনে ফেলেছে অনেক কিছু মেয়েটা। ব্যবস্থা করছে বেনো তোমার–বাদ যাবে না। মেয়েটা–

বরফ মেরে গেলাম। ভয়াবহ ইঙ্গিত রিককার চোখে। শুধু বলতে পারলাম কোনো রকমে। কথা দিচ্ছি আমি খুলবে না ও মুখ।

ছেড়ে দাও ওকে। আড়মোড়া ভাঙলো রিককা। দাঁড়াও বলে নিই একটা কথা–তোমাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি যখন আমার দায়িত্বে রয়েছে এ ব্যাপারটার সবই; হয় শারীরিক কার্যকলাপ চালাতে হবে ওর ওপর তোমাকে কথা বলাতে, নয়তো বুলেটের গুলি তোমার মাথায়, তোমার কোনটা পছন্দ? বলল, বলে ফেলো তাড়াতাড়ি। অধৈর্য হয়ে পড়ছে বেনো। বেনো টান মারলো জিনির ছেঁড়া স্কার্ট ধরে...নেমে এলো জামাটা..বুঝলাম নিস্তার নেই আমার তবু, ওর মৃত্যু কামনাই শ্রেয় মনে হলো আমার বেনোর হাতে ওর শ্লীলতাহানির চেয়ে। আচ্ছা, সব বলছি আমি ওকে বারণ কর জিনির গায়ে হাত দিতে–তাকাতে পারছি না জিনির চোখে। হাতে হাত ঘষলো রিককা আহ্বাদে। এইতো দেখছি পথে এসেছে–সোনার চাঁদ বলতো টাকাটা কোথায় রেখেছে?

মিয়ামি সেফ ডিপোজিট ভল্টে।

হু, করেছে দেখছি বিবেচনার কাজই, চলে গেলো মনটা ভল্টে। ২২ বোরের বন্দুকটা রয়েছে স্যুটকেসে! সারা শরীরে উত্তেজনার একটা তরঙ্গ বয়ে গেলো–রিষ্কার ব্যবস্থা করতে হবে ওই বন্দুকটা দিয়ে।

লিখে দাও একটা চিঠি ওদের, যে–রিককা থেমে গেলো আমার নেতিবাচক ঘাড় হেলানোয়। অত বুদ্ধু ভাবলে কি করে আমাকে–টাকাটা বের করতে পারছেনা আমি সঙ্গে না থাকলে। আমার নির্দেশ ঢুকতে পারবেনা ভল্টে অন্য কেউ। কি ভাবলো রিককা মাথা নীচু করে, তারপর বেনোকে ইশারা করলো মাথা তুলে, আরে নিয়ে যাও মেয়েটাকে আসছে না কেন পেপিটা? সে জানে না আমরা এখানে কতবার বলতে হবে একথাটা। তাকে বের করো খুঁজে। দরকার আছে। যেখানে আছে থাকনা–নিজেই সারাবার চেষ্টা করো এ ব্যাপারটা–তোমাকে যেতে বললাম ওকে নিয়ে। রিককা কানে নিলোনা বেনোর কথা। বেনো প্রায় দরজার কাছে ঠেলে নিয়ে গেলো জিনিকে একটা প্রচণ্ড গুতো দিলো হাঁটু দিয়ে ওর নিতম্বে। জিনি বাইরে পড়লো মুখ থুবড়ে। যদি তোমাকে হাতে পাই আমি কখনো। আন্দোলিত করলাম দড়ি বাঁধা হাতটা বেনোর দিকে।

সেঁতো হাসি হাসলো রিককা, বেরাদার তোমারই তো দোষ, নারীর মর্যাদা আশা করা বৃথা বেনোর মত একটা জানোয়ারের কাছে; তোমার উচিত ছিলো বোঝা, শয়তানটা তাকালো দরজার দিকে মুখটা বিকৃত করে। বেনোর ওপরই পড়বে তোমার দায়িত্ব কাটা বের করার পর। তাড়াতাড়িই সারতে পারে কাজগুলো ও শালা। তবে তোমার কাছে ঋণী

থেকে গেলাম আমি একটা ব্যাপারে, আমি তোমার কাজে কৃতজ্ঞ, ডেলা মাগীটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। আমি এখন ক্যাসিনোর মালিক। রিককার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম বলে চললো রিককা, আর শোনো–পিয়াজীকরার কোনো চেষ্টা করোনা ভল্টে ঢুকে, বুঝলে? ক্যাসিনোর সম্পত্তি টাকাটা। আমার কাছে প্রমাণও আছে। আমার সঙ্গে হেমও আছে। চলে গেলে পাশের ঘরে গলাও পেলাম বেনোর সঙ্গে শলাপরামর্শের। চেষ্টা করতে লাগলাম হাত দুটো মুক্ত করার, কিন্তু রিককা ফিরে এলো তার মধ্যেই, বলে এলাম বেনোকে মেয়েটার ব্যবস্থা করবে আমি সময় মত না ফিরলে, কাজেই চলবে না ঝুটঝামেলা।

রিককা খুলে দিলো আমার পায়ের বাঁধন, নাও চলো–বেনোকে দেখতে পেলাম দরজার দিকে মুখ ফেরাতেই, ভোতা মুখো অটোমেটিক হাতে ধরে আছে আমার দিকেই। রিককা ক্রমে পকেট থেকে তার বন্দুক বের করলো আমার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে। আমি শুরু করলাম হাঁটতে।

আমার পেছনে রিককা। নীচে এলাম সিঁড়ি দিয়ে। বাইরে দাঁড়িয়ে গাঢ় নীল প্যাকার্ডটা। চালাও তুমি, পেছনেবসছি আমি। দরকার কাজটা তাড়াতাড়ি। কে জানে কতক্ষণ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে বেনো শালা, খাসা মেয়েটা তো। রিককা সেঁতো হাসি হাসলো। গাড়ি চালিয়ে গেলাম সারাটা রাস্তা মুখ বুজে। বেশ কিছুটা সময় লেগে গেলো। পৌঁছতেই ছুটে এলো পাহারাদার। জমা দিয়ে গেছি একটা স্যুটকেস আজ সকালে...এসেছি সেটা নিতে...জানেনই তো সব আপনি গেলেই হবে মিঃ ইভশ্যামের কাছে। শুরু করলাম চলতে। পায়ে পায়ে রিককা। ইভশ্যাম বিস্মিত হলো আমাদের দেখে, কিন্তু তার কোনো পরিবর্তন ঘটলো না মুখভাবের। অভিবাদন করলো সামান্য ঝুঁকে।

হঠাৎ বাইরে থেকে এসে পড়েছেন আমার অংশীদার, দেখিয়ে দিলাম রিককাকে, দিন দুয়েকের জন্য দরকার সুটকেসটা। নিশ্চয় স্যার, আপনাদের সঙ্গে ওপরে যাবো কি আমি? হবে না তার দরকার, চিনে গেছি আমি তো। রসিদ করে রাখছি আমি, এলেই পাবেন। ধন্যবাদ। আমরা এগিয়ে গেলাম লিফটের দিকে। পাঁচ তলায় উঠতে লাগলো লিফট।

ভালোই তো এখানকার ব্যবসাপত্তর। বলে উঠলো শুয়োরের বাচ্চাটা, চালু করলে মন্দ হয় না ক্যাসিনোতে এরকম একটা কিছু। নিরুত্তর আমি। বেরিয়ে এগোলাম লিফট থামলে, রিককা চলেছেগা সেঁটে। এগিয়ে এলো পাহারার লোক। চাবিটা দেখি ছেচল্লিশনম্বরের। লোকটা একমুহূর্ত তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, নিয়ে এলো পরে চাবিটা। আমরা দাঁড়ালাম ছেচল্লিশনম্বরের সামনে। টাকাটা পাওয়া তো অসম্ভব হতো তোমার সাহায্য ছাড়া, জনি, তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান লোক। ঘরে ঢুকলাম দরজা ঠেলে। বাঃ ঘরটা তোবড়ো। উঁকি দিলো ঘরে রিককা, অপেক্ষা করছি আমি বাইরে। বার করে আনো টাকাটা। কিন্তু ওকে তো বন্ধ ঘরে চাই আমি। সিন্দুক খুলবে না দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাইরেই থাকো তাহলে। রিককা সন্তর্পণে বন্দুকটা পকেট থেকে বের করলো বারান্দার দুপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে।

ভেতরে যেতে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমারও চোখে চোখে রাখা দরকার তোমাকে। কিন্তু জনি সাবধান–চেষ্টা করলে কোনোরকম ফল্স দেবার। আমার হাত একটুও কাপবে না এই নোংরা লোকটাকে খুন করতে। এই কীটটার জীবনের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান আমার আর জিনির জীবন। আর এই ইস্পাত মোড়া ঘরের বাইরে যাবে না ২২ বোরের

গুলির শব্দ। বানান করে ঘোরাতে লাগলাম সংযোগের অক্ষরগুলো সিন্দুকের সামনে ঝুঁকে। সশব্দে দরজা খুলে গেলো শেষ অক্ষরটির সঙ্গে সঙ্গেই...শান্ত আমি...শুধু ভাবছি জিনি আর বেনোর কথা...চলবে না এতটুকু ভুল করা। দাঁড়াও সরে একটু ছবি তোলার একটা ব্যাপার আছেসিন্দুকের ভেতর স্বয়ংক্রিয়। দেখছি সব কিছুই ভেবে রেখেছে এশালারা তোত। সন্দেহের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া নেই রিককার গলায়, এখানেই আছে কি টাকাটা? মনে হয় তাই তো। বললাম স্যুটকেসটা টেনে বের করে। জায়গা কম ঘরে, কাজেই বাক্সের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে না ও আমার পাশে এসে।

তুলে দিলাম স্যুটকেসের ঢাকনা। টেবিলে রাখতে লাগলাম একে একে বের করে নোটর বান্ডিলগুলো। আত্মপ্রসাদের হাসি রিককার ঠোঁটে। হাসিতে কেমন তেল তেলে ভাব। হাতে তুলে নিলাম ২২ বোর বন্দুকটা তাক করলাম ওর পেট লক্ষ্য করে ডালার ভিতর দিয়েই। অস্ত্র ছোট্ট–অন্য ব্যবস্থা নিতে হয় এতে জীবনহানি না হলে। ধীরে ধীরে এগিয়ে নিলাম হাতটা। চোখে চোখ ওরটিপে দিলাম ঘোড়া...শব্দ হলো একটা খুট করে যেন শুকনোকাঠি ভাঙার শব্দ...হেলে পড়তে লাগলো রিককা পেছনে, অব্যক্ত যন্ত্রণার স্বাক্ষর মুখে...সে মাংসল হাতে পেট চেপে ধরে পড়তে লাগলো ...বন্দুক ছিটকে পড়লো রিককার হাত থেকে...ডালাটার ওপর মুখ থুবড়ে পড়লো। ওর মাথায় একটা বাড়ি দিলাম বন্দুকটা দিয়ে প্রচণ্ডশক্তিতে। ক্যাসিনোর মালিক, জ্যাক রিককা, লুটিয়ে পড়লো। ঘামে চপ চপ করছে আমার সারা শরীর, ভারী হয়ে আসছে নিঃশ্বাস। পেট চেপে ধরে রিককা লুটোপুটি খাচ্ছে, অঝোরে রক্ত ঝরছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে এবার তুলে নিলাম ওর বন্দুক ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম নলটা নাকের ওপর ধরে...পরস্পরের দিকে দুজনে তাকিয়ে আছি...রিককার দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে আসছে..সে উঠলো গর্জন করে, বুঝলাম এখনো জ্ঞান হারায়নি। সর্বশক্তি দিয়ে কপালের মাঝখানে বন্দুকের বাঁট বসিয়ে দিলাম।

গর্ত হয়ে গেলো মুহূর্তে ফেটে গিয়ে–বন্ধ হয়ে গেলো রিককার হাত-পা ছোঁড়া শক্ত হয়ে একপাশে হেলে পড়লো। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম ওর মুখের সামনে। সোজা হয়ে দাঁড়ালাম তারপর ঘাম মুছে। বান্ডিলগুলো স্যুটকেসে ভরে নিলাম ২২ বোর পকেটে ফেলে দিয়ে। পাহারাদারকে এগিয়ে আসতে দেখলাম বাইরে বেরিয়ে দরজায় চাবি এঁটে দিতেই। হেঁটে গেলাম দ্রুতপায়ে ওর দিকে। বাইরে যাচ্ছি আমি। উনি দেখছেন কাগজপত্র সময় লাগবে একটু। বিরক্ত কোরো না ওঁকে বুঝলে? স্যার ঠিক আছে। ওর কাছেই রইলো চাবি...তোমাকে দিয়ে যাবেন বেরোবার সময়। তোমাদের বন্ধ হয় কটায়? স্যার। দেখলাম ঘড়ি পৌনে বারটা এখন হাতে সময় আছে আড়াই ঘণ্টার ওপর, মনে হয় হয়ে যাবে ওর মধ্যেই। এগিয়ে গেলাম লিটের দিকে। ইভশ্যাম অপেক্ষা করছিলো আমার জন্য। ওপরে কাজ করছে আমার অংশীদার বন্ধুটি বলে এসেছি পাহারাদার লোকটাকে। স্যার ঠিক আছে। সঙ্গে নিচ্ছি সুটকেসটা, করতে হবে কিছু সইটই? ইভশ্যাম এগিয়ে দিলো দুটো কাগজ। করে দিলাম সই। ফিরছিদিন দুয়েকের মধ্যেই। স্যার আসবেন। সে ভুললো না ঝুঁকে অভিবাদন করতে রাজকীয় কায়দায়। রিককার গাড়ির দরজা খুলে দিলো পাহারার লোক। স্টিয়ারিংয়ে বসে গেলাম গাড়ির পেছনে স্যুটকেস রাখতে বলে। গাড়ি দ্রুতগতিতে ছেড়ে দিলাম দরজা বন্ধ হতেই–ফ্র্যাঙ্কলিন বুলেভার্ড গন্তব্য। গাড়িটা থামালাম বুলেভার্ডের সমান্তরাল একটা রাস্তায় জায়গাটা আমার ফ্ল্যাটের পেছন দিকে। স্যুটকেসটা ঢুকিয়ে দিয়ে গাড়ির পেছনে মাল রাখার বুটে গাছে গাছে এগোতে লাগলাম ঝোঁপঝাড় ফুলের বাগান পেরিয়ে। একটা দড়ি টানা লিফট ফ্ল্যাটের পেছনে। ব্যবস্থা মুদি মশলা তোলার জন্য। বেছে নিলাম এই রাস্তাই চমকে দিতে হবে বেনোকে।

ও শালা নিশ্চয়ই আছে এখনো বাইরের ঘরে। ফ্ল্যাটে ঢুকতে হবে ওর অজান্তে। তারপর না, করবোনা গুলি। অন্য উপায়ে বুদ্ধি ভাজছি ওপর দিকে মুখ করে বেরিয়ে এলো একটা সাদা বিড়াল ঝোঁপের ভিতর থেকে। মার্জার সুন্দরী মুখ ঘষতে লাগলো আমার পায়ে।

এটাকে আমি আগে দেখেছি, পোষ্য জীবটি দারওয়ানের। জিনির হাতে খাবারও খেয়েছে মাজে মধ্যে। এখন আমার যা মনের অবস্থা, তাতে ফুরসত নেই ওটার দিকে নজর দেবার, একটা মৃদু ঠেলা দিলাম পা দিয়ে। বাঘের মাসীনড়লো না। পায়ে পায়ে চললো বেড়ালটাও ঝোঁপের ফাঁকে এগোতে এগোতে। চড়ে বসলাম লিফটে আমার কোলে উঠলো লাফিয়ে বেড়ালটাও। খেলে গেলো। — একটা বদবুদ্ধি মাথায়...একটা বিভ্রান্তির ঝড় তোলা যেতে পারে এটাকে নিয়ে ফ্ল্যাটে...ওটাকে আঁকড়ে ধরলাম। শুরু করলাম উঠতে লিফট ঊর্ধ্বগামী হলো ক্যাচ ক্যাচ শব্দে। বেশ হাঁফিয়ে উঠলাম চতুর্থতলায় পৌঁছতে। থামতে হলো দম নেওয়ার জন্য। শুরু করলাম পূর্ণ্যাত্রা মিনিট খানেক বিশ্রামের পর। লিফট থামালাম আমার রান্না ঘর বরাবর। কিছুক্ষণ হাত মালিশ করলাম দড়ি ছেড়ে দিয়ে। লাফিয়ে পড়লাম রান্নাঘরের জানলার ভেতর একটু সুস্থ হতেই আমার দিকে তাকালো খাবার টেবিলের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে বেড়ালটাকে মাটিতে নামিয়ে দিতে। এককোণে সরিয়ে দিলাম জুতো খুলে। সেটা একটু ফাঁক করলাম দরজার দিকে এগিয়ে...অপেক্ষা করলাম কয়েক সেকেন্ড...না আওয়াজ নেই কোন...কাটলো কিছুক্ষণ।

ভেজিয়ে দিলাম দরজা। দুটো কাঁচের প্লেট বের করলাম অতি সন্তর্পণে কাবার্ড থেকে বেড়ালটাকে বগলদাবা করে। শূন্যে ছেড়ে দিলাম প্লেট দুটো এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে। সেগুলো ভেঙ্গে খান খান হলো মরা জাগানো শব্দে। সরে গেলাম দরজার আড়ালে।

চললে অপেক্ষা...শুধু কানে বেড়ালের ঘরঘরানি আর আমার নিশ্বাসের শব্দ। কাটলো বেশ কিছুক্ষণ। ভাবনা হলো, শব্দ কি শুনতে পায়নি বেনোফাঁক হয়ে গেলো দরজাটা সেই মুহূর্তেই...মাটিতে নামিয়ে দিলাম বেড়ালটাকে...প্রতিটি পেশীউত্তেজনা কঠিন আমার শরীরের...ফাঁকবাড়লোদরজার... স্থিরদাঁড়িয়ে বেড়ালটাও দরজার দিকেই দৃষ্টি। বেড়াল ঢুকেছে দুঃশালা! বেনোর গলা।

বন্ধ করে দিলাম নিশ্বাস, বেজন্মাটা ঘরে ঢুকুক কিন্তু না, ও দাঁড়িয়ে রইলো বাইরেই। দ্রুত ওঠানামা করছে বেনোর নিঃশ্বাস।

অ্যাই ঢুকেছিস কি করে এখানে? আয় এদিকে আয়। বাঘের মাসির কিন্তু পছন্দ হলো না লোকটাকে, সে ফুঁসে চলেছে বেনোর দিকে। এবার ঘরে ঢুকতে হলে বেনোকে। সে পায়ে পায়ে এগোতে লাগলো ডানহাতে বন্দুক ধরে, আমার আর বেনোর মধ্যে ফুট তিনেক দূরত্ব...সাবধান করে দিলো ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়...বিপদ সামনে। বেনো ঘুরলল, ঘুষি চালালাম সঙ্গে সঙ্গে। মার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। দ্রুত চালনায় ঘুষিটা কাঁধের ওপর পড়লো, চোয়ালে না পড়ে। তবু, সেই ঘুষিটা ছিলো মোটামুটি ভারীওজনের। বেনোআছড়ে পড়লো দেয়ালে। সে চেষ্টা করলো উঠে দাঁড়াতে। রাগে অন্ধ আমার দিকে ঘোড়ালো বন্দুকের নলটাও...। ওর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এক রদ্দা মারলাম বন্দুকশুদ্ধ হাতে–ওকে ঠেলে দিলাম এক লাথিতে, বেনো আবার গিয়ে পড়লে দেয়ালে। এবার আরো কাছে ওর মাংসল মুখটা।

বেনো হাত বাড়ালো আমার টুটির দিকে, ঘুষি জমালাম ওর মাথার পাশে আমিও। একই সঙ্গে দূরে ছুঁড়ে দিলাম হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে। হাতটা আস্তে ডুবিয়ে দিলাম

ওর ঘাড়ের নরম মাংসে; ক্রমে চেপে বসতে লাগলো আঙুলগুলো ওর কণ্ঠনালীতে... ওর রক্ত জমে মীলাভ হতে লাগলো চাপ বাড়তে শুরু হতেই-নির্মমভাবে ঝাঁকাতে লাগলাম দেয়ালে চেপে ধরে...বেরিয়ে এলো বেনোর চোখ ঠেলে...বেনো নেতিয়ে পড়লো মাটিতে...অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের তারা। ওর কাছ থেকে সরে এলাম-যন্ত্রণা হচ্ছে হাতে, বুকে ঘা পড়ছে হাতুড়ির হাত রাখলাম ওর চোখের পাতায় ঝুঁকে পড়েনা, স্থির কাঁপুনি নেই। সাড়া নেই ধমনীতেও সিগারেট ধরালাম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কেঁপে উঠলো হাতটা..বেড়েছে যন্ত্রণাও। একে একে সবাই চলে গেলো। বেনো, রিককা, ডেলা, আর এই রাইসনার, অথচ আমার মনের কোণে একবিন্দু করুণা নেই এদের কারোর জন্য। আমাকেই মরতে হতো এদের না মারলে বেনোর মুখে নাকটা ছোঁয়ালো বেড়ালটা লঘুপায়ে এগিয়ে একবার তার নাকটা ঘষলো থাবা বের করে। পায়ের তলায় পিষে দিলাম সিগারেটে গোটা দুই তিন দ্রুত টান দিয়ে বাকি এখনো অনেক কিছু।

জুতো গলিয়ে দিলাম পায়ে, বাইরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম বেনোর বন্দুকটা পকেটে ফেলে। জিনি পড়ে রয়েছে আরাম কেদারায়। পেছনে টেনে বাঁধা হাত দুটো। কাপড় গোঁজা মুখে। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে চেতনা নেই। ওকে বাঁধনমুক্ত করলাম দ্রুতহাতে। মৃদুস্বরে ডাকলাম মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে, জিনি সোনা! আওয়াজ পেলাম একটা স্পষ্ট গোঙানির। আমি এসেছি জিনি। ..

ওঠো, আমাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে। আস্তে পেছনে হেলালো মাথাটা, চোখের পাতা খুললো সামান্য কাপুনির পর! জিনি চিনতে পারলে আমাকে-জিনি আমার গাল ছুঁলো নরম হাতে, তুমি জনি, তুমি কোথায়-ও বলে উঠলো ভাঙাগলায়, অপেক্ষা করেছি আমি, অনেক অনেকক্ষণ ধরে..ফিরবে বলে তুমি...দেরি হয়ে গেলো কত।

জিনি ভেঙে পড়লো কান্নায়! জিনি সব বলবো তোমাকে, এসো আগে বেরোনো যাক এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে এ শহর ছেড়ে। গাড়ি দাঁড়িয়ে বাইরে। আমরা কোথায় যাবো? উঠে বসলো জিনি, হাত দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করলো স্কার্টের ছেঁড়া অংশ। ঠিক করা যাবে সেটা যেতে যেতে, তাড়া আছে–চলল। কেঁপে উঠলো জিনি, কই সেই বিশ্রী লোকটা, সেই লোকটা বেঁটে ভয়ঙ্কর চেহারার? জনি ও লোকটা কে? ওকে টেনে তুললাম, চলেছে কাঁপুনি, পড়েই যেতো আমি না ধরলে।

জিনি ভয় নেই আর–চল আমি ব্যবস্থা করেছি ওর। না, জিনি সরিয়ে দিতে চাইলে আমাকে ঠেলে, মানে কি এসবের, আমি তোমার সঙ্গে যাবো না, না জানা পর্যন্ত আর যাবোই বা কেন–জনি পুলিস ডাকো তুমি। আসুক ওরা পালাবো কেন আমরা? জিনি বলে চলল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত গলায়। জিনি বুঝতে পারছে না তুমি চেষ্টা করলাম গলা স্বাভাবিক রাখার, আমাদের পথ আরো সমস্যাসঙ্কুল করে তোলা এক একটা মুহূর্ত চলে যাওয়া মানে–আমরা যেতে পারছি না পুলিসের কাছে। এর মধ্যে আছেক্যাপটেন হেমও, পালাতে হবে আমাদের! ভয়ের ছায়ানামলো। জিনির চোখে। জনি টাকার ব্যাপারটা কি–ওরা বলছিলো কোন টাকার কথা?

সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছানো টাকার কথাটা ওকে বলা মানেই, হয়তো বলতে পারবো পরে কোনদিন, তবে এখনি নয়। বললাম তাড়াতাড়ি, ওরা ভুল করেছে আমাকে অন্য কেউ বলে চলোত এখন, সব বলবো গাড়িতে বসে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো জিনি, আমাকে খালি খালি জিজ্ঞেস করছিলো ওই লোকটা টাকার কথা, বলছিলো তুমি নাকি টাকা চুরি করেছে ক্যাসিনো থেকে। ওঠো তো এখন, মিথ্যা কথা বলেছে। তাহলে জনি সাহায্য

করো আমাকে, হাঁটতে পারবো না বোধহয় আমি। ফেললাম স্বস্তির নিঃশ্বাস, হাঁটবে না তুমি মোটেই, আমি কাঁধে তুলে নিচ্ছি। তোমাকে। জিনি আমার কণ্ঠলগ্না হলো, জনি ভয় হচ্ছিলো আমার বড়, কোথায় যে ছিলে তুমি এতদিন। লক্ষ্মীটি তুমি দেখো ঠিক হয়ে যাবে সব। সব ভুলে যাবে–একটা সপ্তাহ শুধু। এগিয়ে খুললাম সদর দরজাটা। বাইরে দাঁড়িয়ে হেম–৪৫ অটোমেটিক হাতে।

আমাকে ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে আনলো বন্দুকের নল দিয়ে ঠেলে...যেন বরফের টুকরো ওর চোখদুটো। জিনিকে নামিয়ে দিলাম আরাম কেদারায়। হেম আমার মাথার বরাবর বন্দুক তুলে ধরলো পা দিয়ে ঠেলে দরজা বন্ধ করে। মাথার ওপর তুলে দিলাম হাত দুটো। ধরতে পেরেছি তোমাকে শেষ পর্যন্ত;বলে যেতে পেরেছে তোমার নামটা রিককা অবশ্য মরবার আগে। ফারার তুমি কাজকর্ম শুরু করেছে পাগলা কুকুরের মতো। অস্ফুট শব্দ বের করলো জিনি মুখ দিয়ে একটা, ও ভয় পেয়েছে। শোনো51 হেম থামিয়ে দিলো আমি মুখ খুলতে, তুমি খুন করেছে রাইসনারকে, আমার হাতে সে প্রমাণও আছে। তুমিই খতম করেছে ওয়ার্দামের মেয়েমানুষটাকে আর নিজের মুখেই বলে গেলো রিককা তা–খুন অনেকগুলো...হেমের গলা পাল্টে গেলো, এখন দাঁড়াও দেয়ালে পিঠ রেখে। আমি পড়তে পারছি ওর চোখের ভাষা–তাও জানি কি করবে। আমাকে ওর নিয়ে যাবার সাহস নেই কাঠগড়া পর্যন্ত। কারণ আমি জানি ওর কীর্তিকলাপের কাহিনী। গুলি করা ওর একমাত্র রাস্তা। প্রমাণ হবে সে গুলি করতে বাধ্য হয় আমি পালাবার চেষ্টা করলে। ফিরলাম জিনির দিকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে, এক বিন্দু রক্ত নেই সারা মুখে। হেম জিনির দিকে তাকালো আমার চোখ অনুসরণ করে, দাঁড়াও। তুমিও ওর পাশে উঠে দাঁড়াও, দলে তুমিও আছো! যেতে হবে জিনিকেও, হেম কোনো প্রত্যক্ষদর্শী রাখবে না আমার মৃত্যুর। হেম দাঁড়াও, আমরা একটা চুক্তি করি।

আমি আর নেই ও লাইনে। কিন্তু তুমি রাজী হবে শুনলে। আমি বলে যেতে লাগলাম দ্রুত, ক্যাসিনোর উদ্ধৃত্ত টাকাগুলি আমার কাছে আছে–আড়াই লাখ ডলার। থমকে গেলো হেম। ও থমকাবে জানতাম। পুলিস পুজবের জ্বলে উঠলো চোখ দুটো, চেষ্টা কোরো না আমাকে ধাপ্পা দেবার ফারার, তুমি পার পাবে না এ সব বলে। বুঝলাম হেম টোপ গিলেছে। কর্কশ গলায় কথাগুলো বললেও। ছেড়ে দাও আমাদের বখরা হবে আধাআধি সোয়া লাখ করে। কোথায় আছে টাকাটা কোনোদিনই পাত্তা পাবে না আমি না দেখিয়ে দিলে, এমন জায়গায় আছে। ভাগ নাও তোমার আর আমাদের পালাবার সময় দাও তিন ঘণ্টা। কি ভাবছো। ওকে বললাম নিরুত্তর দেখে। কোনো চুক্তি হচ্ছে না টাকাটা চোখে না দেখা পর্যন্ত। দেখবে দেখতে পাবে নিশ্চয়, কিন্তু সময় দিতে হবে ওই তিন ঘণ্টার। ওর ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেলো গোঁফের ফাঁকে, ফারার আমি নেবো সমস্তটাই–শেষ হয়ে গেছে তোমার কথা। তবে, এক ঘণ্টা তোমাকে সুযোগ দেবো পালাবার। না! হেম শোনো, আমি তোমাকে দুলাখ দেবো, পেতেই হবে আমাকে কিছু আর ওই সময়টুকু পালাবার। তাহলে টাকাটা বের করার কষ্টটুকু স্বীকার করবো দুজনকেই গুলি করে হেম হাসলো। কি মহিমা টাকার! নাও কি করবে করে ফেলল এবার। শুরু করলাম সময় নিতে। আমি অর্ধেক টাকা ছাড়তে রাজি জিনি আর আমার মুক্তির বিনিময়ে, কিন্তু কোনো প্রশ্নই ওঠে না সবটা ছাড়বার। অনেক কেচ্ছা করতে হয়েছে আমাকে টাকাটা পেতে।

না, পারিনা ছাড়তে। উপায়ই আছে এখন একটা, মেরে বেরোনো ওকে অন্যমনস্ক করে। আচ্ছা পাঁচ হাজার নিতে দাও আমাকে অন্ততঃ। বললাম মরিয়া হয়ে, চলতে হবে তো আমাকে। হুঁ, হেম বললো দাঁত মেলেই তা কোথায় টাকাটা?

নিয়ে এসো তো টাকাটা জিনি ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম গাড়ির চাবিটা। তাড়াতাড়ি করো– ফ্ল্যাটের পেছনেই আছে গাড়ি। জিনি কুঁকড়ে গেলো অসহায় পশুর মতো আমার দিকে তাকালো... সে দৃষ্টিতে সেই অপার্থিব শিহরণ নামলো আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

ঘামে ভিজে গেছে আমার সারা শরীর। করলাম শেষ চেষ্টা, আসতেই হবে টাকাটা তোমাকে নিয়ে–দেখছে না এ লোকটা মেরে ফেলবে আমাদের দুজনকেই টাকা না পেলে, এখান থেকে বেবোও চাবিটা নিয়ে! না না, থাক, যেতে না চায় তো ও, যদি তাই করি, আমার যা করার কথা। হেম একটু তুললো বন্দুকটা। ঠিক সেই মুহূর্তে সাদা বিড়ালটা বেরিয়ে এলো রান্নাঘরের দরজা দিয়ে। এবার কঠিন হলো আমার মুখের পেশীগুলো, তাহলে যেতে দাও আমাকেই...আমার সব জিনিই, ফিরে আসবো আমি, হেম, বিশ্বাস করো..আড়াই লাখ নয় কোনো মেয়েমানুষের মূল্যই, চলো, সবাই যাই আমরা–বেড়ালটা মুখ ঘষলো হেমের পায়ে। হেম ওটাকে ঢুকতে দেখেনি, ফলে সে চমকে উঠলো...মুখ নামালো একটা খিস্তি দিয়ে, পরম মুহূর্ত এই তো! ছিলাম তো এর অপেক্ষাতেই...হেমের বন্দুকশুদ্ধ হাতটা ধরে ফেললাম লাফিয়ে ডানহাতে, ওর গলায় বাঁ হাতটা, বেরিয়ে গেলো গুলি–কাঁপিয়ে জানলা দরজা।

হেম আমাকে জড়িয়ে ধরলো একটু পিছিয়ে, পড়ে গেলাম দুজনেই, আমি ওপরে। বন্দুক ছিনিয়ে নিলাম ওর হাত থেকে ঘুষি মেরে, আবার আওয়াজ হলো গুলির। আমাদের লড়াই চললো মিনিট খানিক, কি তারও বেশি, জানোয়ারের লড়াই, লড়িয়ে লোক হেম, তার আয়ত্তে লাইনের সব কায়দা কানুনই।

গড়াগড়ি খাচ্ছি আমরা, তছনছ করে আসবাবপত্র..ঘুষি চলছে, হাঁটুর কসরতও। মুশকিল হয়ে পড়েছে ওকে ধরে রাখা...আস্তে আস্তে নিঙড়োতে শুরু করলাম গলায় আঙুল বসিয়ে, আমার গলা ধরেছে হেমও আমার বন্ধ হয়ে আসছে দম...মুখে ঘুষি মারলাম প্রচণ্ড শক্তিতে ভেসে গেলল ওর নাক। হেম পড়ে গেলো চিৎ হয়ে। মেঝেয় ঠুকতে লাগলাম ওর মাথাটা। শিথিল হয়ে এলো ওর হাতের মুঠো দাঁড়িয়ে পড়লাম লাফিয়ে...চোখের পলকে হেমও উঠে পড়লো। মুখটা একটা রক্তাক্ত মুখোশ। রক্ত গড়াচ্ছে নাক বেয়ে...ওকে আর কাছে আসতে দিলে চলবে না, কাজ সারতে হবে দূর থেকেই, একজন মুষ্টিক আমি যে, একথা ভুলে গেছে হেম বোধহয়। হাত বাড়িয়ে সে ছুটে এলো আমার কোমর ধরার জন্য, আহ্বান মল্লযুদ্ধের।

কিন্তু শিক্ষা হয়ে গেছে আমার, ওর রক্তাক্ত মুখে ডান হাতে মারলাম একপাশে সরে গিয়ে বেশ জোরেই। হেম বাঘের বাচ্চা, আবার তেড়ে এলো একমুহূর্ত থেমে এবার আমার ভুল হলো না আর, ওর হাত পড়তেই আমার কোটের কোণে, বাঁ হাতে হুক জমালাম হেমের রক্ত মাখা মুখের দিকে হেসে তাকিয়ে...যে মারে ফেটেছিলো ম্যাকক্রেডীর চোয়াল। এই একই মারে ওয়ালার মাটি নিয়েছিলো, এই মারেই শেষ করে ছিলাম মিয়ামির সেই ছোঁড়াটারও খেল...পুলিস ক্যাপটেন হেম এবারের শিকার। জিনির দিকে ফিরলাম দম নিয়ে, কিন্তু সে কোথায়? নেই! দৌড়ে গেলাম বারান্দায়। হাটখোলা সদর দরজা, ফিরে এলাম। ছুটে গেলাম জানলার দিকে বৈঠকখানায় ঢুকে দৌড়োচ্ছে জিনি, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলেছে গেটের দিকে।

টলছে, উঠে আবার ছুটছে পড়ে যেতে যেতে, হাত চাপা দিয়ে মুখে। শরীর বের করে ঝুঁকলাম জানলার বাইরে, জিনি শোনো আমি আসছি দাঁড়াও–অপেক্ষা করো। তাকালো

না ঘুরেও...কে জানে কানে গেছে কিনা আমার কথা...জিনি চললো ছুটেই। আমার দৃষ্টি চলে গেলো ওর মাথার ওপর দিকে। গাড়ি এসে থামলো দুটো পুলিসের। গাড়ি থেকে নেমে এগোতে লাগলো ফ্ল্যাটের দিকে জনা দুয়েক সিপাই প্রায় ওদের ঘাড়ের ওপর পড়ছিলো জিনি দৌড়ে।

ওকে ধরে ফেললে সিপাইদের একজন। আরও কতজন সিপাই নামলো দ্বিতীয় গাড়ি থেকে...আমি সরে যাবার চেষ্টা করলাম পুলিসের লোকগুলো চোখ তুলতেই কিন্তু আমাকে দেখে ফেলেছে ওরা তার মধ্যেই...একটা টোক আটকাল গলায় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি জিনিকে দেখতে গিয়েই তো...শেষবারের মত দেখছি ওকে হয়তো...রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলাম চোখ ফিরিয়ে নিয়ে। পড়ে আছে বেনোভসনার প্রলেপ নিয়ে তার হিমশীতল চোখে। জানলার বাইরে দড়ির লিফটে চড়ে বসলাম ওর নিশ্চল শরীরটা ডিঙিয়ে। আমি পেছনের গেটের দিকে ছুটে চললাম শেওলাধরা রাস্তা দিয়ে কয়েক সেকেন্ড পরে। না, আমাকে লক্ষ্য করেনি কেউ। অপেক্ষমান প্যাকার্ডে উঠে বসলাম একটানে গেট খুলে। বাঁশীর আওয়াজ কানে এলো গাড়ি চলতে শুরু করতেই– না।

আমার দ্রুতগামী গাড়ি আছে। কিন্তু আমি যাবো কোথায়? চারিদিকে এখুনি বেজে উঠবে বিপদের সঙ্কেত...আমাকে খুঁজে ফিরবে প্রতিটি পুলিসের গাড়ি তাহলে? কে আমাকে লুকোবে ওদের হাত থেকে? মনে পড়লো বেস্ট্রীটের লিবটি ইন-এর জো এলমোরের কথা; আশ্রয় মিলতে পারে টাকার বিনিময়ে ওর কাছে পৌঁছোতে পারলে। গাড়ি ঘোরালাম বে স্ট্রীটের দিকে। এক সিপাইয়ের সামনে পড়ে গেলাম লিঙ্কন বীচের প্রধান সড়কের সমান্তরাল লিঙ্কন অ্যাভিনিউয়ের। মাঝামাঝি পড়তেই। আমাকে থামতে বললো

লোকটা হাতের ইশারায়, পায়ের চাপ বাড়ালাম আমি অ্যাকসিলারেটারে। গাড়ি এগোলো ঝোঁক নিয়ে। সাহসবলিহারি সিপাইজীর, এক হাতে লাঠি আর অন্যহাতে বন্দুক, নেমে পড়লো রাস্তায়! থমকে দাঁড়ালো রাস্তার দুপাশের মানুষ, কিন্তু পারলো না–আমার মাথা লক্ষ্য করে লাঠিটা ছুঁড়ে দিলো আমাকে রুখতে না পেরে। নামিয়ে নিলাম মাথা লাঠিটা আবার বাইরেই পড়লো গাড়ির কাছে একটা গর্ত করে দিয়ে। আওয়াজও পেলাম পেছনে গুলির, ক্ষতবিক্ষত হলো গাড়ির বডি আর একটা রাস্তায় পড়লাম কিছুদূর এগিয়ে। বেশি দূর যাওয়া যাবে না গুলির দাগ আর ভাঙা কাঁচ নিয়ে আমাকে দেখতে শুরু করেছে রাস্তার মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ে, চোখে পড়লো গাড়ি রাখার জায়গা সামনে অল্প দূরে, গাড়ি দাঁড়িয়ে সারি সারি।

আস্তে আস্তে সবার পেছনে গাড়িটা ঢুকিয়ে দিলাম। সাদা পোষাকের একজন কর্মী এগিয়ে এলো নেমে গাড়ির পেছনে মাল রাখার জায়গায় দাঁড়িয়ে ঢাকনিটা তুলে দিতেই। স্যার গাড়ির কি হয়েছে? তার চোখ গুলির দাগে। পাগলা এক ব্যাটার কীর্তি ওই আর কি! যাক একটু লক্ষ্য রেখো–আমি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমি বিরাশি শিক্কার ঘুষি জমিয়ে দিলাম ওর মুখে লোকটা অবার মুখ খোলার আগেই। লোকটা পড়লো মুখ থুবড়ে, বেচারা! চারপাশে তাকালাম মাথা তুলে! না, দেখতে পায়নি কেউ। অল্পদূরে দাঁড়িয়ে আরো জনা দুতিন সাদা পোষাকের কর্মচারী, তারা মত্ত গল্পে। পাঁচিলের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেলাম সুটকেস হাতে নিয়ে।

সুটকেসটা বড্ড ভারী লাগছে–বোধহয় এটা মনে হচ্ছে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বলেই। আমার জীবনের মোড় ফেরাতে পারি এটাকায় এখনো। কিন্তু টাকাটা ছাড়া একটা উঁচু ঢিবির

ওপর উঠলাম দেয়ালের পাশ দিয়ে। নজরে পড়লো দুটো পুলিসের গাড়ি রাস্তার দিকে চোখ ফেরাতে এদিকেই এগিয়ে আসছে বুলেভার্ডের ধার ঘেঁষে।

একটা কয়েক গজ তফাতে। আশ্রয় দরকার এখুনি একটা আর কোনো সম্ভবনাই নেই লিবার্টি ইন-এ পৌঁছোনোর। লিঙ্কন হোটেল রাস্তার উল্টোদিকে-সে দাঁড়িয়ে তার চল্লিশতলা আকাশ ভেদী উচ্চতা নিয়ে। এগোলাম রাস্তা পেরিয়ে, আনার্থীর ভিড়ে এক দল মেদের পাহাড় লোক। একটা একপাশে। স্নানের পোষাক পরনে যুবতী অন্যপাশে। স্নানার্থিনী আমাকে মাপলো কৌতূহলের চোখে। হোটেলের উদ্দেশ্যে জনতা চলেছে, জনস্রোতে আমিও মিশে গেলাম সেই সুযোগে...পেছনে ফিরে তাকালাম. ঘূর্ণায়মান দরজার মধ্যে গলে গিয়ে এবং নিজেকে অভিশাপ দিলাম সঙ্গে সঙ্গেই-আমাকে দেখে ফেলেছে সিপাইদের একজন।

লোকটা থমকে গেলো এক মুহূর্ত, তারপর পা বাড়িয়ে দিলো দ্রুতপায়ে হোটেলের দিকে। লিফটে উঠে পড়লাম দ্রুতপায়ে। লবি পেরিয়ে। আমি নির্বিকার গলায় বলে দিলাম এগারোতলা। লিফট চালক আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। সিপাইটাকে দেখতে পেলাম লিট চলতে শুরু করতেই সে বেরিয়ে এলো ঘোরানো দরজা দিয়ে, জেট চালিত রকেটের মত ছিটকে।

সারা হোটেল ভরে যাবে পুলিসে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে। লিফট থামলো ষষ্ঠ তলায়। কেউ চড়লো না, দুজন বোলো। আমি মেয়েটা আর চালক, তখন শুধু লিফটে। চালক আমার দিকে ফিরলো, মেয়েটাকে অপাঙ্গে লেহন করে একবার, স্যার, কোন ঘর আপনার? এসেছি। একজনের কাছে। স্যার কাজ করে ফেলেছেন বেআইনী, নামটা

লেখানো উচিৎ ছিলো নীচে অনুসন্ধানের দপ্তরে। একটু বোধহয় দেরি হয়ে গেলো, তাই না? চেষ্টা করলাম হাসবার। একদৃষ্টে তাকিয়ে যুবতী আমার দিকে। আমি তাকাতে, টেনে দিলো জামাটা একটু। মেয়েটাকে মনে হচ্ছে। লাইনের...। স্যার নীচে নামতে হবে আপনাকে। মেয়েটার বুকে কিন্তু চালকের দৃষ্টি। নামবো ঠিক আছে। লিফট থামলো তেইশ তলায়। মেয়েটা বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলো বারান্দা দিয়ে...অলস মন্থর পায়ে। ওর নিতম্বের আন্দোলন লক্ষ্য করছি বিমোহিত দৃষ্টিতে আমি আর চালক। চালক ছোকরার কাঁধে হাত ঠেকালাম মেয়েটা অদৃশ্য হতেই, চোয়ালে একটা ঘুষি মারলাম সর্বশক্তি দিয়ে ও মুখ ফেরাতেই–মাথাটা প্রায় নেমে যাবার উপক্রম হলো ওর কাধ থেকে মারটা এতটা জোড়ে পড়লো যে, ছেলেটা সশব্দে পড়ে গেলো টুল থেকে। মেয়েটার পেছনে ধাওয়া করলাম দ্রুতপায়ে বেরিয়ে স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে। মেয়েটাকে ধরলাম তার ঘরের সামনে, দরজা খুলছে চাবি ঘুরিয়ে। সে ঢুকে পড়লো ঘরে আমার দিকে নজর পড়তেই। ৪৫ বোরের বন্দুকটা ওর কাঁধে ঠেকালাম দরজা বন্ধ করার মুহূর্তে, আলতো হাতে। কোনো শব্দ করবেনা মুখ দিয়ে। ঢুকে দরজা বন্ধ করে। দিলাম পা দিয়ে ঠেলে। আপনি কি চান? তন্বী বলে উঠলো প্রায় বিকৃত গলায়। কথা আছে বোসো। বের করে ধরালাম সিগারেট। ভয় নেই তোমার, পেছনে লেগেছে পুলিসের খোঁচড়গুলো। আমি এখানে থাকছি ওরা কেটে না পড়া পর্যন্ত। তাকে দেখাচ্ছে খুশী খুশী, নিতম্বিনী বসলো। বাইরে তাকালাম ডানদিকে স্যুটকেসটা নামিয়ে দিয়ে।

মনে হচ্ছে এখান থেকে সেটা অনেক দূর যে জায়গায় পৌঁছতে পারলে পালাতে পারি। ভিড়ও বাড়ছে হোটেলের বাইরে–সাইরেন বাজিয়ে এগিয়ে আসছে গোটা তিনেক পুলিসের গাড়িও...ওরা তোমার ঘরে তল্লাসীতে আসবে আর মিনিট দশেকের মধ্যেই। আমার ঘাড়ে খুনের দায় চার চারটে, আমার হাত কাঁপবে না আর একটা বাড়াতে। কিন্তু

তোমার কাছে ফেলনা নয় নিশ্চয়ই তোমার জীবনটা। তুমি আমাকে দেখনি, ওদের বলতে হবে; গুলি ছুটবে কোনো গোলমাল হলেই বুঝলে? মেয়েটা কুঁকড়ে গেলো ভয়ে, আমার দিকে তাকালো বিস্ফারিত চোখে। আমার দুঃখ হচ্ছে ওর জন্য, কিন্তু কোনো পথ নেই আমার তো আর। পড়েছি যে গ্যাড়াকলে। ভিড় বাড়ছে বাইরেও, পুলিসের গাড়িও জমেছে মানুষও হাজার তিনেকের কম নয়... তাদের সংখ্যা বাড়ছে প্রতি মুহূর্তেই পায়ের শব্দ উঠলো বারান্দায়...হাঁটতে পারে না নিঃশব্দ পায়ে ও শালারা তো...মনে হচ্ছে অনেক গুলোই হবে...একপাল মোষ! তল্লাসীচলেছে ঘরে ঘরে...এখন বাকিটা নির্ভর করছে এ মেয়েটার ওপর। আমি গেছি ও ফাঁসিয়ে দিলে, শান দিলাম গলাটায়।

এসে পড়বে ওরা এখুনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে কি করতে হবে। ওর মাথা লক্ষ্য করে তুললাম বন্দুকের নলটা। মেয়েটা বসে রইলো মোমের পুতুল হয়ে। মুছে গেছে মুখের সমস্ত রঙ...তাকিয়ে রইলো বোবা চোখে আমার দিকে। টোকা পড়লো দরজায়। নিঃশব্দে পার হয়ে গেলো একটা দীর্ঘ মুহূর্ত। জোরে আবার টোকা।

ফিসফিসিয়ে বললাম যাও, ও নড়বে না যদিও জানি। সত্যি হলো আমার আশঙ্কাই, মেয়েটা মাটিতে পড়লো একটা বিলম্বিত আর্তনাদ করে; হারিয়েছে চেতনা। জলদি খোল–

পেলাম একটা মোটা গলা। ভবিষ্যৎ নেই আমার আর কোন। হেমের হাতেই যাওয়া ওদের হাতে পড়া মানেই আর তারপর, না, পথ নেই বাঁচার। কোনো কিছু ভাবছি না আমি। ঘুরপাক খাচ্ছে টাকাগুলোকে কেন্দ্র করে আমার ভাবনা...ভোগ করতে না পারি আমি যদি এ টাকা, তাহলে করতে দেবোনা কাউকেও..আবার কণ্ঠস্বর দরজার বাইরে।

ফারার খোলো, আমরা জেনেছি তুমি ওখানে ফিরে গেলাম জানলায়। সারা বাড়ি জুড়ে জানলার নীচে কার্নিশ।

মুখ বাড়িয়ে দিলাম বাইরে। কার্নিশ একটা ফুলের বাগানে শেষ হয়েছে ডাইনে ফুট ত্রিশেক গিয়ে। গুলি খাবার ভয় থাকছে না ওখানে পৌঁছতে পারলে। চোখ ফেরালাম নীচের দিকে শুধু মাথা আর মাথা সৈকত জুড়ে–দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী সব মানুষের। নিবদ্ধ আমার জানলার দিকেই।

মাথাটা ঝিম করে উঠলো স্বল্পপরিসর কার্নিশটা আবার চোখে পড়তে, কিন্তু প্রাণে বাঁচবোনা ওখানে না নামতে পারলে। চাপ বাড়ছে দরজায়–ভেঙে পড়বে যে কোনো মুহূর্তে। পা তুলে দিলাম জানলার ওপর। স্যুটকেসটা নিয়ে নিলাম কার্নিশে নেমে। গুঞ্জন উঠলোনীচে, কিন্তু আমি তাকাতে পারছি না আর নীচের দিকে। দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক সেকেন্ড হাতুড়ির আওয়াজ বুকে। কাঁপছে হাঁটু। ও জায়গায় হাঁটা যথেষ্ট বিপদজনক, স্যুটকেস ছাড়াই। আর হাতে করে ওটা...পায়ে পায়ে এগোতে লাগলাম দেয়ালে পিঠ রেখে। কায়দায় হাঁটছি সার্কাসে দড়ি হাঁটিয়েদের। আমাকে পৌঁছোতে হবে ওই ফুলের আস্তানায়। পার হয়ে চলেছি জানলার পরে জানলা, ইচ্ছা করছে কিন্তু পারছি না ভেতরে উঁকি দিতে একটা লোক জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো শেষ জানলার কাছাকাছি পৌঁছাতে। নিঃশ্বাস নিচ্ছি দাঁতের ফাঁকে। থেমে গেলাম–লোকটা আমাকে দেখতে লাগলো হাঁ করে। সন্তর্পণে পকেট থেকে বের করে নিলাম বেনোর বন্দুকটা। ককিয়ে উঠলো লোকটা পড়ে; সারে যে আরে, উঠে এসো আমার এখানে।

সরে যাও জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে।

তুলে ধরলাম বন্দুকের নল। লোকটা সরে গেলো একটা অস্ফুট শব্দ করে..নীচের ভিড়ে গুঞ্জন উঠলো আবার–এগোতে লাগলাম, পৌঁছে যাবো আর ফুট বিশেক যেতে পারলেই। সুরু করলাম দ্রুত এগোতে, চেঁচিয়ে উঠলো. পেছনে কে যেন...সাহস নেই ফিরে তাকাবার... চলতে থাকলাম...পিঠে গুলি খাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে প্রতি মুহূর্তেই...পৌঁছলাম অবশেষে। দম নিলাম একটা পাথর আঁকড়ে ধরে। এ ভাবেই কিছুক্ষণ কাটলো...চোখ তুললাম আস্তে, মুখের মিছিল রাস্তার উল্টোদিকের বাড়িগুলোর জানলায়। কার্নিশে নামিয়ে দিলাম সুটকেস। পাথর ধরে আস্তে ওপর দিকে উঠতে চেষ্টা করছি সামনের কোন বাড়ি থেকে একটা হুঙ্কার ভেসে এলো, মাতাল কোথাকার, কি করছো কি? আর একবার সোচ্চার হলো জনতার গুঞ্জন। মোটামুটি তো পেলাম একটা পা রাখার জায়গা। এবার কোনোরকমে একদম দাঁড়াবার জায়গা পাবো ওই কংক্রীটের গাঁথুনি পার হতে পারলে স্যুটকেসটা নিয়ে, গাঁথুনিতে চাপালাম ডান পা–টা। কিন্তু অসম্ভব হয়ে পড়লো ভারসাম্য রাখা। পিছিয়ে আসতে হলো। স্যুটকেসের ভারে ফুরিয়ে এসেছে দমও। হাতটা শূন্যে উঠে রইলো তিন–চার সেকেন্ড...বাড়তে শুরু করেছে আশ পাশের চীৎকার..শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে ঢুকতে পারলাম ফাঁকটার মধ্যে, নিজেও বুঝতে পারছি না কি করে তা হলো।

কিছুটা জায়গা বেড়েছে, বোধ করছি একটু নিশ্চিত, ভেঙে পড়তে চাইছে সারা শরীর অবসাদে পারছি না দাঁড়াতে। বসে পড়লাম স্যুটকেস ধরে পিঠ ঢুকিয়ে সাঁকোর মধ্যে, সামনে পা দুটো শূন্যে এই প্রথম নীচের দিকে চোখ ছেড়ে দিলাম কার্নিশে নামার পর, শুধু মাথা আর মাথা যতটুকু চোখে পড়ছেরুজভেল্ট বুলেভার্ডে আর ওসান বুলেভার্ডের এই উচ্চতা থেকে মনে হচ্ছে একটা চিকচিকে কার্পেট। চোখে পড়ছে পুলিসের

লোকগুলোকেও ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে ভিড় নিয়ন্ত্রণের। দাঁড়িয়ে গেছে গাড়ির সার...মাইল জুড়ে। মানুষ এগিয়ে আসছে হোটেলের দিকে গাড়ি ছেড়ে। আরো বাড়বে পুলিসের তৎপরতা আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমি বাঁধা পড়বো অক্টোপাসের বাঁধনে, চলে যাচ্ছে সময়। আড়াই লক্ষ ডলার আমার পাশের স্যুটকেসে কড়কড়ে নোট আর নীচে মানুষ দু পাঁচ হাজার, আমার চিন্তায় শুধু। পরের কাজটুকু অনেক সহজ হয়ে গেলো এই মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গেই। তুলে নিলাম একটা একশো ডলারের বাণ্ডিল সুটকেস খুলে। বাণ্ডিলটা শূন্যে ছুঁড়ে দিলাম রবারের চাকতিটা টান মেরে খুলে–নোটগুলো নীচের দিকে নামতে লাগলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে, নড়ে উঠলোজনতা, উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় পৌঁছেছে ওরা নিশ্চয়ই একজন লাফিয়ে উঠলো নোটগুলো ওদের কাছাকাছিনামতেই, ধরবার জন্য নোটটা। ওদের মাঝে কি জুড়ে দিয়েছি এবার মানুষগুলো জানলে...

গর্জন উঠলো একটা সে গর্জনে কেঁপে উঠলো সারা পরিবেশটা–প্রথম নোটটা ধরার জন্য কে একজন লাফিয়ে উঠলো রাস্তার উল্টোদিকের একটা জানলায়। কে একজন বলে উঠলো রাস্তার উল্টোদিকের একটা জানলায়, আরে লোকটা ফেলে দিচ্ছে টাকা! মুখগুলো একে একে মিলিয়ে গেলো সামনে চলতে লাগল ধাক্কাধাক্কি। এক অভিনব খেলায় আমিও মেতে উঠলাম। নীচের মানবসমুদ্রে বাণ্ডিল খুলছি আর ছড়িয়ে দিচ্ছি। রাখতে পেরেছি আমার প্রতিজ্ঞা; একটা চমক সৃষ্টি করবো খরচের ব্যাপারে, অনেক টাকা হাতে পেলে...আমার বহুদিনের সাধ পালন করেছি, আজ। কি আনন্দ! রোমাঞ্চ অভূতপূর্ব! আমি দুনিয়ার সর্বশক্তিমান মানুষ এই মুহূর্তে। নীচের এই দৃশ্য স্নান করে দিয়েছে আমার সমস্ত কল্পনাকে লড়াই করছে মানুষে মানুষে, মাড়িয়ে চলেছে একে অপরকে। এক অপূর্ব দৃশ্য চীৎকার আর আঁচড়া–আঁচড়ির। মেতে উঠেছে খেলায় পুলিসেরাও

আন্দোলিত হচ্ছে লাঠি শুধু ছোঁবার জন্য টাকা বাতাসে দিকবিদিকে নোট ছড়িয়ে পড়ছে, লড়াই চলেছে সৈকতেও। কখানা নোট ধরতে ধরতে একটা মেয়ে তার স্কার্টে আঁজলা করে সেটাকে রাখল। ছিড়ে ফালা ফালা করে দিলো তার দিদিমার বয়সী এক বৃদ্ধা! আর এক দৃশ্য, একটা পুরুষকে ঠেঙিয়ে চলেছে চারজন মহিলা তাদের হাতব্যাগ দিয়ে...

কখানা নোট হাতের মুঠোয়। এক মহিলাকে এক সিপাই ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য লড়াই চালাচ্ছে–ওদের মধ্যে ছেড়ে দিলাম শেষ বাণ্ডিলটাও, দেখতে লাগলাম বসে ভারী হয়ে আসছে নিশ্বাস। ঘামে চপচপ করছে সারা শরীর। আবার আমার জীবনে ফিরে আসে যদি এই দশটা মিনিট সময়টুকু বরণ করবো সানন্দে। কিন্তু আমার কাছে আর টাকা নেই। ও টাকায় কিছু করা যাবে না, ডেলা ঠিকই বলেছিলো...টাকা নিঃশেষ হলো রোদে বরফ গলে যাওয়ার মত...যেন আমার কাছে ছিলোনা এটাকা কোনদিনই। পরম মুহূর্ত অতিক্রান্ত আমার জীবনের। তার পুনরাবৃত্তি হবেনা আর কোনদিনই। তাকালাম নীচে আমার দিকে আর কেউ তাকাচ্ছে না। ওরা আমাকে ভুলে গেছে টাকার উন্মাদনায়। সময় ফুরিয়ে এলো আমারও। এবার পৌঁছতে চেষ্টা করবে আমার কাছে পুলিসের লোকগুলো। দুটো রাস্তা এখন আমার সামনে; শূন্যে লাফিয়ে ওদের ফাঁকি দেওয়া, না হয় আত্মসমর্পণ।

একই তো অবস্থা হবে দ্বিধা নেই আমার কোনো..এখুনি করে দিতে পারি জীবনের শেষ। আমাকে তা পীড়া দিচ্ছে জিনির চোখে যে অবিশ্বাস দেখেছি, আমার ভালোবাসা নিখাদ ওকে বিশ্বাস করাতে হবে। আমার এই একটা কর্তব্যই থেকে গেলো পৃথিবীতে; সে কতখানি জুড়ে ছিলো আমার জীবনের, ওকে জানান। সে জানুক আমার কাহিনী...জানুক কেমন করে হারিয়ে যায় একজন নির্দোষ, সাঁতারু ঘূর্ণিজলে পড়ে, ওর হোক

অনুশোচনা..অন্তত একবারের জন্যেও ভাবুক আমি গ্যাস চেম্বারে ঢোকার পর। প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে খারাপ বলে হেম আমাকে যতটা, ততো খারাপ নই আমি মানুষটা। সত্য উদঘাটিত হওয়া দরকার জিনির কাছে। আত্মসমর্পণ করবো আমি। অন্তত আমি লিখে যেতে পারবো আমার কাহিনী বিচারকের সামনে হাজির হওয়ার আগে। উঠে দাঁড়ালাম সন্তর্পণে...ফিরে তাকালামকার্নিশের দিকে একটা সিপাই জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে আমার থেকে কয়েক গজ দূরে–একদৃষ্টে তাকিয়ে আমার দিকে। সে জানলার বাইরে বেরিয়ে পড়তেই, এখন তার ওপরই তো ন্যও আমাকে বার পবিত্র দায়িত্ব–দোস্ত ওখানেই থাকো–বললাম নরম গলায়, হাতের ইশারা করে, তোমাদের কাছে আমিই আসছি, নীচের জনসমুদ্রের উত্তাল গর্জন কানে এলো, ওর দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য মিল আছে এ শব্দের সঙ্গে গুহার সিংহ গর্জনের। রাইসনারকে কাছে পাওয়ার মুহূর্তে তারাও হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলো। একটা জায়গায় শুধু তফাৎ। আমি জানি আমার ভাগ্যে কি ঘটবে–কিন্তু জানতো না রাইসনার!!